মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল

Murarichand College Journal

মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৩

মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট

Murarichand College Journal
Vol. 3, No.1, June 2023
ISSN 2707-9201
(A Peer Reviewed Journal)

মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রকাশক
মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট
02-996641634
m.c.college_sylhet@live.com
www.mccollege.edu.bd

মূল্য: ৩০০ টাকা

মুদ্রক
নাগরী
বারুতখানা, সিলেট
+88 01714 610061, +8801712 082967
nagree14@gmail.com, www.nagreeprokash.com

প্রধান উপদেষ্টা
প্রফেসর আবুল আনাম মোঃ রিয়াজ
অধ্যক্ষ, মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট

উপদেষ্টা
প্রফেসর সাইফুদ্দীন আহম্মদ
উপাধ্যক্ষ, মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক
প্রফেসর মোঃ তোতিউর রহমান
অর্থনীতি বিভাগ

সদস্য
প্রফেসর ড. সাহেদা আখতার
বাংলা বিভাগ

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আলাউদ্দিন খান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

প্রফেসর ড. মোঃ আসিরুল হক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ বিলাল উদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. মোঃ বায়েজীদ আলম
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

Chief Adviser
Professor Abul Anam Md. Reaz
Principal, Murarichand College, Sylhet

Adviser
Professor Saifuddin Ahmed
Vice-principal, Murarichand College, Sylhet

Editorial Board

Editor
Professor Md. Tutiur Rahman
Department of Economics

Members
Professor Dr. Shaheda Akhter
Department of Bangla

Professor Dr. Muhammad Alauddin Khan
Department of Physics

Professor Dr. Md. Asirul Haque
Department of Political Science

Professor Md. Abul Kalam Azad
Department of Botany

Mohammed Belal Uddin
Associate Professor
Department of Bangla

Dr. Md. Bayezid Alam
Assistant Professor
Department of Political Science

সম্পাদকীয়

মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রকাশ সারসতচর্চার ধারাবাহিক প্রয়াস। বৈশ্বিক সংকটোত্তর সময়ক্ষেপণ এ প্রকাশের ধারাকে থামিয়ে দিতে পারেনি। জ্ঞানচর্চা, আগ্রহী গবেষক সৃষ্টি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানপ্রকাশে জার্নাল একটি প্রধান বিদ্যায়তনিক মাধ্যম, যেখানে মেধা ও দক্ষতার সমন্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশ ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাচর্চার বিকাশ ঘটাতে মুরারিচাঁদ কলেজের নানাবিধ প্রকাশনার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন ১৯১৭-৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রৈমাসিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখনও *পূর্বাশা* নামে কলেজ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে যথাক্রমে আটটি ও পাঁচটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে *মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল: রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ এশিয়ার* দ্বার উন্মোচিত হয়। এটি ছিল মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নালের প্রথম বর্ষ। ২০২১-এ *মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল* (ISSN 2707-9201) ছয়টি বাংলা ও তিনটি ইংরেজি মাধ্যমের প্রবন্ধ সহযোগে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা আলোর মুখ দেখেছিল। কিন্তু পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অতিমারির কারণে দ্বিতীয় বর্ষের পরবর্তী সংখ্যাসমূহ প্রকাশের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। এসময় স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার জন্য দীর্ঘকালীন লকডাউনের আওতায় পড়ে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। তাই বিলম্ব হলেও *মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল* তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশনা এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ সংখ্যায় যথাক্রমে ইংরেজি মাধ্যমে তিনটি এবং বাংলা মাধ্যমে সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধগুলো যৌথ মূল্যায়নকৃত; এ ক্ষেত্রে সংখ্যা নয়, মানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'Study of Reflection of Light by a Moving Mirror Using Mixed Number' শীর্ষক প্রবন্ধে রসায়ন বিষয়ে, 'The Simple Alternative Proof Regarding the Kissing Number Problem' শীর্ষক প্রবন্ধে অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণালব্ধ সারাৎসার এবং 'Teaching Science in Sylhet up to Class Eight: Reality and Appearance' শীষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, বিদ্যালয়সমূহের সক্ষমতা এবং শিক্ষার পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত অবস্থা বিবেচিত হয়েছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি সিলেটের কয়েকটি বিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমের ফসল। বাংলা মাধ্যমে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর বিষয় স্থানীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিশেষ দিক। 'সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপি' প্রবন্ধের বিষয় সিলেটে প্রাপ্ত তামশাসনসমূহের শিলালিপিগুলোর আধুনিক বাংলাপাঠ, 'নানকার ও কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ (১৯৩৬-১৯৪৭): 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন' ও তৎকালীন রাজনীতি' প্রবন্ধে বিশ শতকের শ্রীহট্টীয় সমাজ-রাজনীতি, 'সৈয়দ আলী আহসান: শিল্পবোধ ও শিল্পাদর্শ' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পবিশ্লেষণ, 'জীবন আমার বোন: বিচ্ছিন্ন—বিচ্যুত ব্যক্তিমানসের রূপকল্প' প্রবন্ধে মাহমুদুল হকের উপন্যাসে সমাজ-রাজনীতি ও মনোদৈহিক পরিস্থিতিতে মানষের জীবন, '*মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত কবিতা: বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল ও কবিকৃতি' প্রবন্ধে

ব্রিটিশপর্বে কলেজটিতে সংঘটিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, 'সিলেটি প্রবাদ: জীবনবোধ ও সমাজদর্শন' প্রবন্ধে সিলেটের প্রবাদপ্রবচনে প্রতিফলিত সমাজজীবন, 'কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের গীতে নারীর অন্তর্বয়ন' প্রবন্ধে কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের গানে নারীজীবন বিধৃত হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি ও রেফারেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে প্রবন্ধগুলোর কোনও কোনওটিতে সমতা রক্ষিত হয়নি, কোথাও কোথাও অনুসৃতব্য নীতিমালার বদলে লেখক সতন্ত্র স্টাইল অনুসরণ করেছেন। বর্তমান সংখ্যায় এরকম উদাহরণ থেকে থাকতে পারে। প্রবন্ধগুলোতে প্রতিফলিত মতামতের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকের, কোনওক্রমেই সম্পাদনা পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে না। তবে একথা বলা বাহুল্য যে প্রবন্ধগুলোর গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগবে বলেই বিশ্বাস।

জার্নাল প্রকাশনার নবতর উদ্‌যোগগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন সম্মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল আনাম মো. রিয়াজ। অধ্যক্ষ মহোদয়কে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। উপাধ্যক্ষ প্রফেসর সাইফুদ্দীন আহম্মদের দিঙ্‌নির্দেশনা প্রকাশনা কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁকে ধন্যবাদ। শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক জনাব মোঃ তৌফিক এজদানী চৌধুরীকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদনা-পর্ষদের সার্বিক সহযোগিতার ফসল এ জার্নাল প্রকাশনা। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের প্রবন্ধ নিয়ে জার্নালের এবারের সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। যাঁরা রিভিউয়ারের দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা। জার্নাল প্রকাশে আস্থা রাখা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'নাগরী' বরাবরেরমতো সযত্নে কাজটি করেছে। সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে মানসম্মত জার্নাল প্রকাশে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। *মুরারিচাঁদ কলেজ জানালের* ঐশ্বর্য ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক।

লেখক-জ্ঞাতব্য

১. ৩৫০০ থেকে ৭০০০ শব্দে বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ রচিত হতে হবে। প্রবন্ধের শুরুতে গবেষণার লক্ষ্য, জিজ্ঞাসা ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত অনধিক ১৫০ শব্দের সারসংক্ষেপ (abstract) যুক্ত করতে হবে।

২. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানান অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

৩. উদ্ধৃতি ২৫ শব্দ বা ৩ লাইনের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৪. কবিতা-ছোটোগল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল রচনার উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে। তথ্যসূত্র উল্লেখের কৌশল: (মুরশিদ, ২০০৮: ২২)।

৫. সাধারণ উদ্ধৃতি ও প্যারাফ্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে একইভাবে উদ্ধৃতি অথবা গৃহীত বক্তব্যের পাশে তথ্যসূত্র নির্দেশ করার কৌশল: (Kim & Jung, 2019: 70)।

৬. প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স সংযোজিত হবে। তথ্যসূত্র/রেফারেন্স APA স্টাইল অনুসরণে লিখতে হবে। তবে ইংরেজির ক্ষেত্রে লেখকের ফাস্ট নেইম সংক্ষিপ্তরূপে লিখলেও বাংলার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে লেখা যাবে। প্রদত্ত নমুনাগুলো দেখা যেতে পারে:

- **গ্রন্থ:** Authors' last name, First initial. Second initial if given. (Year of publication). *Title of book: Subtitle if given.* Place of publication: Publisher name.

  মুরশিদ, গোলাম (২০০৮)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর।

  হাননান, মোহাম্মদ (২০০০)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: বঙ্গবন্ধুর সময়কাল*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

  Kim, Y. C., & Jung, J. H. (2019). *Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies.* Cham: Palgrave Macmillan.

  Mukherjee, J. (2015). *Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire.* New York, NY: Oxford University Press.

- **জার্নাল প্রবন্ধ:** Authors' last name, First initial. Second initial if given. (Year of publication). Title of article. *Title of journal*, *Volume* (Issue), Page range. URL or DOI if available

আখতার, সাহেদা (২০২১)। মুরারিচাঁদ কলেজকথা: ইতিহাসের পুনঃপাঠ। *মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল*, ২(১), ১৩–৩৩।

Ghosh, P., & Bray, M. (2020). School systems as breeding grounds for shadow education: Factors contributing to private supplementary tutoring in West Bengal, India. *European Journal of Education*, *55*(3), 342-360. https://doi.org/10.1111/ejed.12412

Kobakhidze, M. N. (2014). Corruption risks of private tutoring: Case of Georgia. *Asia Pacific Journal of Education, 34*(4), 455-475. https://doi.org/10.1080/02188791.2014.963506

- **সম্পাদিত গ্রন্থের অধ্যায়:** Author's last name, First initial. Second initial if given. (Year of publication). Title of chapter, article, essay or short story. In Editor's first initial. Second initial if given. Editor's last name (Ed. or Eds.), *Title of book* (pp. page range). Place of publication: Publisher name.

রনো, হায়দার আকবর খান (২০০৯)। চার দশকের বাম রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা। তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশ: রাজনীতির চার দশক* (পৃ. ১৫২-১৬৮)। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

Majumdar, M. (2018). Access, success, and excess: Debating shadow education in India. In K. Kumar (Ed.), *Routledge Handbook of Education in India: Debates, Practices, and Policies* (pp. 273–284). New York, NY: Routledge.

Aurini, J., & Davies, S. (2013). Supplementary education in changing organizational field: The Canadian case. In J. Aurini, S. Davies, & J. Dierkes (Eds.), *Out of the Shadows: The Global Intensification of Supplementary Education* (pp. 155-170). *Bingley:* Emerald.

- **থিসিস/অভিসন্দর্ভ:** Author's last name, First initial. Second initial if given. (Year of publication). *Title of thesis or dissertation* (Dissertation category). University or institution name, Country name.

Amin, M. A. (2017). *Charting the River: A Case Study of English Language Teaching in Bangladesh* (Doctoral dissertation). The University of Canterbury, New Zealand.

৭. কম্পিউটার কম্পোজকৃত পাণ্ডুলিপির দুটি হার্ডকপি সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রবন্ধের সফ্টকপি (PDF ও Microsoft Word File-docx) ই-মেইলে পাঠাতে হবে। A4 সাইজ কাগজে Sutonny MJ ফন্টের ১৪ পয়েন্টস-এ প্রবন্ধের অক্ষরবিন্যাস হবে। Line Space এবং Para Space হবে যথাক্রমে 1.5 ও Auto। ইংরেজি ফন্টের ক্ষেত্রে Times New Roman ব্যবহৃত হবে; ফন্ট ১২ পয়েন্টস, Line Space এবং Para Space

হবে ১.৫। প্রতি পৃষ্ঠায় উপর-নিচ ১ ইঞ্চি ও ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে। প্রবন্ধের সফ্‌টকপি পাঠানোর ই-মেইল ঠিকানা: mccjournalbd@gmail.com এবং কম্পোজকৃত হার্ডকপি পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল, মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট।

৮. গবেষককে তাঁর নাম, পদবি, ঠিকানা (ইমেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বরসহ) ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য গবেষণা প্রবন্ধে না লিখে পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে। রিভিউয়ার কর্তৃক সংশোধন/ সংযোজন/ বিয়োজনের পরামর্শ থাকলে সম্পাদনা পর্ষদের প্রদত্ত সময়ের মধ্যে তা সংশোধন/ সংযোজন/ বিয়োজন করে পাঠাতে হবে।

৯. প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক তাঁর কপি পাবেন। প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনও পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হবে না।

১০. প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে গবেষককে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে: (ক) জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি; (খ) এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ; (গ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনও পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি; (ঘ) এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

সূ চি

১

Dr. Md. Didar Chowdhury Dr. Md. Shah Alam	Study of Reflection of Light by a Moving Mirror Using Mixed Number Lorentz Transformation • ১৫
Probir Roy	The Simple Alternative Proof Regarding the Kissing Number Problem • ২৪
Tahia Siddika, Rahela Akther & Md. Abul Kalam Azad	Teaching Science in Sylhet up to Class Eight: Reality and Appearance • ৩৮

২

জফির সেতু	সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপি • ৫০
দীপংকর মোহান্ত	নানকার ও কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ (১৯৩৬-১৯৪৭): 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ত্ব আইন' ও তৎকালীন রাজনীতি • ৬৬
ড. কামাল উদ্দিন শামীম	সৈয়দ আলী আহসান: শিল্পবোধ ও শিল্পাদর্শ • ৯১
হোসনে আরা কামালী	*জীবন আমার বোন*: বিচ্ছিন্ন—বিচ্যুত ব্যক্তিমানসের রূপকল্প • ১০৫
মোহাম্মদ বিলাল উদ্দিন	*মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত কবিতা (১৯১৭-৩৯): বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল ও কবিকৃতি • ১১৬
আজির উদ্দিন	সিলেটি প্রবাদ: জীবনবোধ ও সমাজদর্শন • ১৩৭
মেহেদী হাসান	কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের গীতে নারীর অন্তর্বয়ন • ১৪৮

ISSN 2707-9201

Study of Reflection of Light by a Moving Mirror Using Mixed Number Lorentz Transformation

Dr. Md. Didar Chowdhury*
Dr. Md. Shah Alam**

Abstract: Mixed number is the sum of a scalar and a vector quantity. It has satisfactory algebra. In terms of Mixed number, a type of most general Lorentz transformation can be derived which we called the Mixed number Lorentz transformation. In this paper we have derived the formula for reflection of light by a moving mirror using Mixed number Lorentz transformation. We have observed that in the case of most general Lorentz transformation, the formula of reflection of light by a moving mirror is very complex but in the case of Mixed number Lorentz transformation, the formula of reflection of light by a moving mirror is very simple.

Keywords: Mixed number; Mixed number Lorentz transformation; Reflection of light; Moving mirror.

1. Introduction

1.1 Mixed Number

Mixed number[1-5], α is the sum of a scalar x and a vector $\vec{A}$, i.e. $\alpha = x + \vec{A}$. It has satisfactory mathematical tools [2].

Two Mixed numbers α and β are equal if x = y and $\vec{A} = \vec{B}$.

The addition of two Mixed numbers can be written as

$$\alpha + \beta = (x + y) + (\vec{A} + \vec{B}) \quad (1)$$

where $\alpha = x + \vec{A}$ and $\beta = y + \vec{B}$.

* Department of Physics, Govt. Teachers' Training College, Sylhet, Bangladesh.
** Department of Physics, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh.

Mixed number, $\alpha = x + \vec{A} = (x + A_1\,\hat{i} + A_2\,\hat{j} + A_3\,\hat{k})$, where x, A_1 , A_2 and A_3 are scalar values and $\hat{i}$, $\hat{j}$ and $\hat{k}$ are basis or unit Mixed numbers. The product of two Mixed numbers α and β is defined as

$$\alpha\beta = (x + \vec{A})\,(y + \vec{B}) = x\,y + \vec{A}\,.\,\vec{B} + x\,\vec{B} + y\,\vec{A} + i\,\vec{A}\times\vec{B} \quad (2)$$

where $\vec{A}\,.\,\vec{B}$ is the scalar product and $\vec{A}\times\vec{B}$ is the vector product of the vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$. The product of Mixed numbers is associative i. e.

$$(\alpha\beta)\,\gamma = \alpha\,(\beta\gamma) \quad (3)$$

where $\gamma = z + \vec{C}$ is another Mixed number. Taking x = y = 0, we get from equation (2)

$$\vec{A} \otimes \vec{B} = \vec{A}\,.\,\vec{B} + i\,\vec{A}\times\vec{B} \quad (4)$$

[The symbol $\otimes$ is chosen for Mixed product]

The equation (4) is called the Mixed product of two vectors [3].

1.2 Lorentz Transformation

1.2a Special Lorentz Transformation

Let us consider the two inertial frame of reference S and S' where S is at rest and the frame S' is moving along X-axis with velocity v with respect to S frame. We have assumed that the origins of both the frames S and S' coincide at the time $t = t' = 0$. The relation between the coordinates of S (x, y, z, t) and S' (x', y', z', t'), which is called the special Lorentz transformation[6], can be written as

$$x' = \gamma\,(x - vt) \quad (5a)$$

$$y' = y \quad (5b)$$

$$[z' = z] \quad (5c)$$

$$t' = \gamma\,(t - vx) \quad (5d)$$

Where $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{(1 - \dfrac{v^2}{c^2})}}$

1.2b Most General Lorentz Transformation

When the velocity $\vec{v}$ of S' frame with respect to S frame is not along X-axis i.e the velocity $\vec{v}$ has three components V_x, V_y and V_z, then the relation between the coordinates of S and S', which is called Most general Lorentz

transformation[7], can be written as

$$\vec{r}' = \vec{r} + \vec{v}\left[\left(\frac{\vec{r}\cdot\vec{v}}{v^2}\right)(\gamma-1) - t\gamma\right] \quad (6a)$$

$$t' = \gamma(t - \vec{r}\cdot\vec{v}) \quad (6b)$$

where $\gamma = \frac{1}{\sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})}}$ and c = 1.

If v_x, v_y and v_z denote the components of the velocity of the system S' relative to S, then equation (6a) and (6b) can be written as

$$x' = \{1+(\gamma-1)\frac{v_x^2}{v^2}\}x + (\gamma-1)\frac{v_x v_y}{v^2}y + (\gamma-1)\frac{v_x v_z}{v^2}z - v_x\gamma t \quad (7a)$$

$$y' = (\gamma-1)\frac{v_x v_y}{v^2}x + \{1+(\gamma-1)\frac{v_y^2}{v^2}\}y + (\gamma-1)\frac{v_y v_z}{v^2}z - v_y\gamma t \quad (7b)$$

$$z' = (\gamma-1)\frac{v_x v_z}{v^2}x + (\gamma-1)\frac{v_y v_z}{v^2}y + \{1+(\gamma-1)\frac{v_z^2}{v^2}\}z - v_z\gamma t \quad (7c)$$

$$t' = -\gamma v_x x - \gamma v_y y - \gamma v_z z + \gamma t \quad (7d)$$

1.2c Mixed Number Lorentz Transformation

Let us consider the velocity $\vec{v}$ of S' frame with respect to S frame is not along X-axis i.e. the velocity $\vec{v}$ has three components V_x, V_y and V_z. Using Mixed number algebra, the relation between the coordinates of S and S' which is called Mixed number Lorentz transformation[8-10] can be written as

$$\vec{r}' = \gamma(\vec{r} - t\vec{v} - i\vec{r}\times\vec{v}) \quad (8a)$$

$$t' = \gamma(t - \vec{r}\cdot\vec{v}) \quad (8b)$$

where $\vec{r}$ and $\vec{r}'$ be the space part of S and S' frames respectively.

If v_x, v_y and v_z denote the components of the velocity of the system S' relative to S, then equation (8a) and (8b) can be written as

$$x' = \gamma\{x - t v_x - i(y v_z - z v_y)\} \quad (9a)$$

$$y' = \gamma\{y - t v_y - i(z v_x - x v_z)\} \quad (9b)$$

$$z' = \gamma\{z - t v_z - i(x v_y - y v_x)\} \quad (9c)$$

$$t' = \gamma(t - x v_x - y v_y - z v_z) \quad (9d)$$

And using inverse Mixed number Lorentz transformation [8-10], we can write

$$x=\gamma\{x'+t'\mathrm{v}_x+i(y'\mathrm{v}_z-z'\mathrm{v}_y)\} \quad (10a)$$

$$y=\gamma\{y'+t'\mathrm{v}_y+i(z'\mathrm{v}_x-x'\mathrm{v}_z)\} \quad (10b)$$

$$z=\gamma\{z'+t'\mathrm{v}_z+i(x'\mathrm{v}_y-y'\mathrm{v}_x)\} \quad (10c)$$

$$t=\gamma(t'+x'\mathrm{v}_x+y'\mathrm{v}_y+z'\mathrm{v}_z) \quad (10d)$$

2. Reflection of Light by a Moving Mirror

2.1 Law of Reflection of Light by a Moving Mirror in the Case of Special Lorentz Transformation

Let us consider two systems S and S', the latter moving with velocity v relative to former along $X - X'$ axis. Now consider a mirror M to be fixed in the $Y' - Z'$ plane of system S'. For simplicity consider the mirror to be perfectly reflecting, moving in the direction of its normal relative to system S'

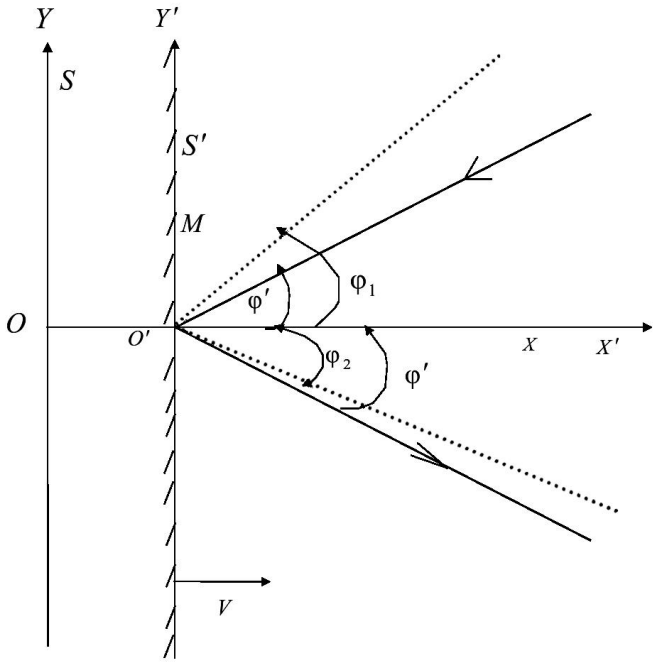

Fig 1: Reflection of light by a moving mirror where a mirror M is fixed in the $Y' - Z'$ plane of system S'.

The law of reflection of light by a moving mirror[11] in the case of special Lorentz transformation can be written as-

$$\frac{\sin\phi_1}{\cos\phi_1+\mathrm{v}}=\frac{\sin\phi_2}{\gamma(\cos\phi_2-\mathrm{v})} \tag{11}$$

2.2 Law of Reflection of Light by a Moving Mirror in the Case of Most General Lorentz Transformation

Let us consider two systems S and S' where the system S' is moving with the velocity $\vec{\mathrm{v}}$ with respect to the system S along any arbitrary direction i.e. the velocity of $\vec{\mathrm{v}}$ have two components V_x and V_y. Now consider a mirror M to be fixed in the $Y'-Z'$ plane of system S'. For simplicity consider the mirror to be perfectly reflecting, moving in the direction of its normal relative to system S'.

The law of reflection of light by a moving mirror in the case of Most general Lorentz transformation[12] can be written as

$$\frac{\gamma \mathrm{v}_y \mathrm{v}^2+\sin\phi_1 \mathrm{v}^2+(\gamma-1)\mathrm{v}_x\mathrm{v}_y\cos\phi_1+(\gamma-1)\mathrm{v}^2{}_y\sin\phi_1}{\gamma \mathrm{v}_x \mathrm{v}^2+\cos\phi_1 \mathrm{v}^2+(\gamma-1)\mathrm{v}^2{}_x\cos\phi_1+(\gamma-1)\mathrm{v}_x\mathrm{v}_y\sin\phi_1}=$$
$$\frac{-\gamma \mathrm{v}_y \mathrm{v}^2-\sin\phi_2 \mathrm{v}^2+(\gamma-1)\mathrm{v}_x\mathrm{v}_y\cos\phi_2-(\gamma-1)\mathrm{v}^2{}_y\sin\phi_2}{\gamma \mathrm{v}_x \mathrm{v}^2-\cos\phi_2 \mathrm{v}^2+(\gamma-1)\mathrm{v}_x\mathrm{v}_y\sin\phi_2-(\gamma-1)\mathrm{v}^2{}_x\cos\phi_2} \tag{12}$$

2.3 Law of Reflection of Light by a Moving Mirror in the Case of Mixed Number Lorentz Transformation

Let us consider two systems S and S' where the system S' is moving with the velocity $\vec{\mathrm{v}}$ with respect to the system S along any arbitrary direction i.e. the velocity of $\vec{\mathrm{v}}$ has two components V_x and V_y. Now consider a mirror M to be fixed in the $Y'-Z'$ plane of system S'. For simplicity consider the mirror to be perfectly reflecting, moving in the direction of its normal relative to system S'.

Let the corresponding angles of incidence and reflection as measured by observer in system $[S]$ be $[\phi_1]$ and $[\phi_2]$. For measuring the angles, we shall use the convention that all angles between positive X-axis and the positive direction of travel of light are positive. According to this convention angle of

incidence is $[(\pi+\varphi')]$in system S' and $[(\pi+\phi_1)]$ in system S; while the angle of reflection is $[(2\pi-\varphi')]$ in system S' and $[(2\pi-\phi_2)]$ in system S.

Let the incident ray in system S and S' be represented by ψ and ψ' where

$$\psi = \frac{A}{\gamma}\exp[2\pi i\nu\{t-\frac{x\cos(\pi+\phi_1)+y\sin(\pi+\phi_1)}{c}\}] \quad (13)$$

and $$\psi' = \frac{A'}{\gamma'}\exp[2\pi i\nu'\{t'-\frac{x'\cos(\pi+\phi')+y'\sin(\pi+\phi')}{c}\}] \quad (14)$$

where ν and ν' are the frequencies of the wave as observed from systems S and S' respectively. As phase is a Lorentz invariant quantity, using equation (13) and (14) we must have

$$\nu\{t+\frac{x\cos\phi_1+y\sin\phi_1}{c}\} = \nu'\{t'+\frac{x'\cos\phi'+y'\sin\phi'}{c}\} \quad (15)$$

Using c=1 we get from equation (15) can be written as

$$\nu\{t+x\cos\phi_1+y\sin\phi_1\} = \nu'\{t'+x'\cos\phi'+y'\sin\phi'\} \quad (16)$$

Now using equations (9a), (9b) and (9d) in equation (16), considering the velocity of $\vec{v}$ have two components V_x and V_y, we get

$$\nu\{t+x\cos\phi_1+y\sin\phi_1\} = \nu'\{\gamma(t-xv_x-yv_y)+\gamma(x-tv_x)\cos\phi'+\gamma(y-tv_y)\sin\phi'\}$$

[as $v_z = 0$ and z=0] (17)

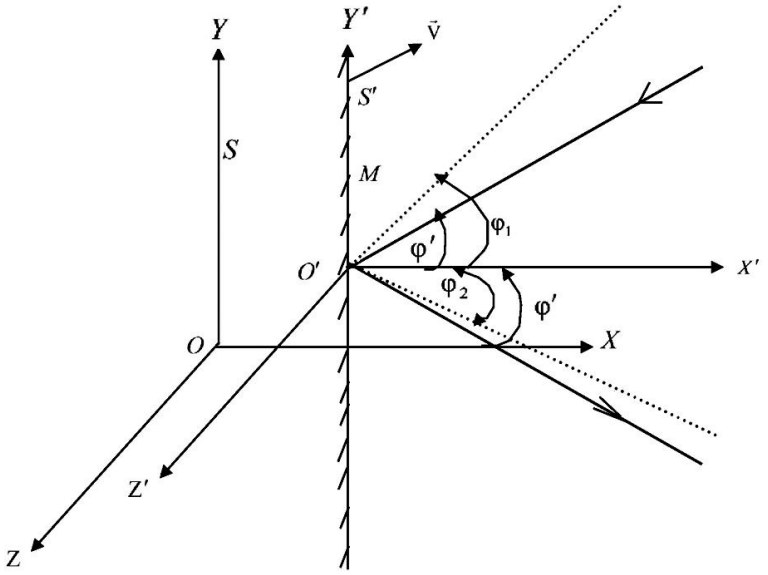

Fig 2: The system S′ is moving in any arbitrary direction with velocity $\vec{v}$ relative to the system S where a mirror M is fixed in the $Y'-Z'$ plane of system S'.

Equating coefficients of t in above equation (17), we get

$$\nu = \nu' \gamma \{1 - v_x \cos \phi' - v_y \sin \phi'\} \tag{18}$$

Now equating coefficients of x in equation (17), we get

$$\nu \cos \phi_1 = \nu' \{-\gamma v_x + \gamma \cos \phi'\} \tag{19}$$

Using equation (18), we get from equation (19)

$$\cos \phi_1 = \frac{\cos \phi' - v_x}{1 - v_x \cos \phi' - v_y \sin \phi'} \tag{20}$$

Now equating coefficients of y in equation (17), we get

$$\nu \sin \phi_1 = \nu' \{-\gamma v_y + \gamma \sin \phi'\} \tag{21}$$

Using equation (18), we get from equation (21)

$$\sin \phi_1 = \frac{\sin \phi' - v_y}{1 - v_x \cos \phi' - v_y \sin \phi'} \tag{22}$$

Combining equations (20) and (22), we get

$$\tan \phi_1 = \frac{\sin \phi' - v_y}{\cos \phi' - v_x} \tag{23}$$

This equation (23) gives the exact relativistic aberration formula. Now using equations (10a), (10b) and (10d) in equation (16), considering the velocity of $\vec{v}$ have two components V_x and V_y, we get

$$\cos \phi' = \frac{v_x + \cos \phi_1}{1 + v_x \cos \phi_1 + v_y \sin \phi_1} \tag{24}$$

$$\text{and} \quad \sin \phi' = \frac{v_y + \sin \phi_1}{1 + v_x \cos \phi_1 + v_y \sin \phi_1} \tag{25}$$

Combining equations (24) and (25), we get

$$\tan \phi' = \frac{\sin \phi_1 + v_y}{\cos \phi_1 + v_x} \tag{26}$$

Similarly for reflected ray the relation between angle of reflection in systems s and s' is obtained as

$$\tan\phi' = \frac{\sin\phi_2 + v_y}{\cos\phi_2 - v_x} \tag{27}$$

From equations (26) and (27), we get

$$\frac{\sin\phi_1 + v_y}{\cos\phi_1 + v_x} = \frac{\sin\phi_2 + v_y}{\cos\phi_2 - v_x} \tag{28}$$

This equation (28) is the law of reflection of light by a moving mirror in the case of Mixed number Lorentz transformation.

3. Comparison of Reflection of Light by a Moving Mirror in Special, Most General and Mixed Number Lorentz Transformation

The law of reflection of light by a moving mirror in the case of Special Lorentz transformation

$$\frac{\sin\phi_1}{\cos\phi_1 + v} = \frac{\sin\phi_2}{\gamma(\cos\phi_2 - v)}$$

The law of reflection of light by a moving mirror in the case of Most general Lorentz transformation

$$\frac{\gamma v_y v^2 + \sin\phi_1 v^2 + (\gamma-1) v_x v_y \cos\phi_1 + (\gamma-1) v_y^2 \sin\phi_1}{\gamma v_x v^2 + \cos\phi_1 v^2 + (\gamma-1) v_x^2 \cos\phi_1 + (\gamma-1) v_x v_y \sin\phi_1} = \frac{-\gamma v_y v^2 - \sin\phi_2 v^2 + (\gamma-1) v_x v_y \cos\phi_2 - (\gamma-1) v_y^2 \sin\phi_2}{\gamma v_x v^2 - \cos\phi_2 v^2 + (\gamma-1) v_x v_y \sin\phi_2 - (\gamma-1) v_x^2 \cos\phi_2}$$

and the law of reflection of light by a moving mirror in the case of Mixed number Lorentz Transformation

$$\frac{\sin\phi_1 + v_y}{\cos\phi_1 + v_x} = \frac{\sin\phi_2 + v_y}{\cos\phi_2 - v_x}$$

4. Conclusion

We have derived the formula for the law of reflection of light by a moving mirror using Special Lorentz tranformation, Most general Lorentz transformation and Mixed number Lorentz transformation. We have observed that in the case of Most general Lorentz transformation, the formula of the law of reflection of light by a moving mirror is very complex but in the case of Mixed number Lorentz transformation, the formula of the law of reflection of light by a moving mirror is very simple. Therefore, we can conclude that Mixed number Lorentz transformation is more appropriate for

the study of reflection of light by a moving mirror when the mirror moves in any arbitrary direction instead of $X -$ axis.

References

1. M. S. Alam, *Proc. Pakistan Acad. Sci*. 37, 119-122 (2000)
2. M. S. Alam, M. H. Ahsan & M. Ahmed, *J. Natn. Sci. Foundation Sri Lanka.* 33, 43-49 (2005)
3. M. S. Alam, *J. Theoritics.* 3(4), (2001). http://www. journaloftheoretics. com/Articles/3-4/MPVector. pdf
4. M. S. Alam, *Indian J. Phys.* A 77, 47-49 (2003)
5. M. S. Alam, *J. Theoritics.* 3(6), (2001)
6. R. Resnik, *Introduction to Special Relativity* (Wiley, New York, 1968)
7. C. Moller, *The Theory of Relativity* (Oxford University Press, London, 1972)
8. M. S. Alam & M. H. Ahsan, *Physics Essays.* 6(4), 530-536 (2003)
9. M. S. Alam, *Proc. Pakistan Acad. Sci*. 41(2), 141-147 (2004)
10. M. S. Alam & M. D. Chowdhury, *J. Natn. Sci. Foundation Sri Lanka.* 34(3), 143-148 (2006)
11. S. Prakash, *Relativistic Mechanics* (Pragati Prakash, India, 1993-1994)
12. M. S. Alam & M. D. Chowdhury, *Indian J. Phys.* 83(2), 233-240 (2009)

ISSN 2707-9201

The Simple Alternative Proof Regarding the Kissing Number Problem*

Probir Roy**

Abstract: In this paper, we are trying to prove that the kissing numbers $k(n)$ in one, two, and three dimensions are 2, 6, and 12, respectively. Also, we will be able to measure the unused area and volume while using circle and sphere packing, aiming to find the kissing numbers in different dimensions through this article. From the conventional exhibited model, we can easily understand how many kissing numbers are in the one, two, and three-dimensional space, but sometimes its mathematical explanation seems complex. We are hopeful that by using area formulae, the formation of inequalities, volume formulae, the process of arrangement of things, and mathematical logic, we can reach the proof. This short article is neither a complete research article nor an academic one. It is analogous to a combination of research and academic article type, and this endeavor is suitable for newcomers to this topic, especially for junior readers.

Keywords: Circle; Sphere; Newton; Gregory; Kissing; Area; Volume.

1. Introduction

The idea of kissing numbers originated with Sir Isaac Newton. For this reason, other names of kissing numbers are Newton's number and contact

---

* **Dedication:** We have dedicated this paper to Raja Girish Chandra Roy, the great founder of Murarichand College, Sylhet, Bangladesh & Syed Abdul Majid (Kaptan Miah) CIE, the political leader and Minister of the then Assam province in British India.

** Associate Professor, Department of Mathematics, Murarichand College, Sylhet-3100, Bangladesh.

number. The maximum number of non-overlapping unit spheres where each can kiss or touch a central unit sphere is known as the kissing number. Conventionally it is denoted by the symbol $k(n)$. A famous debate was arisen on the Cambridge University Campus in 1694 between Sir Isaac Newton and David Gregory regarding the kissing number in three dimensions. Newton determined that the kissing number in three dimensions is $k\ (3)\ =\ 12$, but Gregory thought it is $k\ (3)\ =\ 13$, and he said that in-between spaces of spheres, there is enough space to insert the 13th sphere. An article proved the impossibility of 13 spheres [1]. Next time in 1874, German mathematician Ernst Reinhold Eduard Hoppe delivered some incomplete proofs about the kissing number $k\ (3)\ =\ 12$ [2]. Finally, the truthiness of $k\ (3)\ =\ 12$ was successfully proved by Brass, Moser, and Pach in 1953 [3]. Later, various alternative proofs have been published in the journal articles [4, 5, 6, 7]. Explanations of these high quality articles are sometimes hard to understand for junior readers concerning topics like mine. That's why we are trying to make simple mathematical logic for better understanding for those readers. Hoping, in this field, our article can add something a different way to explain kissing numbers and demonstrate its proof geometrically and logically.

2. Preliminaries

2.1 Area of an Equilateral Triangle

Suppose ΔABC is an equilateral triangle with the sides $AB = BC = CA = a$. We draw a perpendicular AD from the vertex A to the base BC. Let the height of the triangle is $AD = h$ and the amount of every internal angle of the triangle ABC is $\frac{\pi}{3}$ rad. So, each external angle will be $\frac{2\pi}{3}$ rad. Now we consider the below Figure:

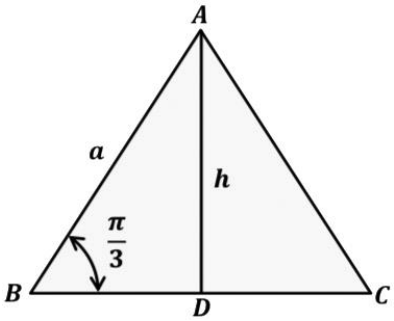

Fig 1: Equilateral Triangle

In Figure 1, $sinB = \frac{AD}{AB}$ or, $sin\frac{\pi}{3} = \frac{h}{a}$ or, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{a}$

∴ The height of the triangle ABC is $h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ units. Therefore, the area of the triangle ABC is $\Delta = \frac{1}{2} \times BC \times AD = \frac{1}{2} \times a \times h = \frac{1}{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}a}{2} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$ sq. units.

2.2 Sector of a Circle

For any circle, we know that an arc length, the angle subtended at the center of that circle by that arc length, and the respective area of the sector of that circle is proportional.

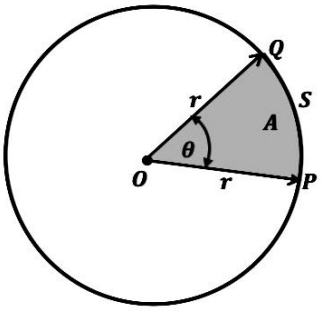

Fig 2: Radian angle and sector

We have the relation from the figure above:

$$\frac{Total\ circumference}{Arc\ length\ of\ sector} = \frac{Central\ plane\ angle}{Angle\ of\ sector} = \frac{Area\ of\ entire\ circle}{Area\ of\ sector}$$

Or, $\frac{2\pi r}{PQ} = \frac{2\pi}{\theta} = \frac{\pi r^2}{A}$, where $OP = OQ = r = Radius$

Or, $\frac{2r}{S} = \frac{2}{\theta} = \frac{r^2}{A}$, where $PQ = S = r\theta = Arc\ length.$

∴ The area of the sector is $A = \frac{1}{2}r^2\theta$, where θ is the amount of angle in radian unit.

2.3 Circle and Sphere Packing

Circle packing is directly related to combinatorics and Euclidean or Non-Euclidean geometry in both uniform and non-uniform sizes of circles, and it maintains non-overlapping situations. It is a two-dimensional packing system on a plane surface into polygons or circles. Here usually, we observe different kinds of circle packing, e.g., loose packing, compact or close packing, etc. Concerning the kissing number problem, we will have to choose the compact packing of uniform or identical circles into another smallest circle such that all of these uniform circles can touch the same central circle. From the web portal [13] sample of loose and compact packing in the two-dimensional space is given below:

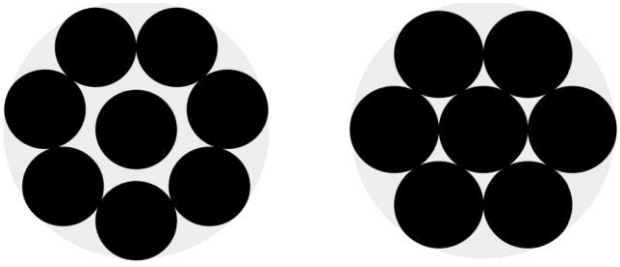

Fig 3: Circle packing into a circle

In Figure 3, it is evident that loose packing cannot search the kissing number, whereas compact packing can assert the goal. Sphere packing is analogous to circle packing. It is a generalization in the three-dimensional Euclidean space with identical spheres aiming to search for the kissing number in three dimensions that can fulfill our target. From the web portal [14] sample of loose and compact packing in the three-dimensional Euclidean space is given below:

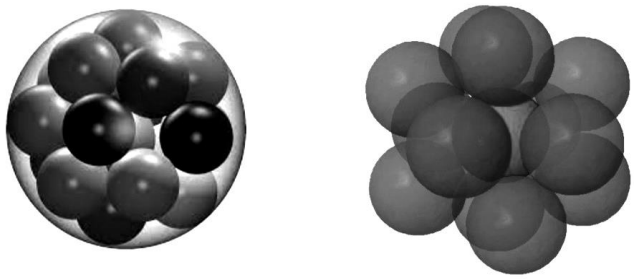

Fig 4: Sphere packing in 3D space

In Figure 4, if we consider a sphere containing some small spheres of the same size, it is again evident that loose packing cannot be an effective system for finding kissing numbers. We must determine the kissing number followed by compact packing.

2.4 Volume of Cylinder and Sphere

Cylinder, Cone, and Sphere are very closely related to one another in the case of volume measurement. The cylinder's volume is easier to understand, and the volume V of a right circular or oblique circular cylinder is measured by the formula $V = Base\ area \times Height$. Now we want to determine the volume of the sphere with the help of the right circular cylinder. To complete this measurement of the volume, we take the figure below:

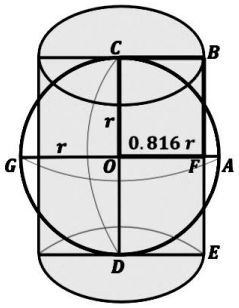

Fig 5: Volume of the Sphere through a Cylinder

In Fig: 5, we apply a transformation procedure for making the great-circle sector OAC into rectangular shape named $OFBC$ without changing the height $OC = r$. It is clear that the half-cylinder with base radius r_1, where $0 < r_1 < r$, height r, is created by the single rotation of the rectangle $OFBC$. For the new making cylinder, the scaling is $OA = OC = 16$ cells = 1 inch = r, $OF = r_1 = 13.056$ cells (approximate) = 0.816 inches = $0.816\,r$. Here, the volume of the new half-cylinder with base radius $r_1 = 0.816r$ and height r is $V_{\frac{1}{2}cyl} = \pi {r_1}^2 \times r = \pi\,(0.816\,r)^2 \times r = 0.666\,\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi r^3$ cubic units (approximate). The volume of the hemisphere with radius $OA = OG = r$ is the same as the volume of the new half-cylinder because, in a reverse way, we can return to the hemisphere from the half-cylinder again. So, the volume of the hemisphere with radius r is $V_{\frac{1}{2}sphere} = \frac{2}{3}\pi r^3$, and hence the volume of the entire sphere is $V_{sphere} = 2 \times V_{\frac{1}{2}sphere} = \frac{4}{3}\pi r^3$ cubic units. Also, the volume of the entire cylinder with base radius r and height $2r$ is $V_{cyl} = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$. Here, $V_{sphere} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3} \times 2\pi r^3 = \frac{2}{3}\,V_{cyl}$, which is a significant relationship between the volume of a cylinder and a sphere with the same radius and height.

3. The Methodology

Since the central sphere must be touched by the other spheres, we will make the best use of the 2D geometric plane area and 3D geometric space in the light of the conditions for kissing number so that we can know how much geometric plane areas are enclosed by the corresponding great circles of the identical sphere and how much volume is covered by the spheres. To prove the kissing number, we will use the following two schemes to conduct our search:

i) To find the kissing number in one and two dimensions, the respective great circles will construct with the equal radius of the sphere and see how many maximum spheres are touching the central one in one and two dimensions followed by the non-overlapping positions. These numbers express the deterministic kissing numbers in one and two-dimensions because this indicates how many spheres can be placed in such 1D and 2D geometric planes.

ii) To find the kissing number in the three-dimensional case, we will take the great circles, including central one obtained in the two-dimensional system and consider it a layer. Then we will observe how many more spheres can be placed on its upper and lower layer portions so that each sphere can touch the central one. In this case, the final decision will be taken by analyzing the combined geometric volume of as many spheres as can be placed in this volume.

4. Main Results

Here, we have some equal size spheres with the same radius r. Now we would like to find out the number of spheres, i.e., kissing number $k(n)$ in such a way that every sphere can touch the central one sphere in one, two, and three dimensions.

4.1 Kissing Number in One Dimension, i.e., k (1)

We are familiar with 2D circle packing as an arrangement of circles on a plane surface such that no overlapping occurs, which is related to finding the number of $k(1)$ and $k(2)$. We have the following sphere with center C and radius $CP = r$

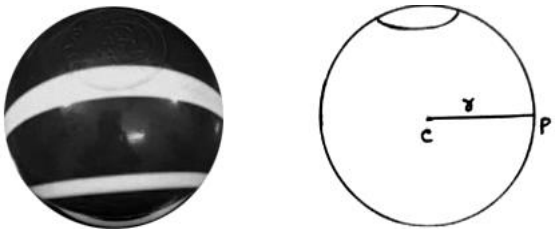

Fig 6: Single sphere and projection of its great circle

In a single direction, it is very much clear to all that, from the left and right side in total maximum of two spheres can touch the central one like the figure below:

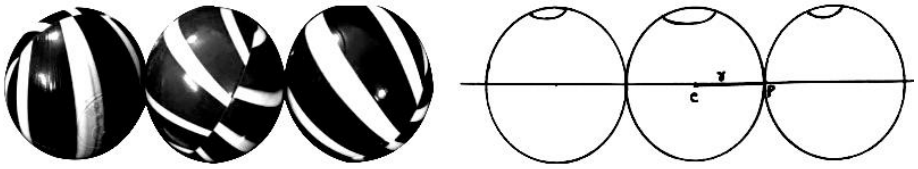

Fig 7: Three spheres and projection of their great circles

Therefore, the kissing number in one dimension is $k\ (1)\ =\ 2$

4.2 Kissing Number in Two Dimensions, i.e., $k\ (2)$

From Fig: 7, we take the projection of great circles and get the following figure:

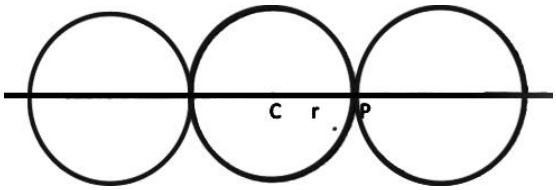

Fig 8: 2D projection of great circles

To find the number of spheres surrounding the central pink-colored sphere in two dimensions, we insert the same size great circle touched by the left-sided two great circles in Figure 8. Now by centering the point C (center of the central pink-colored sphere) and with the radius $3r$, we draw a circle that touches the two green-colored circles at the two ends, and hence we have got the following figure:

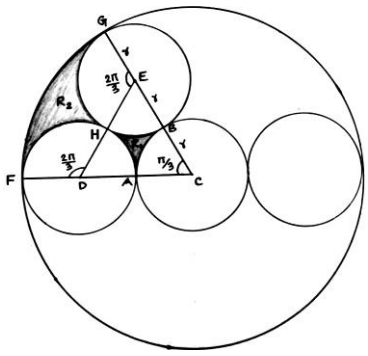

Fig 9: Circle packing for $k\ (2)$

The area of the new circle is $9\pi r^2$ sq. units. Suppose this new field contains an area equal to the area of n circular field with the same radius r. Here, triangle

CDE is an equilateral triangle because each side is $2r$. Now we find the area of the regions R_1 and R_2 marked in Figure 9. The region $R_1 = \Delta CDE - 3 \times$ Sector $CAB = \frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 - 3 \times \frac{1}{2}r^2\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}r^2 - \frac{\pi r^2}{2}$ [With the help of sub sections 2.1 and 2.2].

Also, the region R_2 = Sector CFG − Sector GEH − Sector FDH − ΔCDE

$= \frac{1}{2}(3r)^2\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2}r^2\frac{2\pi}{3} - \frac{1}{2}r^2\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = \frac{5\pi r^2}{6} - \sqrt{3}r^2$.

So, $R_1 + R_2 = \frac{\pi r^2}{3}$ sq. units.

We know from the circular permutation there is an n-number of places between n things. Therefore, the total area outside the n number of circles and within the $9\pi r^2$ areas = $n \times (R_1 + R_2)$. Here we can form an area-related inequality $9\pi r^2$- $n \times (R_1 + R_2) < n \times \pi r^2$ [8]. This inequality implies that $n > 6.75$

4.2.1 *Choosing the Perfect Value of n*

(i) If $n = 7$, there are 7 - 1 = 6 non-overlapping spheres that touch the central sphere, and this result verifies the $9\pi r^2$ areas by $7\pi r^2 + 6 \times (R_1 + R_2)$ = $9\pi r^2$

(ii) If $n = 8$, the result doesn't verify the $9\pi r^2$ areas by $8\pi r^2 + 7 \times (R_1 + R_2) = \frac{31\pi r^2}{3}$.

Similarly, $n > 8$ doesn't satisfy the mathematical logic.

Therefore, the kissing number in two dimensions is $k\,(2) = 6$, for a similar procedure [9]. The final figure for $k\,(2) = 6$, is given here:

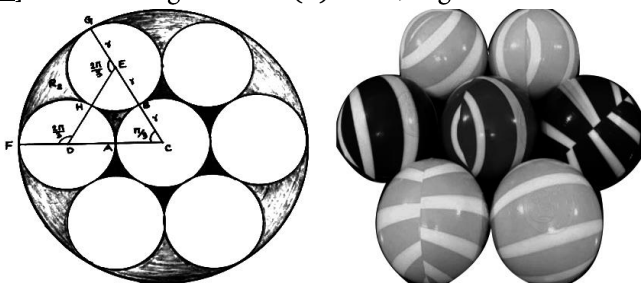

Fig 10: Final figure for $k\,(2)$

Figure 10 has been done as a follow-up to Figure 9, where the compact circle packing has been used, and the condition of the kissing number has been observed. As a result, we got the job done in the two-dimensional space, and it is $k\,(2) = 6$.

4.3 Kissing Number in Three Dimensions, i.e., $k\,(3)$

We sometimes discuss the problems of sphere packing in Euclidean geometry. The kissing number problem in three dimensions, i.e., $k(3)$ is a special case of sphere packing in 3D space so that none of the spheres can overlap the others.

To determine the maximum number of spheres that can touch around the equal size central sphere in three dimensions, we have taken Figure 11 below from the two-dimensional kissing number figure 10:

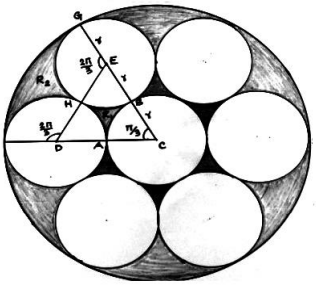

Fig 11: 2D plane in 3D space

Now we consider the above figure as a layer, so, in the three dimensions, there are other layers located in the upper and the lower position. Let there be n number of non-overlapping spheres of the same size (excluding the central sphere), and those each can touch the same size central sphere. If we imagine six cylinders with the above six circles in the layer as the bases and $6r$ as the height of the cylinders, the sum of the volume of the respective space will be $(6\pi r^2 \times 6r)$ cubic units. Since the above-mention n spheres must be non-overlapping, here we have another volume-related inequality which is $\frac{2}{3} \times (6\pi r^2 \times 6r) > n \times \frac{4}{3} \times \pi r^3$ [with the help of the area found in sub-sub section 4.2.1, and the relation between the volume of the cylinder and sphere in 2.4], for a similar conception video [10] and article [11, 12]. This inequality again implies that $n < 18$

4.3.1 *Investigation of the Values of n and Choosing the Logically Correct One*

(i) If $n = 17$, there will have to be 5.5 spheres in each of the upper and lower layers because the middle layer contains six kissing spheres, but this is impossible because the number of spheres can't be a fraction. Therefore, $n < 17$

(ii) If $n = 16$, there will have to be five spheres $(S_1, S_2, S_3, S_4, S_5)$ in each upper and lower layer. But this is not possible because although five spheres can be fit here while maintaining a non-overlapping situation, all of them at a

time could not touch the central sphere shown in the figure below (in the upper layer):

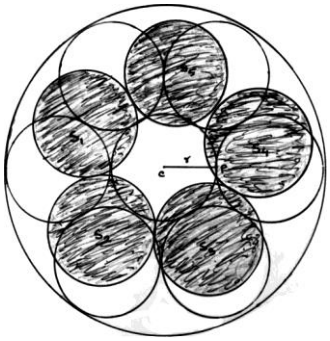

Fig 12: Wrong sphere packing-1 for kissing number

In Fig: 12, the middle layer contains six spheres, excluding the central sphere. On the upper layer, we can arrange five spheres contacted or touched by one after another. Although these can kiss themselves in a series, in place of loose packing, all cannot kiss the central sphere. So, this arrangement should not be accepted for finding the kissing number in a three-dimensional case. Therefore, $n < 16$

(iii) If $n = 15$, the same logic described in sub-sub section 4.3.1(i) is applicable.

Therefore, $n < 15$

(iv) If $n = 14$, there will have to be four spheres (S_1, S_2, S_3, S_4) in each upper and lower layer. But this is not possible because although four spheres can be fit here while maintaining a non-overlapping situation and two spheres (S_1, S_2) out of the four spheres can touch the central sphere, the rest two spheres (S_3, S_4) could not touch the central sphere shown in the figure below (in the upper layer):

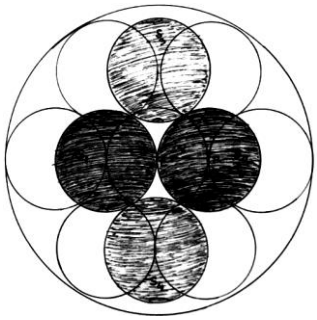

Fig 13: Wrong sphere packing-2 for kissing number

In Figure 13, despite spheres S_1, S_2, S_3, and S_4 being in compact packing, the two purple-colored spheres can touch the central sphere, but the two pink-colored spheres can't. So, compact packing does not always ensure the kissing number. Therefore, $n < 14$

(v) If $n = 13$, the situation is similar to sub-sub section 4.3.1(i).

Therefore, $n < 13$

(vi) If $n = 12$, we will get three spheres (S_1, S_2, S_3) in each upper and lower layer, and all of them can touch the central sphere shown in the figure below (in the upper layer):

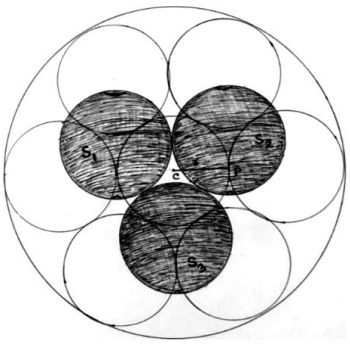

Fig 14: Successful sphere packing for kissing number

In Figure 14, all three non-overlapping purple-colored spheres (S_1, S_2, S_3) can touch the central sphere. We observe the phenomenon in both the lower and the upper layer and 3D non-overlapping 12 identical spheres which can touch or kiss the same central sphere in the following figures:

Fig 15: Final figure for k (3)

Figure 15 has been done as a follow-up to Figure 14, where the compact sphere packing has been used, and the condition of the kissing number has been observed.

4.3.2 *Result of* k (3)

If $n = 10, 8$, the condition of touching the central sphere is celebrated, but as per the definition of kissing number, the maximum value of n is 12. Therefore, the kissing number in three dimensions is $k\ (3) = 12$.

5. Discussion

In determining the kissing number, it saw that the work is directly related to the packing geometry. Again in packing geometry, compact packing of circles within circles and spheres within spheres inherently governs the kissing number. It also saw that we lost some spaces in the two and three-dimensional cases because circles and spheres do not form by regular polygon-based objects. Such a loss we cannot avoid by any means because the kissing numbers have to do in a non-overlapping manner. In two dimensions, we need at least $9\pi r^2$ sq. units area for kissing number $k(2) = 6$.

In three dimensions, we need at least $\frac{2}{3} \times (9\pi r^2 \times 6r) = 36\pi r^3$ cubic units volume for kissing number $k(3) = 12$.

If we want to calculate the area of unused parts of the two-dimensional circular region and three-dimensional spherical space after finding out the kissing number, it is possible. It is mentionable that such vacuum parts should be thought of as belonging to packing because we cannot fit the maximum number of spheres over there using less area and space so that we can determine the kissing number properly.

Up to three dimensions, we have successfully proved that the maximum number of spheres that kiss or touch the same central sphere are 2, 6, and 12. Mathematically, there is no losing point from our hands in one dimension that we can use to touch the central sphere by others. But for two and three-dimensional cases, there have lost area and volume. For the two dimensions, there have been lost $6\ (R_1 + R_2) = 2\pi r^2$ sq. units area in 2D space where we could not fit a single sphere because these areas are discrete. In the three dimensions, there have lost $\frac{2}{3} \times 9\pi r^2 \times 6r - 13 \times \frac{4}{3} \times \pi r^3 = \frac{56}{3}\ \pi r^3$ cubic units volume in 3D space where we could not insert a single sphere because, on the one hand, these volumes are discrete, and another hand, despite there being sufficient volumes in our hands, we could fit nothing non-overlapping sphere there so that it can touch the central sphere.

However, possibly, we can utilize these lost spaces calculated in the above mathematical search to fulfill another aim, if any. For this reason, we represent these results here.

6. Conclusion

Presenting any topic in an easy-to-understand manner increases the interest and curiosity of the readers in this topic, resulting in a kind of development of the content among the general readers. The incomprehensibility of mathematics and science-related content often makes us skipping tendency to the content. So, many interesting and important topics in these disciplines remain elusive to common readers like me.

Proof of the kissing number problem gradually in higher dimensions is complex, and sometimes it is hard to understand for junior readers. Our small effort through this writing aimed at making the proof of the kissing number problem interesting and easier for general readers of the content. However, in this paper, we tried to represent some simple explanations and logic regarding the kissing number problem with only up to three dimensions aimed at new readers of the topics. Through this short article, we tried to prove the accurate results of kissing numbers in one, two, and three dimensions and to reconcile the debate between two great scientists, Sir Isaac Newton, and David Gregory. Finally, we have found that Newton's kissing number $k\,(3) = 12$ is more logical and correct. We think the junior readers will get a rhythm to thinking regarding kissing numbers up to three dimensions through this article, and consequently, they will contribute to higher dimensions.

Acknowledgments

I want to express my heartiest gratitude to all the writers for kissing numbers in various articles from which I have completed my little effort. I also would like to thank the editorial team, honorable reviewers of this manuscript, and the officials of *The Murarichand College Journal* for making my manuscript publishable and accelerating its publication. I extend my heartfelt thanks to all the readers of this article.

References

[1] H. Maehara, The problem of the thirteen spheres-a proof for undergraduates, *Eur. J. Comb.* 28(6) (2007) 1770-1778. https://doi.org/10.1016/j.ejc.2006.06.019

[2] Wikipedia, Kissing number, Retrived from https://en.m.wikipedia.org/ wiki/ Kissing_number

[3] Peter Brass, William O. J. Moser, Janos Pach, *Research Problems in Discrete Geometry*, Springer, New York, NY, 2005.

[4] K. Schütte, B. L. van der Waerden, Das problem der drizehn kugeln, *Math. Annalen* 125 (1953) 325–334. https://doi.org/10.1007/BF01343127

[5] Oleg R. Musin, The kissing problem in three dimensions, *Discrete Comput. Geom.* 35(3) (2006) 375-384. https://doi.org/10.1007/s00454-005-1201-3

[6] Florian Pfender, Günter M. Ziegler, Kissing numbers, sphere packings, and some unexpected proofs, *Not. Am. Math. Soc.* 51(8) (2004) 873-883. http://www.ams.org /notices/200408/fea-pfender.pdf

[7] Alexey Glazyrin, A short solution of the kissing number problem in dimension three, *Discrete Comput. Geom.* 69(3) (2023) 931-935. https://doi.org/10.1007/s00454-021-00311-6

[8] Hugo Parlier, Kissing numbers for surfaces, *J. Topol.* 6(3) (2013) 777-791. https://doi.org/10.1112/jtopol/jtt012

[9] Matthew Jenssen, Felix Joos, Will Perkins, On kissing numbers and spherical codes in high dimensions, *Adv. Math.* 335(2018) 307-321. https://doi.org/10.1016/j.aim.2018.07.001

[10] Numberphile, Kissing Numbers, https://www.youtube.com/ watch?v= LZ7X_YOfJqY

[11] Martin Aigner, Günter M. Ziegler, The problem of the thirteen spheres, in: *Proofs from THE BOOK*, Springer, 1998, pp. 67-71.

[12] Ian Stewart, The kissing Number, *Sci. Am.* 266(2) (1992) 112-115. doi:10.1038/scientificamerican0292-112

[13] Wikipedia, Circle Packing, Retrived from https://en.wikipedia.org/ wiki/Circle_ packing_ in_a_circle

[14] Wikipedia, Sphere Packing, Retrived from https://en.wikipedia.org/ wiki/ Sphere_packing

ISSN 2707-9201

Teaching Science in Sylhet up to Class Eight: Reality and Appearance

Tahia Siddika[*]
Rahela Akther[**]
Md. Abul Kalam Azad[***]

Abstract: The study aims to reveal the ideal teaching-learning strategies of science in Sylhet's rural classrooms through a mixed methodological approach of research design. 180 rural students were randomly selected, and 15 science teachers from 10 schools were selected as key respondents. 12 science lessons were observed to collect data. Data were also collected from student questionnaires, teacher interviews, and classroom observation by the researcher. Up to class eight, science teaching-learning activities were not conducted according to the instructions of the science curriculum. Most of the teachers were not concerned with the curriculum and TG (Teacher's Guide). Teachers used to follow lecture methods for delivering lessons. Learning by doing, demonstrating real examples, scientific inquiry, rational thinking, and analyzing cause-effect relationships were found to be nearly absent. Teachers reported excess pressure from a number of classes and a lack of practical equipment as reasons for not performing curriculum-based activities. Teachers are careless about using proper teaching aids. Science teaching-learning is going on fully lecture-based devoid of participating the students in the classroom.

[*] Vice Principal, The Sylhet Khajanchibari International School & College, Sylhet-3100, Bangladesh.

[**] Assistant Teacher, Scholarshome Majortila School and College, Sylhet-3100, Bangladesh.

[***] Professor, Department of Botany, Murarichand College, Sylhet-3100, Bangladesh.

Keywords: curriculum; science teaching; TG; random sampling; mixed methodology; Sylhet.

1. Introduction

Science education originated in Western countries in the nineteenth century (Layton, 1981). In Bangladesh, the National Curriculum Committee prepared detailed curricula and syllabi for primary and secondary schools in 1974 (MoE, 1974). Science is a major contributor to cultural development and our understanding of the world (Mathews, 1994). School curricula quite rightly consider science an important subject (Yadav, 1992), and it is increasingly viewed as a subject of lifelong utility to students whether or not they enter science-related careers (Ware, 1992). At present, the curriculum provided by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) is followed to teach science. Effective science education is true to the child, true to life, and true to science (NCERT, 2006). Effective science teaching practice in school is a must to ensure good science education. Gomes (2007) argued that school science provides a gateway to young learners to meet various scientific ideas, and principles, and to develop attitudes that promote rational thinking. The Science and Technology Committee reported that science teaching ensures scientific literacy in society and equips the next generation of scientists and engineers to progress to higher education. Therefore, school-level science teaching and learning is very important. Becoming a science teacher is a creative process as it involves the selection of appropriate teaching methods, itself a creative process (Hassard & Dias, 2011). A few science teaching strategies have been suggested. For example, Ministry of Education (1977), Church (2000), Carin, Bass and Contant (2005), and Hoisington, suggested inquiry-based teaching. McCrea (2006), Braund and Reiss (2006), and Chandler and Swartzentruber (2011) recommended teaching science through experience by promoting hands-on activities and informal learning environments. Krajcik and Sutherland (2010) and Hackling, Smith and Murica (2010) suggested that science teachers link new ideas to students' prior knowledge and experiences. McDonald and Dominguez (2009) postulated teaching science through reflection as an effective science teaching method. The National Science Curriculum suggests the same teaching strategies for science teaching in Bangladesh. There is, however, increasing concern among educationalists about the practical aspects of teaching effectiveness. The "how" of teaching is now being given greater prominence (Dhand, 1990). We

therefore sought to establish exactly what is happening in school science classes in Bangladesh in practice and whether teachers deliver lessons traditionally or by following the curricular instructions. The science teaching-learning status of Sylhet schools is unknown, so it is difficult to identify areas of science education requiring improvement. The outcomes of this study are likely to benefit curriculum developers, textbook writers, teachers, trainers, and researchers in this field and provide a new platform for all science education professionals to reshape and revise their practice. Moreover, these data provide a research foundation for science education researchers in Bangladesh. The study aimed to explore science teaching methods in grade eight and compare actual classroom teaching-learning of science with the teaching-learning strategies suggested in the National Science Curriculum.

2. Materials and Method

This was a qualitative and quantitative study based on primary data. Ten secondary schools from Sylhet district, Bangladesh were selected by random sampling (RS). Eighteen students of classes 6-8 from each school were selected by RS (n=180 in total). Fifteen science teachers were selected purposively from those schools. Total population size was 195 (180+15=195). Students were administered a questionnaire and an interview schedule was used to collect data from science teachers. Fifteen science classes were observed using a five-point Likert scale observation checklist. Data was analyzed through descriptive statistics and an MS-Excell worksheet was used to interpret graphical presentation.

The curriculum developed by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) was used during the study period, which provided specific and clear strategies for science teaching-learning. Classes 6-8 contain 12 general chapters related to science teaching. Realizing the burden of theory and lack of emphasis on the scientific process and scientific attitude in the curriculum of 1996 a new curriculum had been offered that intended to cover these gaps. Ideal teaching-learning methods of science state that, students are expected to think rationally and solve simple problems in their daily life through science education. The curriculum mentions that science cannot be learned solely by reading books; therefore, science teaching through 'learning by doing' is strongly emphasized. The curriculum instructs that opportunities should be given to learners to learn by doing according to the school facilities and

environment. Observation and experimentation are defined as key tools to develop scientific skills. The curriculum also explains that if learners observe things properly, questions will naturally arise and consequently they will seek the answers with the help of their teacher. In this case, the teacher will inspire learners to derive a hypothesis about the problem and collect data to test that hypothesis.

The curriculum states that teachers should prepare lesson plans and collect necessary teaching aids. The teachers should conduct lessons using the question-answer technique. To explain the mechanism of any instrument being used, the class could be divided into groups; where there are insufficient numbers of instruments, the demonstration method can be used. The curriculum also suggests that the teacher should try to be diverse when teaching-learning. The teacher will ask relevant questions, judge the prior knowledge of the learners, and then announce the lesson. Emphasis is given to student participation and didactic teaching should be avoided where possible. The curriculum further states that experiments should be demonstrated to solve problems. Students' observation of the experiments and results should be assured, and the teacher should try to assess student understanding of the observed results and experiments. The students will foster a relationship between the actual problem and the observed outcome. Finally, the teacher will summarize important points on the board. One important instruction in the curriculum is that the teacher will discuss, demonstrate experiments, and ask questions in the classroom, and, via these processes, students' knowledge, comprehension, and skills will be evaluated (NCTB, 1996 & 2012). The expected teaching-learning strategies are summarized below in Figure 1.

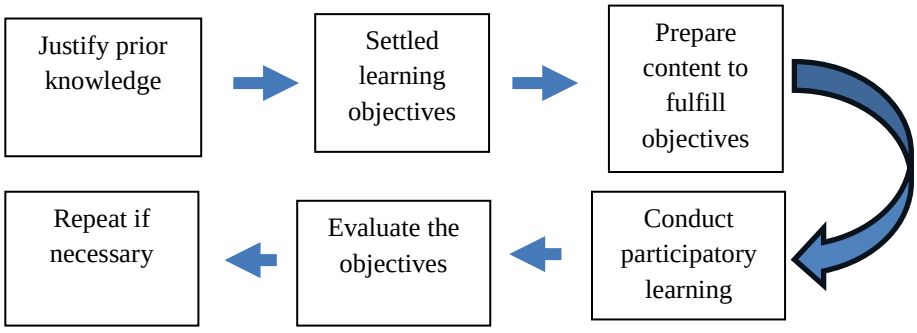

Fig1: Flow chart of the expected teaching-learning strategy

3. Result and Discussion

3.1 Preparation and Conducting Science Classes

The science curriculum instructs that science teachers need to study the subject matter given in the curriculum and teacher's guide (TG) carefully prior to conducting the lesson. In reality, almost every teacher was unaware of the curriculum and did not follow the TG. Half of the teachers sampled reported not preparing for classes. They mentioned that they prepared for class by reading science books and collecting materials.

The science curriculum suggests that science teachers prepare lesson plans to address the objective(s) of the lesson. A lesson plan was only used in one class. Some teachers mentioned that they used lesson notes but could not demonstrate this. Teachers selected the poorly fitted teaching aids for most of the classes. The curriculum mentions that teachers should only enter the classroom after collecting the necessary teaching aids and equipment. In practice, it was found that teachers used proper teaching aids in 9 out of 60 classes, 17 classes with poorly fitted teaching aids, 11 classes with wrongly fitted teaching aids, and 23 classes without any teaching aids. The graphical presentation is shown in Figure 2.

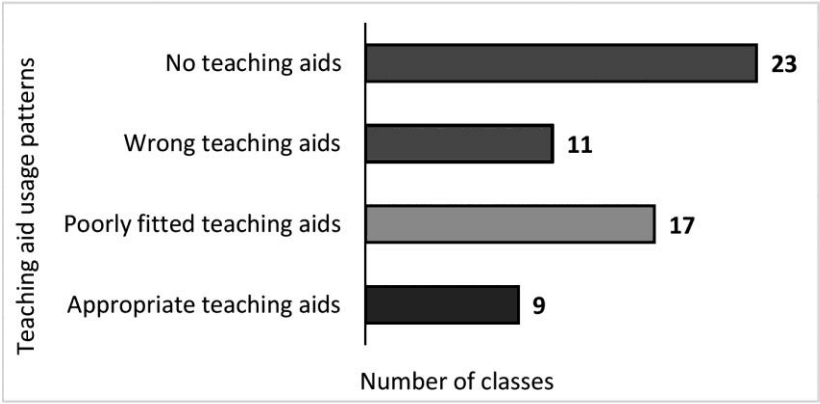

Fig 2: Status of using teaching aids in 60 classrooms

3.2 Announcement of the Lesson in Science Classroom

The curriculum states that before announcing the lesson, the teacher should instruct the students to close their books while relevant questions are asked on their knowledge, skills, experiences, capacity, and needs related to the lesson. Of the 25 observed science classes, teachers investigated prior knowledge of the learners in 40% classes and it capable to motivate the students. 28% of

students reported that teachers did not ask question about themselves and then announced the lesson, 32% reported that teachers justify with inappropriate question and announced the lesson. The Pie chart shown in Figure3.

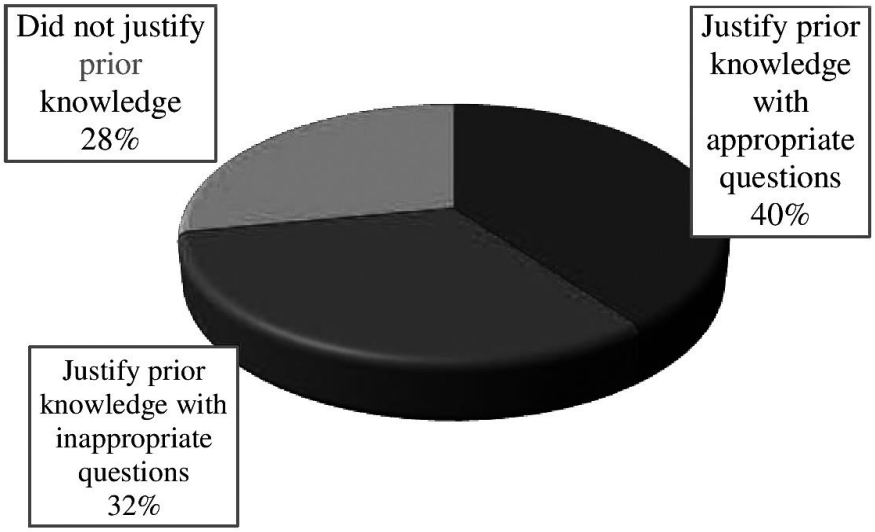

Fig 3: Pie chart showing the creating environment prior to declaring lesson content

NCTB (1996 & 2012) suggests that science teachers should progress the lesson through precise questioning and answering. In reality, teachers did not progress the lesson in this way. Teachers sometimes asked questions, but the questioning procedure was inappropriate, and teachers did not instruct the students as to whether they should respond individually or in groups. The teachers did not create scope for students to ask questions, and students did not ask the maximum number of questions in science classes. Teachers did not arrange creative activities in classrooms and only asked creative questions in the classes.

3.3 Teaching-Learning through Active Participation

The curriculum emphasizes ensuring student participation in class activities. Teachers were not conscious about learners with learning difficulties. Learners were not attentive and did not participate in class activities (Figure 4). All teachers reported that they took steps to ensure active participation of students in class activities, but no teachers could explain the steps they took.

3.4 Assessment of Achievement

Teacher should evaluate learning outcomes to judge to what extent the learners have achieved these outcomes. It is suggested that teachers should ask questions and judge students' knowledge, comprehension, and skills. We found that teachers assessed students' learning achievements in most classes. Teachers mainly assessed students' recall capability, which is regarded the lowest level learning domain according to Bloom taxonomy (Bloom, 1956). All assessment devices were knowledge-based questions, with other cognitive sub-domains left unexplored and items from affective and psychomotor domains totally absent. The classroom observation data showed that in most classes, teachers did not identify the learners who could not achieve a day's competencies. The overall observed result revealed that the process of assessment of achievement did not follow the curriculum instruction. When asked whether they could answer questions easily or they had to think a lot to answer, 130 students out of 180 students reported that the teachers are careless about the students learning disabilities, 30 of them disagree with the statement and 20 of them have shown their strong disagree. In consideration of participatory learning out of 180 students 95 students stated that the teaching-learning process are participatory, 69 of them shown disagree with the statement and 16 of them shown strongly disagree. In consideration of managing proper environment in classroom 40 students stated that teachers are capable of managing proper environment in the classroom, 120 students disagreement with the statement and 20 students are strongly disagree with the statement. The result of the student's questionnaire is given in Figure 4.

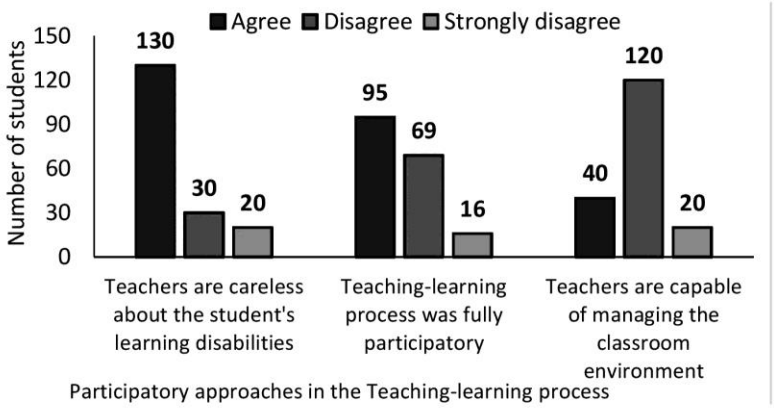

Fig:4: Composite bar graph showing the participatory approach of teaching-learning and classroom environment

3.5 Proper Motivation Prior to Starts Content Presentation

To make the proper environment for delivering science class which would motivate the students to take science in class IX is necessary in class VI-VII class teaching. Out of 180 students 40 students stated that teachers are capable to motivate the students properly before present the content in the classroom. Of them 65 students stated that the questions asked by the teachers are partially related to the content and it becomes sometimes monotonous. 30 of the students stated that the question asked by the teachers is irrelevant and it did not motivate the students properly even sometimes demotivated from the concentration. 50 out of 180 students stated that teachers start their content presentation without asking any question. The graphical result shown in Figure 5.

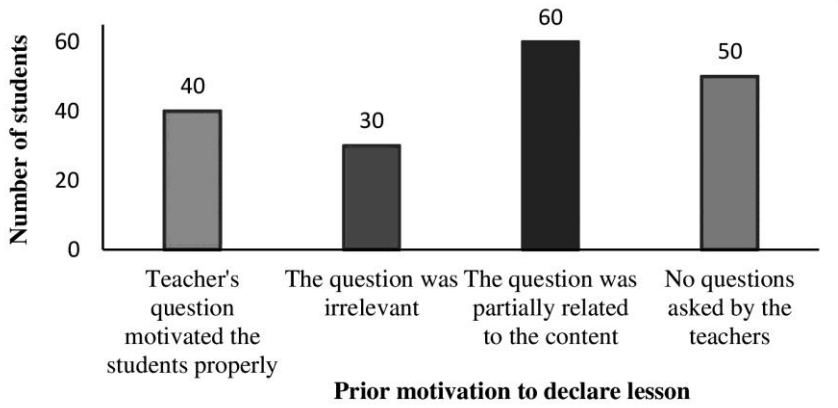

Fig 5: Motivation status of the students prior to lesson declaration

4. Conclusion

The study revealed that science teaching in sample schools in Sylhet was not practiced as instructed in the science curriculum. There was a big difference between the prescribed curriculum and what is being practised in the classroom. Learning science is not only learning information and facts, but also acquiring process skills and higher-order thinking. Given the importance of science education, due emphasis should be given to on-time delivery of curriculum materials to teachers, proper training, and curriculum dissemination for teachers. Teachers should be encouraged to plan and prepare before going into class. Optimum learning environments are also required to ensure in schools so that teachers and students can undertake science experiments and activities. Most importantly, the issue of teachers' workloads needs to be taken seriously. Further studies are needed in these

areas to overcome these problems so that science education in schools can be improved in Sylhet.

5. Recommendations

Here we have discused and compared the study result with published findings and made some recommendations to improve science teaching in Bangladesh.

5.1 Ensuring Availability of Curriculum and Teachers' Guide

This study identified that the curriculum and teachers' guide were generally unavailable in schools, like the results reported by Nina (1992) and Sadat (2001). The lack of the curriculum and teachers' guide appears to be common in Bangladesh, but they are required for better teaching. Hatton (2008) reported on pre-service science teachers who were concerned about the pedagogy of science teaching, and they had good command of the curriculum, content, and scientific attitude. Their performance in classrooms was satisfactory. Therefore, steps should be taken to ensure the availability of the science curriculum, teachers' guide, and other necessary materials. Reducing Teachers' Workloads Large workloads were one of the major problems for teachers since it stopped them from preparing and delivering quality science classes. Using Lesson Plans are necessary for effective teaching and better management of large classes (UNESCO, 2006). The curriculum also suggests using lesson plans. However, teachers should be encouraged to prepare lesson plans and proper supervision systems should be in place to ensure compliance.

5.2 Training for Applying Proper Methods of Teaching

A number of studies, including the present one, have reported that lecture method is most commonly used to teach science. Other interactive teaching methods like group discussion, demonstrations, and learning by doing are not applied for teaching science in practice (ADB, 1998; Hossain, 2000; Sadat, 2001; Huq, 2004; Gomes, 2007 & Orhan, 2009). Teachers reported that short time periods, large syllabi, etc. were the main causes for not practicing these methods, similar to Nina (1992), Krishna (1997), and Sadat (2001), who reported that lack of time, unavailability of materials, and lack of laboratory facilities and ingredients were the core reasons for not using demonstration, experimentation, or learning by doing methods. Another alarming result of our study was that teachers did not use the inquiry approach at all, similar to

Wang and Lin (2009) and Anne and Coll (2010). Teachers need to be trained properly so that they can use different interactive methods effectively.

5.3 Ensuring Student Participation in Teaching-Learning

Students did not participate in teaching-learning and the teachers were not attentive to those learners who could not achieve a day's competencies. Students were also inattentive to the lesson. However, teaching aids facilitate student learning by attracting their attention (Adeyanju, 2003). Using teaching aids can ensure student participation and can also help promote higher achievement of the students.

References

Adeyanju, L. (2003). *Teachers' Perception of the Effects and Use of Learning Aids in Teaching: A Case Study of Winneba Basic and Secondary Schools.* Awolowo University.

Agun, I. (1986). *Institutional Support for Educational Technology: The Case of College of Education.* A paper presentation at the National Symposium on Status and Trends in Education Technology. Nigeria Educational Technology Centre Kaduna. 16-21 November.

Agun, I. & Imogie I. (1988). *Fundamentals of Educational Technology.* Ibadan: YBooks.

Ahsan, S. (2009). Classroom Assessment Culture in Secondary Schools of Dhaka City. *Teacher's World*, *33-34*(9), 231-244.

Anne, H. & Coll, R. (2010). Authentic Student Inquiry: The Mismatch Between the Intended Curriculum and the Student-Experienced Curriculum, *Research in Science & Technological Education*, *28*(1), 43-62.

Asian Development Bank (1998), *Impact Evaluation Study of the Secondary Education Projects in Nepal, Bangladesh and Pakistan.*

Bloom B.S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: The Cognitive Domain*, New York: David McKay Co Inc.

Braund, M., & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: The contribution of out-of-school learning. *International Journal of Science Education*, *28*(12), 1373-1388.

Carin, A. A., Bass, J. E., & Contant, T. L. (2005). *Teaching science as inquiry* (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Chandler, K. & Swartzentruber, M. (2011). *A Correlational Study of Nature Awareness and Science Achievement* [M.A Thesis]. Jhonson Bible College.

Church, E. B. (2000). Ants and plants. *Scholastic Early Childhood Today*, *14*(7), 52-53.

Dhand, H. (1990), *Techniques of Teaching*. New Delhi: Ashish Publishing House.

Gomes, J.J. (2007). *A Critical Investigation into Methods and Techniques Used for Teaching Science at Junior Secondary Level* [Unpublished M.Ed Thesis]. Institute of Education and Research, University of Dhaka.

Hackling, M., Smith, P., & Murcia, K. (2010). Talking science: Developing a discourse of inquiry. *Teaching Science*, *56*(1), 17-22.

Haq, M. N. (2004), A Baseline Survey of Rural Secondary Schools: A Quest for Teaching Learning Quality, *Bangladesh Education Journal*, *3*(2), 31-54.

Hassard, J. & Dias, M. (2011). *The Art of Teaching Science: Inquiry and Innovation in Middle School and High School.* Routledge Publishing.

Hatton, M. (2008). Pre-Service Elementary Teachers' Concerns about Teaching Science, Retrievedin 5 February from http://www.eric.ed.gov/ ERICW Portal /search/detailmini.jsp

Hoisington, C., Sableski, N., & DeCosta, I. (2010). A walk in the woods. *Science and Children*, *48*(2), 27-31.

Hossain, M. (2000). Identifying Shortcomings of School Science Teaching Recommending the Bangladesh Open University's Assistance to Improve the Situation, Retrieved in 13 March, 2010 from http://www.col.org/forum/PCFpapers/hossain.pdf

Krajcik, J., & Sutherland, L. (2010). Supporting students in developing literacy in science. *Science*, *328*, 456-459.

Krishna, D.B. (1997). *Determining and Analysis the Problems Raised in Teaching Learning Process of Chemistry in Class IX & X* [Unpublished M.Ed Thesis]. Institute of Education and Research, University of Dhaka.

Layton, D. (1981). The Schooling of Science in England, 1854-1939. In R. MacLeod & P.Collins (Eds), *The Parliament of Science* (pp. 188-210). Northwood, England: Science.

Rasel Babu. (2016). *Journal of Education and Learning.* 10 (3), 244-254. 253

Mathews, M.R. (1994). *Science Teaching, The Role of History and Philosophy of Science.* Great Britain: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE. McCrea, E. J. (2006). *The roots of environmental education: How the past supports the future.* Retrieved from Environmental Education and Training Partnership Website: http://www.naaee.org/about-naaee/history-final-3-15-06.pdf

McDonald, J., & Dominguez, L. (2009). Developing patterns for learning in science through reflection. *Journal of College Science Teaching*, *39*(1), 38-42.

Ministry of Education (1977). *Report of Natinal Curriculum Committee Part-2.* Dhaka: The Government of Bangladesh Press.

Ministry of Education (1977). *Report of the National Curriculum and Syllabus Committee: Part-3.* Bangladesh Government Press, Dhaka

National Curriculum and Textbook Board, NCTB (1996). *Curriculum and Syllabus, Junior Secondary Level, Report*: *First Part*, NCTB, Dhaka.

National Curriculum and Textbook Board, NCTB (2013), 1996, 2012., *General Science (Class Eight)*, Dhaka: Bangladesh Government Press.

NCERT (2006), *National Focus Group on Teaching of Science*, Retrieved on January 12, 2010 from http://epathshala.nic.in/wp-content/doc/ NCF/ Pdf/ science.pdf

Nina, H.K. (1992). *Problems of Students-Teachers Faced in Biology Teaching Learning Process of Class IX-X* [Unpublished M.Ed Thesis]. Institute of Education and Research, University of Dhaka.

Nitko, A.J (1996). *Educational Assessment of Students (2nd Edition).* New Jersey: Prentice-Hall.

Orhan, K. (2009). Active Learning Strategies in Physics Teaching, *Energy Education Science and Technology*, *1*(1), 27-50.

Sadat, K.A. (2001). *Astudy of the Problems of Teaching Physics at Secondary Level* [Unpublished M.Ed Thesis]. Institute of Education and Research, University of Dhaka.

UNESCO (2006). *Practical Tips for Teaching Large Classes.* UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau of Education. Bangkok, Thailand.

Wang, J.R & Lin, S.W (2009). Evaluating Elementary and Secondary School Science Learning Environment in Taiwan. *International Journal of Science Education*, *31* (7), 853-872.

Ware, S.A. (1992). *The Education of Secondary Science Teachers in Developin Countries.* PHREE Background Paper as aeries Retrieved on 8 October 2011 from http:// siteresources. worldbank.org /EDUCATION/ Resources /5476641099080063795

Yadav, M.S. (1992). *Teaching of Science***.** New Delhi, India: Anmol publication.

ISSN 2707-9201

সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপি

জফির সেতু*

সারসংক্ষেপ: এখন পর্যন্ত সিলেটে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পাঁচখানি রাজকীয় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনত্ব বিচারে এগুলোর ধারাক্রম হচ্ছে—কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন, সামন্ত মরুণ্ডুনাথের কালাপুর তাম্রশাসন, মহারাজা শ্রীচন্দ্রদেবের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন এবং গোবিন্দকেশব দেবের ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসন ও ঈশান দেবের ভাটেরা দ্বিতীয় তাম্রশাসন। উনিশশতকের সত্তরের দশক থেকে বিশশতকের ষাটের দশক পর্যন্ত শতাব্দীকাল ধরে বিচ্ছিন্নভাবে আবিষ্কার হলেও আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতেরা তাম্রশাসনগুলোর পাঠ, পরিপূরক বা সমন্বিত পাঠনির্ণয় করেন। একইসঙ্গে পাঠগুলো সম্পাদনা ও সংকলন করে টীকা-টিপ্পনিসহ বিভিন্ন সাময়িকপত্র, গবেষণাপত্র ও গ্রন্থে প্রকাশও করেন। বিভিন্ন সময়ে তাম্রশাসনের আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছু প্রবন্ধ রচিত হলেও সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপি নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা চোখে পড়ে না। আবার বিভিন্ন সূত্রে যা আলোচিত হয়েছে তাতে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপেক্ষিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপি' প্রবন্ধে উল্লিখিত তাম্রশাসনগুলোর পাঠ অবলম্বনে ভারতীয় তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপির অনুষঙ্গে সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপির অনুসন্ধান, বিশেষ করে ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসনের (২৯শ থেকে ৫৩তম পঙ্‌ক্তি) ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভাষাবৈজ্ঞানিক সূত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে বর্ণনামূলক, তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

চাবিশব্দ: অনুশাসন; অভিলেখ; প্রাকৃত; বাক্য; বাগর্থ; রূপমূল; সংস্কৃত।

প্রাক্‌কথন

সিলেট বলতে এখন যে-ভূখণ্ডকে বোঝায়, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত-বিভাগের পূর্বে তা শ্রীহট্ট নামেই পরিচিত ছিল। তখন ভৌগোলিক সীমাও ছিল আরেকটু বিস্তৃত; সুরমা-উপত্যকা পেরিয়ে বরাক-সীমা ছুঁয়ে কাছাড়ের পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত। অবশ্য ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে নবগঠিত আসাম প্রদেশে শ্রীহট্ট-কাছাড়কে নিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল সুরমাভ্যালি ডিভিশন, আর দেশভাগের ফলে রেডক্লিফ রোয়েদাদের বদৌলতে হারাতে হয় শ্রীহট্ট জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশও। নির্বাসিত ক্ষুদ্র সে-অংশটি এখন আসামের করিমগঞ্জ জেলা নামে পরিচিত। তাহলেও সিলেট বা শ্রীহট্ট বলতে বর্তমান গবেষণায় দুই পৃথক রাষ্টের রাজনৈতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত কিন্তু ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে অখণ্ড সত্তাটাকেই বিবেচনা করা হয়েছে। সিলেটে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক রাজকীয়

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

তাম্রশাসনের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ। প্রাচীনত্ব বিচারে এগুলোর ধারাক্রম হচ্ছে, ১) কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন; ২) সামন্ত মরুণ্ডুনাথের কালাপুর তাম্রশাসন; (৩) মহারাজা শ্রীচন্দ্র দেবের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন; ৪) গোবিন্দকেশব দেবের ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসন এবং ৫) ঈশান দেবের ভাটেরা দ্বিতীয় তাম্রশাসন। অর্থাৎ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনটি সর্বপ্রাচীন এবং ঈশান দেবের তাম্রশাসনটি তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন কালের। যদিও প্রথম আবিষ্কৃত হয় ভাটেরা তাম্রশাসন-দুটি একস্থানে, একই জায়গা থেকে। পরে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্করবর্মার নিধনপুর, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন এবং ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সামন্ত মরুণ্ডুনাথের কালাপুর তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়। বিচ্ছিন্নভাবে আবিষ্কার হলেও আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পন্ডিতেরা তাম্রশাসনগুলোর পাঠ, পরিপূরক বা সমন্বিত পাঠনির্ণয় করেন। একইসঙ্গে পাঠগুলো সম্পাদন ও সংকলন করে টীকা-টিপ্পনিসহ বিভিন্ন সাময়িকপত্র, গবেষণাপত্র ও গ্রন্থে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তাম্রশাসনগুলোর লিপিরূপ, লিপি-জটিলতা, দুর্বোধ্যতা, ক্ষয়ে-যাওয়ার কারণে অস্পষ্টতা, সংখ্যা-ভ্রম প্রভৃতি কারণে পাঠ বা পাঠার্থ নিয়ে বিতর্ক হয়; তারিখ নিয়ে তৈরি হয় নানা জটিলতা। কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যা-ভ্রমের কারণে শাসন-প্রদানের সন-তারিখ নির্ণয়ও দুরূহ হয়ে ওঠে। তৈরি হয় নানা বিতর্ক। শুধু তা-ই নয়, শাসনগুলোর পাঠকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস নিয়েও নতুন বিতর্ক তৈরি হয়। তা হলেও, অনেক গবেষক তাম্রশাসনের কালবিচারসহ সমকালীন শ্রীহট্টের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসন্ধানের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জন-অভিবাসন, ভূমি-ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক বিন্যাস ও ধর্মীয় প্রতিবেশের চিত্র উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাম্রশাসন অবলম্বনে প্রাচীন সিলেট-ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবরণ কিংবা সমাজ-সংস্কৃতি এবং ভাষা-সাহিত্য নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ চোখে পড়ে না। তবে ভাষাবিচারে সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষাকে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত গুপ্ত, দেবার্চনা সরকার, নৃপেন্দ্রেলাল দাশ প্রমুখ গবেষক সংস্কৃত বলে অভিহিত করেছেন। ভাটেরা তাম্রশাসনের কিছু পাঠ পূর্বাপর পাঠের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে ভাষার প্রকৃতি-বিচারে গবেষকরা ওড়িয়া এবং স্থানীয় বাংলা ভাষায় প্রভাবিত বলে মত দিয়েছেন। তবে এ-সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ পেয়েছেন একমাত্র নৃপেন্দ্রলাল দাশ। কিন্তু তাঁর আলোচনা ছিল খন্ডিত এবং ভাটেরার তাম্রশাসনের বিশেষ অংশ নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় তাম্রশাসনের ভাষা-ঐতিহ্য এবং লিপিগত সূত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান; বিশেষ করে ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসনের (২৯শ থেকে ৫৩তম পঙ্‌ক্তি) ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা হয়েছে।

ভারতীয় তাম্রশাসনের ভাষাসূত্র ও সিলেটের তাম্রশাসন

পেশওয়ার থেকে শুরু করে মহীশূর এবং কাথিয়াবাড় থেকে ওড়িশা পর্যন্ত প্রায় সারা ভারতবর্ষেই যেসব প্রাচীন রাজ-অনুশাসন পাওয়া গেছে তা ভারতীয় ভাষা ও লিপির প্রত্নরূপের অসামান্য দলিল হিসেবেই বিবেচিত। স্থান ও কালের নিরিখে সেসব ভাষা ও লিপির রূপ-রূপান্তরের সাক্ষী হিসেবেও অনুশাসনগুলো বর্তমান। ভারতবর্ষে যেসব প্রাচীন অনুশাসন বা অভিলেখ পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মৌর্যবংশীয় রাজা অশোকের আমলের, অর্থাৎ কালের বিচারে খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতকের এবং তা বিশাল পাষাণ স্তম্ভ ও বিস্তীর্ণ পাষাণময় পর্বতগাত্রে খোদিত।[১] সাধারণ্যে ধারণা এসব অনুশাসনের ভাষা সংস্কৃত, বাস্তবে তা কিন্তু নয়। প্রাচ্য-প্রতীচ্য পন্ডিতেরাই এর ভাষাতাত্ত্বিক দিক বিচার করে দেখিয়েছেন তা আসলে প্রাকৃতই। সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে যেমন সুকুমার সেন

যেখানে বলছেন অশোক-অনুশাসনের ভাষা পালিও নয়, প্রাকৃতও নয়; সেখানে গৌরীনাথ শাস্ত্রী বলছেন প্রাকৃত। সুকুমার সেনের বিবেচনা-অনুযায়ী খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মূলস্তরের উপভাষাসমূহের (উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যা) ছাঁচ এতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[২] শাস্ত্রীর বিবেচনায় অশোকের অনুশাসনসমূহে প্রাকৃতের আঞ্চলিক রূপ বিধৃত, আর 'পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত লেখগুলি অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রাপ্ত লেখসমূহ পৈশাচী রীতির লক্ষণ অধিক প্রকট'।[৩] এখানেও তিনি আঞ্চলিকতা বা ঔপভাষিক রূপের কথা বলছেন। সেদিক থেকে সুকুমার সেনও প্রাকৃত না-বলে প্রাকৃতের যে-উপরূপের কথাই বলেছেন। মোটের ওপর তাঁরা দুজনেই যে প্রাকৃত (সে যে রূপই হোক) বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ থাকে না।

অপরাপর রাজকীয় অনুশাসন যেমন অশোক-অনুশাসনের সমসাময়িক 'সুতনুকা প্রত্নলেখ', খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের 'খারবেল অনুশাসন' প্রভৃতিও লিখিত ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায়। তবে খারবেল অনুশাসনের ভাষা অশোকের অনুশাসনের মতো কথ্যঘেঁষা ছিল না, বরং তা ছিল বিশুদ্ধ সাধু ভাষা। এখানে লক্ষিত হয় সমাস-বহুল সংস্কৃত গদ্যরীতির অনুকরণ।[৪] এ-প্রসঙ্গে সুকুমার সেন সেসময়কার প্রাকৃত ভাষার ওপর সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর থেকে রাজ-অনুশাসনের ভাষা হিসেবে প্রাকৃতের সন্ধান আর মেলে না, তার স্থান দখল করে সংস্কৃত। এ-বক্তব্যের পক্ষে অন্তত দুটি মত আমরা উল্লেখ করতে পারি—

> **গৌরীনাথ শাস্ত্রী:** 'প্রাচীন ভারতীয় লখসমূহের ভাষা সংস্কৃত নহে, কথ্য ভাষা যাহা প্রাকৃত বলিয়া পরিচিত। [...] প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত লেখমালার ভাষাই প্রাকৃত।'[৫]
>
> **সুকুমার সেন:** 'খ্রীস্টপূর্বাব্দের প্রাপ্ত প্রত্নলেখ কোনটিই সংস্কৃত নয়, সবই মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় লেখা।'[৬]

সেদিক থেকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীনতম অভিলেখ হলো নাসিকের ৯-সংখ্যক গুহার নহপানের লিপির ভাষা। এর রচনাকাল ৪১ শতাব্দ বা ১১৯ খ্রিষ্টাব্দ বলে স্থির হয়েছে। অবশ্য অনেকে একে প্রাচীনতম সংস্কৃত অভিলেখ বলে মানতে নারাজ প্রাকৃতধর্মী বৈশিষ্ট্যের কারণেই। বরং তাঁদের মতে ১৫০ অব্দের রুদ্রদামনের গিরনার লিপির ভাষাই সংস্কৃত প্রথম অভিলেখ।[৭] পণ্ডিতদের মতে, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যরীতি পূর্ণ ছাপ এর ভাষারূপে বিশেষভাবে বিদ্যমান। তবে বেশকিছু শব্দ ও বানান পাণিনিসম্মত ছিল না বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন এবং এজন্য তাঁরা এতে প্রাকৃতের প্রভাব ও আঞ্চলিক উচ্চারণবৈশিষ্ট্যকেই দায়ী করেছেন।[৮] তা সত্ত্বেও ভাষাবিদের বক্তব্যমতে, 'ওজোগুণান্বিত দীর্ঘসমাসবহুল গদ্যে লেখা অভিলেখের লেখা উত্তরকালীন গদ্যকাব্যের পূর্বসূরি বললে ভুল হবে না।'[৯] পরবর্তীকালের হরিষেণের গদ্যপদ্যের সুষম মিশ্রণে নিবন্ধ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি-সংবলিত এলাহবাদ প্রস্তরস্তম্ভলিপিতে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক, মান্দাসোরের সূর্যমন্দিরের গাত্রে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক প্রভৃতির সংস্কৃত ভাষার অভিলেখ পাওয়া যায়। এবং সুকুমার সেনের বক্তব্য অনুযায়ী 'খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে যতগুলি প্রত্নলেখ পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে দুই-চারটি ছাড়া সবই সংস্কৃতে লেখা, এবং এই দুই-চারটি প্রাকৃত প্রত্নলেখতেও সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিদ্যমান।'[১০] অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে অনুশাসনে বা অভিলেখতে প্রাকৃতের জায়গায় ক্রমশ সংস্কৃত অনুপ্রবেশ আরম্ভ করে এবং পঞ্চম শতক থেকে তাতে প্রাকৃতের ব্যবহার লোপ পায়। এর পেছনে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ধারাবহিকতায় উল্লিখিত সময়ে যে-বিস্তৃত অঞ্চলসমূহে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তখন তার রূপ মোটামুটি একই রকম ছিল; অর্থাৎ

স্থানবিশেষে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেনি তাই বিস্তৃত অঞ্চলসমূহে ভাষাটি পরস্পরের অবোধ্য কিংবা দূরবর্তী হয়ে ওঠেনি। ফলে বিবর্তিত আঞ্চলিক/ঔপভাষিক রূপ হিসেবে যখনই ভাষাটি আত্মপ্রকাশ করে তখন সর্বজনবোধ্য অনুশাসন হিসেবে শাসকরা সংস্কৃতের মতো মান্য ভাষার দ্বারস্থ হন। এই ধারণার স্বীকৃতি মেলে সুকুমার সেনের বক্তব্যেও—

> সাধারণ ব্যবহারে, অর্থাৎ শিষ্ট-জন-ভাষার প্রাদেশিক রূপে তখন এতটা পার্থক্য দেখা দেয় নাই যাহাতে এক অঞ্চলের লোকের ভাষা অপর অঞ্চলের লোকের সম্পূর্ণ অভৌধ্য হইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে যখন মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাদেশিক রূপান্তর পরিস্ফুটতর হইতে লাগিল তখন সকলের বোধগম্য রাখিবার জন্য সাধারণ ভাষাভান্ডার সংস্কৃতের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না। তাহার কারণ আবহমান কাল হইতে সংস্কৃত ভারতবর্ষে আর্যভূমির প্রথমে একমাত্র পরে প্রধান সাধুভাষা রূপে ব্যবহৃত ছিল।[১১]

আর সারা ভারতেই শাসকরা অনুশাসনের এই ভাষানীতিটি চালু রাখেন; ফলে পূর্বভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। বলাবাহুল্য অনুশাসনগুলোতে শাসকরা ধ্রুপদী সংস্কৃতের ব্যবহার করেছিলেন। কামরূপশাসনাবলির প্রত্যেকটি তাম্রশাসনেও সংস্কৃত ভাষার একচ্ছত্র ব্যবহার দেখা যায়। কামরূপের বর্মণরাজবংশীয় বনমালবর্মা, হর্জরবর্মা, বলবর্মাসহ রত্নপাল, বনমাল, ইন্দ্রপাল প্রমুখ রাজন্যের তাম্রশাসনের ভাষার মতো কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনেও ধ্রুপদী সংস্কৃতের ব্যবহার দেখা যায়।

সমানভাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি গুহালেখ ও সাঁচি অভিলেখসহ অপরাপর গুপ্ত-অনুশাসনের মতো বঙ্গাদেশের গুপ্তরাজাদের আমলের যে-আটখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে সেগুলোর ভাষাও সংস্কৃত। একই ধারাবাহিকতায় গুপ্তপরবর্তী বাংলার পালরাজবংশীয় দেবপালের খালিমপুর, ধর্মপালের অপর দুই শাসন ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন, চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রের রামপাল প্রভৃতি তাম্রশাসন এবং সেনবংশীয় বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয়সেনের শাসন, সীতাহাটি-নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের শাসন ও গোবিন্দপুর-শক্তিপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের শাসনের মতো সামন্ত মরুণ্ডুনাথের কালাপুর তাম্রশাসন, মহারাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন, গোবিন্দকেশব দেবের ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসন ও ঈশান দেবের ভাটেরা দ্বিতীয় তাম্রশাসনের ভাষাও সংস্কৃত। এ-প্রসেঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের দেওয়া তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানাচ্ছেন যে, 'অনেক পূর্বেই বাংলার উচ্চসমাজে আর্যজাতির ভাষার মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। গুপ্ত আমল থেকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালেখ, তাম্রশাসনাদি আবিষ্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।'[১২]

সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা

সিলেটে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনগুলোর ভাষাপরিচয়ে যে সংস্কৃত তা সকল পন্ডিতই মেনে নিয়েছেন। প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলোর ভাষারূপ, ভাষা-উপাদান, ব্যাকরণরীতিও এই সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমান প্রবন্ধে সিলেটের তাম্রশাসনের শব্দতাত্ত্বিক (বা রূপমূলতাত্ত্বিক) উপাদানের আলোচনা-সহ ভাটেরা তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ 'আপাত অজ্ঞাত' ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তাম্রশাসনগুলোর রূপমূলতাত্ত্বিক ও বাগর্থতাত্ত্বিক পরিচয় অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অন্বেষণের সঙ্গে ভাটেরার অজ্ঞাত ভাষার একটা অনুবেদন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

নিধনপুর তাম্রশাসন

স্থাননাম : কর্তসুবর্ণ, চক্রপাণি, চন্দ্রপুরি, নাগপুরী, ময়ূরশাল্মল, স্কন্ধাবার।

নদ-নদী : কৌশিকা, গঙ্গানিকা।

ব্যক্তিনাম (পুরুষ) : অর্ক দত্ত, অর্ক স্বামী, অর্জুন, অর্থপালিত, কল্যাণ বর্ম্মা, ঈশ্বরদত্ত স্বামী, ঋষিদাম স্বামী, কুষ্মাণ্ডপত্র স্বামী, গোপেন্দ্র স্বামী, ঘোষদেব স্বামী, চন্দ্রমুখ বর্ম্মা, চক্রদেব স্বামী, জনার্দ্দন স্বামী, তুষ্টিদত্ত স্বামী, দিবাকরপ্রভ, দামদেব স্বামী, দিনকর স্বামী, দুন্ধুনাথ, ধ্রুবসোম স্বামী, নন্দদেব স্বামী, নারায়ণ বর্ম্মা, নরস্বামী, নারায়ণ স্বামী, প্রজাপতিপালিত স্বামী, পুষ্যবর্ম্মা, ব্রজদত্ত, বেদঘোষ স্বামী, বসুবর্ণ, বরুণ স্বামী, বল্ল বর্ম্মা, বিষ্ণু স্বামী, বিষ্ণুসোম স্বামী, বিষ্ণুসোম স্বামী, ভূতিবর্মা, ভানু স্বামী, ভাস্কর বর্ম্মা, ভূয়স্কও স্বামী, মনোরথ স্বামী, মিত্রপালিত, মধুসেন স্বামী, মধু স্বামী, মহাভূত বর্ম্মা, মহেন্দ্র বর্ম্মঅ, যজ্ঞকুন্ড স্বামী, যশোভূতি স্বামী, হরদত্ত কায়স্থ, শ্রীগোপাল, শুচিপালিত স্বামী, শনৈশ্চরভূতি, শ্রা ক্ষিকুন্ড, শ্রীবসু, শুভদাম স্বামী, শ্রী মৃগাঙ্ক, শশিশেখর, সুদর্শন স্বামী, সোমবসু, সমুদ্র বর্ম্মা, সঙ্কর্ষণ স্বামী, সুস্থিত বর্ম্মা দেব, স্থিত বর্ম্মা।

ব্যক্তিনাম (নারী) : গন্ধর্ব্ববতী, দত্তদেবী, নয়নদেবী, বিজ্ঞানবতী, ভোগবতী, রত্নবতী, রাজলক্ষ্মী, শ্যামাদেবী, সুব্রতা দেববতী।

গোত্রনাম : কাত্যায়ন, কাশ্যপ, কৌৎস, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌন্ডিন্য, গৌরাত্রেয়, গৌতম, প্রাচেতস, বাৎস, ভারদ্বাজ, শৌভক।

বেদের শাখানাম : চারক্য, ছান্দোগ, বাজসয়েনী, বাহ্বৃচ্য।

রাজপদবি : অধিপতি, অধীশ্বর, গণপতি, নৃপতি, ভূপতি, মহারাজাধিরাজ, মহারাজ, মহাসামন্ত, মহিষী, ক্ষিতিপতি।

সংখ্যাশব্দ : অগণিত, এক, তিন হাজার, দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষাট হাজার।

আত্মীয়বাচক শব্দ : অনুজ, জনক, পুত্র, সখা, সন্ততি, সন্তত।

বিশেষণ শব্দ : অকলঙ্ক, অগণিত, অতলস্পর্শ, অধিগম্য, অনুরাগ, অবিচলিত, অভিগামিক, অপ্রতিহত, অক্ষয়, উজ্জ্বল, ঐশ্বর্যবান, কপট, কৃপণ, গম্ভীরমূর্তি, জ্যেষ্ঠ, দিগ্‌বিজয়ী, নির্ম্মল্য, পটুতা, প্রতিপক্ষ, প্রত্যাখ্যাত, প্রসিদ্ধ, পরহিতার্থ, পরাক্রম, বজ্রগতি, বিনয়, বিশাল, মনোহর, মাৎস্যন্যায়, রক্তবর্ণ, শত্রুহন্তা, শৌর্য, স্বস্তি, সন্তুষ্ট, স্বচ্ছন্দ, স্বল্পতর, সানন্দ, সুখৈশ্বর্য, সচ্চরিত্র, সামানাংশ, সন্ত্রস্ত, সমুচ্ছ্বাস, স্বচ্ছন্দ, ক্ষিপ্র।

দেব-দেবী : ইন্দ্র, ইষ্টদেব, নারায়ণ, ভগদত্ত, মহাদেব, মহেশ্বর, লক্ষ্মী, শ্যামা, সর্পরাজ, পৃথিবী, পৃথিবীপুত্র।

ধর্মবাচক শব্দ : অদৃষ্ট, প্রণাম, পিনাকধারী, নরক, যজ্ঞ, নাগাধিপ, পাতাল, কল্পদ্রুম, ভগবান, পদ্মযোনি, স্বর্গ।

পারিভাষিক শব্দ : অক্ষর, কলিযুগ, জগৎপতি, জাল, প্রজা, বিচারালয়, ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি, বর্ণাশম, মন্ডল, যজ্ঞ, যুদ্ধ, লেখক, সামন্তচক্র।

পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন

স্থাননাম : কামরূপ, কালীগ্রাম, গরলা বিশ্যে, চন্দ্রপুর, পাগরা বিশ্যে, পৌন্ড্রবর্ধন, বিক্রপুরস্থিত, বিন্দ্য পর্বত, মালয় পর্বত, লালাম্বি, শ্রীহট্ট, সমতট।

নদ-নদীর নাম : কাবেরী, কোসিয়ারা, কোষ্ঠপন্য, জুজ্জনা, পুষ্পভদ্রা, মণি, লৌহিতা, ক্ষিরোধ সাগর।

ব্যক্তি নাম (পুরুষ) : পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, কম্বোজ, শ্রীচন্দ্র, সুগত, চন্দ্র, বাবুস দত্ত, হর্ষ, শেখ,

বিশ্বরূপ, ভানুদত্ত, ঈশান, বংস্যনাগ, নন্দ, যশ, চই গোবর্ধন, সিংহ দত্ত, কমল নন্দী, মাণিক্য, কামুক, ভীমপাল, অন্তগ, ব্যসধর, নন্দ ঘোষ, শ্রীধর, শিব বন্ধু, মঙ্গাল বেদো, ধবল, বিহু দত্ত, শান্তি দাস, গগ্‌র্গ শর্ম্মা, মহিন্দ্র সোম, রবিকর, ভানু, নারায়ণ গগ্‌র্গপু, শশী দত্ত হরি, জয় দত্ত, অনেক গোত্র, শ্রবর দারী, বরেন্দ্রী, শুভাঙ্গা, বিণায়ক, হরদাস, ইন্দ্রেশ্বর, ভট্টারক বুন্ধ।

বেদনাম : ঋক, শাম, যজু, অর্থব।

দেবদেবী : ইন্দ্রানী, বুন্ধ, ভব, ভবানী, মহেন্দ্র, অগ্নি, জামনি, মহাকাল, যোগেশ্বর, বৈশ্বানর, যোগেশ্বরম, জৈমনি।

আত্মীয়বাচক শব্দ : মা, পূর্বপুরুষ,

পারিভাষিক শব্দ : অধ্যক্ষ, অধিগ্রহণ, অঞ্চল, অনুমোদন অভিবাসন, উপহার, উপাধ্যায়, উৎসর্গ, কোট্টপাল, কোট্টলি, কুম্ভকার, কর্মকার, কায়স্থ, খালিক, খাল, গৌলমিক, গর্ত, চর্ম্মকার, চৌরবন্ধনিক, ছাটস, তাম্রশাসন, তত্ত্বাবধান, তৈলিক, দান্তিক, দৌসসাধমবিনিক, দ্রাগড়ি, দান, দূত, নট, নিষ্কর, নৌবন্দর, নরক, বাঙাল, বার্তা, বিধান, বৈশাখ, বারিক, বিশ্বপতি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বৈট্টিকা, ভাট, ভূমি, মন্ডলপতি, মালিক, মালাকার, মহাব্যহপতি, মহাপতিহার, মহাতন্দ্রাধিকৃত, মহা সৈন্যপতি, মহা সমুদ্রাধিরক, মহাক্ষ পটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, রাজা, রাজ্ঞী, রাজপুত্র শ্লোক, শৌলিকা, শৈললিপি, সূত্রধর, সনদ, স্থপতি।

ধর্মবাচক শব্দ : আধ্যাত্মিক, ত্রিলোক, পরমেশ্বর, স্বর্গ।

ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসন

স্থাননাম : আখালিকুল, আম্বাবী প্রাচ্য, আমতলি, আড়াল কান্দি, ইটাখোলা, ইন্দা নগর, কাউড়িয়া, কাটাখাল, কৈবামাত, করগাম, কৈশাল খাঁটি বস্তু, গোজ্ঞায়, গোপথ, গোহাট, গোস্যায়া খাত, গোড়াইত, চেঙ্গাচভুড়ী, জগৎ, জোগবনিয়া, জগড়পান্তর, তথাগাম, থোড়াতিত্তবার অমৃতকর, দোহালিয়া আখলি, দক্ষিণোক্তর, নবহাট, নবহাটি, নাটায়ান, নড়কুটীগাম, পৃথিবী, পিথায়িনগর, পর্বত, পারকোবাত, পংসিকো, ফেস্কানিয়া, বোবাছড়ি, বৃন্দাবন, বালোসি গ্রাম, বেশুরজাম, বড় গাম, বড়ো গ্রাম, বড়সো, ভোথিলহাটক, ভাটপাড়া, ভট্টাপাট, ভাসনা টেংরাইত, মেঘপতে, মাঙ্গাল পাবী, মন্দ্র, মহরাপুর, লঙ্গাজেটি, শ্রীহট্ট, সিংহতর, সুঘর, সালচাপঢ়া মূলীকান্দি, সাতকোপা, হট্টরোত্তর।

নদ-নদীর নাম : কালিয়ানী, জুড়িগাঙ্গা, ধামাই, ধামা, সবশা।

দেবদেবী : উপেন্দ্র, কৃষ্ণ, নাগরাজ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, শিব।

ব্যক্তি নাম (পুরুষ) : কেশব দেব, গোজ্জুনদেব, গোপী গোবিন্দ, নারায়ণ দেব, বিজয়ী, বিশু রাজা, বাসুদেব, মদনদেব, রাজা সাগর।

রাজপদবী : নৃপতি, রাজা।

আত্মীয়বাচক শব্দ : পিতামহ, পুত্র।

ধর্মবাচক শব্দ : একেশ্বর, ওঁ, কৃপাদৃষ্টি, কল্পতরু, গিরি গোবর্ধন, জগদিশ্বর, ত্রিজগৎ, প্রণাম, প্রভু, বন্দনা গীতি, মহাভারত, সর্বশক্তিমান, স্তুতি, স্রষ্টা, স্তব।

ভাটেরা দ্বিতীয় তাম্রশাসন

স্থাননাম : অথিনহাটকে, অনীকাথী, অনিঘনাকোণার্ক, অথনাটভবিক, আখানিকৃত, আথাবী,

আয়তনীক, উগডাট, উপপথ, কডডিয়া, কানিয়ানী, কতীমুতাক, কৈবাম, গূড্ডভাটপড়া, গুড়াবয়ী, গোবামী, গোপথ, গোস্যয়া, ঘটীভূ, চাটপড়াদেবসত্র, থাগন, দেগিগান, ধনকুণ্ডডী, নবভাট, নডকুটীগাম, নবছাদি, নবপঞ্চাল, নাটয়ান, নেনৃবতাগ, পাছানিয়াঅথানি, পাকাদি, কাটাবাঞ্ছতে, ববনী, ববপঞ্চ, বদবসা, বড়গাম, বাঞ্ছত, বাড্ডা, বালুসীগাম, বেদাম্বুদি, বোবতুছানি, জোগাবনিয়া, বোংবাকটায়ি, ভাটপড়, ভাস্করটেঙ্করী, ভোগডত্তাকনি, মহবাপুর, য়িথায়ীনগর, য়োড়াতিথার্ক, শরগানদী, শিজ্ঞব, পিশ্রাপিনগর, সনাগজদাক, সাগর, সিহাডবগ্রাম, হট্টবব, হটীথানক, হট্টপাঠক, হড্ডিপগৃহ, হুহুকমহাসাহ।

ব্যক্তিনাম (পুরুষ) : কেশবদেব, গঙ্গুনা, গোপী গোবিন্দবীর, দ্রুমনাথ, নারায়ণ দেব, বীরদত্ত, রিপু রাজা।

ব্যক্তিনাম (নারী) : কমলা

দেবদেবীর নাম : কৃষ্ণ, নাগরাজ, নাগরাজ, বিজয়ী (শিব), বটেশ্বর বাহুল্য (কার্তিক), মধুকৈটভরি (দ্বৈত্য মধু ও কৈটভের শত্রু, বিষ্ণু), মহেশ্বর, মহেশ (শিব), রৌহিন্যেয় (বুধ), লক্ষ্মী।

আত্মীয়বাচক শব্দ : পূর্বপুরুষ, বিধাবপত্নী, রাজকুমার

পারিভাষিক শব্দ : কুল, ভূষণ, মন্দির, রাজা, অক্ষপতালিক (সেরেস্তাদার)।

ধর্মবাচক শব্দ : কল্পতরু, কংসনিসূদন, মন্দির, মহেশ্বর, ৎ ওঁম, নমোঃ, নারায়ণ।

রাজপদবি : মহেশ্বর, রাজা, সম্রাট।

ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসনে (২৯শ থেকে ৫৩তম পঙ্‌ক্তি) ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ভাটেরা উভয় তাম্রশাসনটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও গোবিন্দকেশব দেবের তাম্রশাসনটি ২৯শ পঙ্‌ক্তির শেষাংশ থেকে ৫৩ তম পঙ্‌ক্তির প্রথমাংশ পর্যন্ত সংস্কৃত নয়। পঙ্‌ক্তিগুলোর ভাষা পূর্বাপর বিসদৃশ। উভয় তাম্রশাসনে এরূপ ভাষার উদাহরণ আর মেলে না। এমনকি সিলেটের অপরাপর তাম্রশাসনের সঙ্গেও সে ভাষার কোনও রূপ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন গবেষক ভাষাটির স্বরূপ প্রসঙ্গে নানা বক্তব্য দিয়েছেন। কমলাকান্ত গুপ্ত যেখানে এ-ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে অভিহিত করেছেন, নৃপেন্দ্রলাল দাশ একে ঔপভাষিক সিলেটি বলে নির্দেশ করেছেন। তাম্রশাসনের অজ্ঞাত ভাষা-নিদর্শন প্রসঙ্গে কমলাকান্ত গুপ্তের মন্তব্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মন্তব্যটি নিম্নরূপ—

> ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসনের ২৯শ ছত্রের শেষাংশ হইতে ৫৩তম ছত্রের প্রথমাংশ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত নহে। মনে হয় ঐ অংশ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। যদি ইহা খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার একটি নির্ভরযোগ্য নিদর্শনরূপে গণ্য হয় তবে বাংলা ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষকগণের বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনায় ইহা সাহায্য করিতে পারে।[১৩]

বর্তমান গবেষণায় ভাষা-নিদর্শনের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূলতত্ত্ব, বাগর্থতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দভান্ডার বিশ্লেষণের পর ভাষা-পরিচয় প্রদানে প্রয়াসী হওয়া যাবে। এই পরিচয়-প্রদানে নৃপেন্দ্রলাল দাশের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণাত্মক সূত্রে বিধৃত হয়েছে। প্রথমেই পঙ্‌ক্তিগুলো (২৯-৫৫) উদ্ধৃত করা হলো—

> প্রাদৎ শৃহট্ট নাথোয়ং শিবায় শিবকীর্ত্তনঃ॥ ভাটপড়াদেববন্ধে ভূহ-ল ৩৫॥ বাটী ১১০ বড়গামে ভূহল ১২ মহুরাপুরে বাটী ১ ইটাখালাকে ভূহল ৭ বাটী ৬ দেগিগাগামেত্তরে ভূহল ১ বর-পঞ্চালে হল ৫ বাটী ৪ আমতলীকে হল ২ সিংহডরে বাটী ১ ভাসনাটেজারীকে ভূকে ৬ গুড়াবয়ীকে বাটী ২ কাটাখালে ভূহল ২ আখালিকুলে হল ৭ পরকোণাকে বাটী ১ পিথায়িনগরে ভূহল ১৭ বাটী ৪ বেনূরগামে বাটী ২ যোড়াতি—থাকে মৃতকরসং হল ২ বাটী ১১ কৈবামে হল ৮ বাটী ১ বান্দেসীগামে হল ৫ নবহাটি পশ্চিমে হল ২ শুঘরে হল ৫ বা-টী ১ ভোথিলহাটাকে ভূহল ৫ বাটী ৯ কউড়িয়া দক্ষিণে গোস্যয়া পূর্ব্বে গোবাটোত্তরে বারুণী পশ্চিমে ভূহল ১৯ সবশানদী দক্ষিণে ভূহল ৫ বাটী ৩ তথানদ্যুত্তরে ভূহল ৩৫ বাটী ১২ তথানদ্যুত্তরে নাটী-বস্তপূর্ব্বে

বাটী ১ তথানদ্যুত্তরে ঘটাভূপশ্চিমে গর্ব্বরভূ দক্ষিণে ভূহল ৭ কালিয়াণীনদ্যুত্তরে ফোম্ফাণি-যা পূর্ব্বে ভূহল ৯॥ বাটী ৭ তথা নদী দক্ষিণে খরসোন্তী পূর্ব্বে ভাস্করটেজ্ঞারী পশ্চিমে ভূহল ৪৫ বাটী ৯১জগাপন্তরে নাটয়ান গ্রামদ্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ২০ সলাচাপড়াকে মূলীকান্দি পূর্ব্বে সাগর পশ্চিমে ভূ-হল ১০ কালিয়াণীনদী দক্ষিণোত্তরে ভূহল ৯ ॥ ধামায়ি নদী দক্ষিণে ভূহল ৬ বাটী ১০ ভোগাড়ভুরাহ-ড়োত্তরে ভূহল ৪ বাটী ৪ নথোশাসন পশ্চিমে হট্টবরোত্তরে ভূহল ৭ বাটী ১০ সাতকোপা দক্ষিণে বড়সো-পূর্ব্বে হল ১০ চেঙ্গাচ্ছুড়ীকে ভূহল ২ বাটী ১ আড়ালকান্ধীকে বাটী ৯ ভূকে ৪ মঙ্গানপাবীকে বাটী ৯ মেঘাপরা-ক বাটী ১ ভূকে ৬ পংসিরো পূর্ব্বে আন্বাবী উত্তরে ভূহল ৯০ বাটী ১৩ নড়কুটীগামে বাটী ৯ তথাগামে ধাম ন-দ্যুত্তরে বাটি ৯ ভূকে ৪ গোস্যয়াখাত পূর্ব্বে গোপথস্যোত্তরে জুড়ীগাঙ্গাদক্ষিণে লঙ্গাজোট্টী পশ্চিমে করগা-মর হল ৫ দোহালিয়া আখালিছড়াকে ভূহল ১০ বাসদেবশাসন পূর্বে ভূহল ৫ বোবাছড়াদক্ষি-ণে জোগাবনিয়া উত্তরে বাটী ১ ভাটপড়াকে কেদাকাদি + বারগৃহ ১০ তথাকে অমৃতকাদি গোপগৃহ ১ তথাকে উত্তরে পাকাদিতে গৃহ ৫ তথাকে কাস্যগোবিন্দাগৃহ ১ বড়গামে গোপ সদা ১ তথাকে আরু-পা-নাকাদি বারগৃহ ৭ জোগা-উত্তরা-নিধি-সার-শৃপাতে গৃহ ৯ ভাটপড়া ইটাখালা নিকুঞ্জগট্টাকাদি গৃহ ৭ ভাটপড়া বরপঞ্চাল ইটাখালানি দিবাকরাকাদি মালাগৃহ ৬ ভাটপড়া সিমেরকাদি গোগৃহ ৫ ভাট-পড়ানি নাপিত গোবিন্দা গৃহ ১ রজক সিরূপা গৃহ ১ বোবাছড়া নিচং বাঢ়ায়ি পাকাদি গৃহ ৫তথানি ডোথরেট্ট পাকাদিগৃহ ৫ নবহাটানি ডোশ্বমাটি পাকাদিগৃহ ২ ভাটপড়ানি বারপাকা-দি হড্ডিপগৃহ ৩ য়িন্দায়িনগরে দ্যোত্যেনবিকাদি গৃহ ২ সিংহউর গ্রামে দন্তকার বজরি গা (গো)গৃহ (১)কোম্পী হুদুকা মহাসাচুহো কোম্পী সহুণ কোম্পী লকৃতাং ছঢ়োতং হরিষট্টোতপাত্র আপিৎ ন পি (থুয়া)আপিয়াচে ভালঙ্কাড়দয় ন কাদয়ঃ প্রদত্তাঃ ॥ বহুভির্বসুধা দত্তারাজভিঃ সাগরাদিভির্যস্য

[গোবিন্দ কেশবদেবের ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসন, সমন্বিত পাঠোদ্ধার: কমলাকান্ত গুপ্ত।][১৪]

স্থাননাম : শৃহট্ট, ভাটপড়া, বড়গামে, মহুরাপুর, ইটাখালা, দেগিগাম, বরপঞ্চাল, আমতলী, সিংহডর, ভাসনাটেজ্ঞারী, গুড়াবয়ী, কাটাখাল, আখালিকুল, পরকোণাকে, পিথায়িনগর, বেনুরগাম, যোড়াতিথা, কৈবামে, বান্দেসীগাম, নবহাটি, শুঘর, ভোথিলহাটা, কউড়িয়া, নাটীবস্ত, ফোম্ফাণিয়া, খরসোন্তী, ভাস্করটেজ্ঞারী, জগাপন্দরে, নাটয়ান, সলাচাপড়া, মূলীকান্দি, নথোশাসন, সাতকোপা,বড়সো, চেঙ্গাচ্ছুড়ী, আড়ালকান্ধী, মঙ্গানপাবী, মেঘাপরাক, পংসিরো, আন্বাবী, নড়কুটীগামে, লঙ্গাজোট্টী,করগাম, দোহালিয়া, আখালিছড়া, বাসদেবশাসন, বোবাছড়া, জোগাবনিয়া, বড়গাম, ইটাখালা, বোবাছড়া, বাঢ়ায়ি, নবহাটা, য়িন্দায়িনগর, সিংহউর, ডোশ্বমাটি।

নদী : সবশা নদী, কালিয়ানীনদ, ধামায়ি নদী, ধাম নদী, জুড়ীগাঙ, বারুণী, খরসোন্তী।

ব্যক্তিনাম : অমৃত কর, কেদাকা, অমৃতকা, গোবিন্দা, সদা, আরু, পানাকা, জোগা, উত্তরা, নিধি, সার, শৃপাতে, নিকুঞ্জ গট্টাকা, দিবাকর মালা, সিমেরকা, গোবিন্দা, সিরূপা, ডোথরেট্ট, দ্যোত্যে, বজরি।

রূপমূলতত্ত্ব

মুক্তরূপমূল : শৃ, হট্ট, শিব, ভাট, পড়া, বন্ধ, গাম, গ্রাম, হল, ভূ, বড়, মহুরা, পুর, বাটী, ইটা, বর, পঞ্চাল, আম, তলা, সিংহ, ডর, কে/কেদার, আখালি, কুল, পর, কোণা, নগর, নব, হাটি, হাট, পশ্চিম, সবশা, নদী, দক্ষিণ, পূর্ব, ঘট, গব্বর, খর, ভাস্কর, টেজ্ঞারী, মূল, কান্দি/কান্ধী, ভোগাড়, শাসন, সাত, আড়াল, মেঘ, উত্তর, কুট, খাত, গো, পথ, জুড়ী, গাঙ্গা, লঙ্গা, জোট্টী, দেব, ছড়া, বোবা, গৃহ, বার, গোপ, মৃত, পাক, সদা, পাতে, নিকুঞ্জ, জোগা, নিধি, উত্তর, আরু, নগর, রজক, মাটি, হড্ডিপ, দ্যোত প্রভৃতি।

বন্ধরূপমূল/বিভক্তি : এ, কে, ই, আ, র, আদি, নি, কার প্রভৃতি।

বন্ধরূপমূলযোগে গঠিত পদ/শব্দ:

বড়গামে =বড়গাম + এ

সিংহডরে=সিংহডর+এ

ইটাখলাকে=কে (তে-এর বিপরীতে)
আড়ালকান্দিকে=কে,
চেঙ্গাচ্ছুড়ীকে=কে
পাড়ানি=পাড়া+নি
খালানি=খাল+নি
করগাম+র=করগামর
পাকাদি=পাক+আদি
কেদাকাদি=কদাক+আদি
দন্তকার=দন্ত+কার

সমাসনিষ্পন শব্দ : শিবকীর্তন, ভাটপাড়া, ভূহল, বড়গ্রাম, আমতলী, আখালিকুল, পরকোনা, পিথায়িনগর, খরসোল্তী, ভাস্করটেঙ্গারী, গ্রামদ্বয়, মূলীকান্দি, দক্ষিণোত্তর, নথোশাসন, সাতকোপা, চেঙ্গাচ্ছুড়ী, নড়কুটী, মঙ্গানপাবী, আড়ালকান্ধি, গোপথ, লঙ্গাজুট্টী, আখালিছড়া, বাসদেব, জুড়ীগাঙ, বোবাছড়া, বারগৃহ, গোপগৃহ, অমৃত, শৃপাতে, গোবিন্দগৃহ, নবহাট, ডোশ্বমাটি প্রভৃতি।

শব্দভান্ডার : শিবকীর্ত্তন, বাটী, বন্ধে, ভূহল, ভূকেদার, হল, পশ্চিম, দক্ষিণ, গোস্যয়া (গোচারণভূমি), গোবাট, উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণে, পূর্ব্ব, ঘট (পাত্র), গর্ব্বর, সাগর, পশ্চিম, ভোগাড়, হট্টবর, গোস্যয়াখাত, গোপথ, গোপ, গৃহ, পাকাদি, বারগৃহ, গোগৃহ, নাপিত, রজক, বারপাকাদি, হড্ডিপ, নাবিক, গ্রাম, দন্তকার, গা (গো) গৃহ।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যগঠনের নমুনা

১. পড়ানি নাপিত গোবিন্দা গৃহ
২. রজক সিরূপ (শ্রীরূপ) গৃহ
৩. বোবাছড়া নিচং বাঢ়ায়ি পাকাদি গৃহ।
৪. সিংহড়র গ্রামে, দন্ডকার বজরি গা (গো) গৃহ।

কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া বাংলা বাক্যে পদের স্বাভাবিক ক্রম এখানে লক্ষিত হয়। যদিও বাক্যগুলোতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহার করা হয়নি। এছাড়া বাক্যে সংখ্যাবাচক শব্দের পরিবর্তে সংখ্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে।

বাগর্থতত্ত্ব

গোবাট (সংস্কৃত-গোপথ)
বন্ধ= বা বন্দ (বিস্তীর্ণ প্রান্তর)
গাঙ্= (নদী) সংস্কৃত গাঙ্গা অর্থ গঙ্গা।
বাটী= বাড়ি
হাল=সংস্কৃত হল
কেদার কেয়ার

পরিভাষিক শব্দ

ভুহল
হল>হাল (সংস্কৃত 'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গাল। এক হাল মানে ১২ কেদার ভূমি)।
কেদার>কেয়ার দুটি শব্দ এখনও ভূমি পরিমাপক হিসেবে প্রচলিত।
১৬ পণে ১ জষ্টি
৭ জষ্টিতে ১ পোওয়া

৪ পোওয়াতে ১ কেদার
৩ কেদারে ১ চৌকি
৪ চৌকিতে বা ১২ কেদারে ১ হাল

বিভিন্ন রূপমূল, শব্দভান্ডার, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠন থেকে বাংলার সঙ্গে গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি শব্দ বাদ দিলে কোনও শব্দই অজ্ঞাত ভাষার বলে মনে হয় না। এমনকি ওড়িয়া বা আসামি ভাষারও কোনও বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হয় না। বরং যে-টুকু সাদৃশ্য আছে তা স্থানীয় ভাষার সঙ্গেই। হয়তো তাই নৃপেন্দ্রলাল দাশ জোর দিয়ে বলেছেন, 'ভাটেরা তাম্রশাসনোক্ত এই ভাষা শ্রীহট্ট বা সিলেটেরই স্থানিক ভাষা।'[১৫] কিন্তু তিনি সম্ভাবনার কথাই বলেছেন। এখানে সে-সম্ভাবনার বিচার প্রসঙ্গেই সিলেটি উপভাষার ভাষাবৈজ্ঞানিক সূত্রও আরোপ করা হয়েছে।

সিলেটের ঔপভাষিক উপাদান

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিপরিবর্তন

সিরুপ<শ্রীরূপ
শৃহট্ট<শ্রীহট্ট
ভাটপাড়া>ভাটেরা
ভট্টপাটক>ভাটপাড়া
গাম<গ্রাম
কান্দি<কান্ধী
শৃপাতে<শ্রীপতি

রূপমূলতত্ত্ব

মুক্তরূপমূল : শৃ, ভাট, পড়া, বন্ধ, গাম, হল, মহুরা, বাটী, ইটা, তলা, ডর, কেদার/কিয়ার, আখালি, কোণা, হাটি, হাট, ঘট, গব্বর, টেঙ্গারী, কান্দি/কান্ধী, ভোগাড়, কুট, জুড়ী, গাঙ্গা, লঙ্গা, জোট্টী, ছড়া, বোবা, পাক, পাতে, আরু, রজক, হড্ডিপ, দ্যোত প্রভৃতি।

বাগর্থতত্ত্ব

গোবাট<গোপাট (সংস্কৃত 'গো-পথ')
বন্দ<বন্ধ= বা (বিস্তীর্ণ প্রান্তর)
গাঙ্<গাঙ্গা= (নদী) সংস্কৃত গাঙ্গা অর্থ গঙ্গা।
বাটী
হল>হাল=সংস্কৃত
কেদার>কেয়ার
ভাটপাড়া>ভাটেরা
ভট্টপাটক>ভাটপাড়া
গাম<গ্রাম
কান্দি<কান্ধী

শব্দভান্ডার : ভাটপাড়া, পড়া, বন্ধ, গাম, হল, মহুরা, বাটী, ইটা, তলা, ডর, কেদার/কিয়ার, আখালি, কোনা, হাটি, হাট, ঘট, গব্বর, টেঙ্গারী, কান্দি/কান্ধী, ভোগাড়, কুট, জুড়ী, গাঙ্গা, লঙ্গা, জোট্টী, ছড়া, বোবা, পাক, পাতে, আরু, রজক, হড্ডিপ, দ্যোত প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলো সিলেটের স্থানীয় ভাষা বা সিলেটি উপভাষার উপাদান হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং গবেষণায় প্রথম পর্যবেক্ষণ হচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অনুচ্ছেদটি সংস্কৃত নয়। যারা বলছেন মিশ্র বা অসমিয়া বা ওড়িয়া তা কিন্তু নয়। কেননা বাংলাভাষার ভাষাতাত্ত্বিক নানা উপাদানে তা ভরপুর। কিন্তু তখনও বাংলা গদ্যভাষা রূপনির্মিতি পায়নি। মানগদ্যের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এটাই হয়তো ছিল বাংলা আদি গদ্যের নমুনা। তা হলেও অনুচ্ছেদটিতে স্থানীয় ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। তখনও সিলেটি বলে আলাদা উপভাষা গড়ে না ওঠারই কথা। তবে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপে (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূলতত্ত্ব, বাগর্থতত্ত্ব ও বাক্যতাত্ত্বিক দিক থেকে) যে-বৈচিত্র্য ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে গড়ে উঠছিল স্থানীয় ভাষার প্রভাব বলতে তাই বোঝানো হচ্ছে। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় গৌড়ীয় বাংলার একটা প্রভাব আছে, সংস্কৃত শব্দের অধিক ব্যবহার, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সিলেটের সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বও এখানে প্রতিফলিত। তাছাড়া সিলেটে ঔপভাষী শব্দে অনুচ্ছেদটি আক্রান্তও। সুতরাং বাংলা গদ্যের আদিপর্ব ও উপভাষা গবেষণায় ভাটেরা তাম্রশাসনের সর্বাধিক ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য আছে বলে মনে হয়।

ভারতীয় তাম্রশাসনের লিপি ও সিলেটের তাম্রশাসন

প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি হিসেবে পিপরাওয়া (Piprahwa) পাত্রলিপিগুলো ব্রাহ্মী হরফে লিখিত ছিল।[১৬] অবশ্য এর ভাষা প্রাকৃত ছিল না বরং ছিল মাগধীর মিশ্রণে রচিত। তাম্রশাসনে খোদিত প্রথম লিপি তাহলে দাঁড়ায় সোহ্‌গৌরার ব্রাহ্মী হরফ। স্মিথ (Vincent A Smith) ও ব্যুহলার (G Buhler) উভয়েই একে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মীলিপি বলে অভিহিত করেছেন।[১৭] পরবর্তীকালে প্রাকৃতভাষায় রচিত ভারতব্যাপী অশোকের শাসনের লিপি হিসেবে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী নামে ভিন্ন জাতের খোদিত নমুনা দৃষ্ট হয়। এই দুই লিপিই ভারতের প্রাচীন লিপি। ব্রাহ্মী বাম থেকে ডানে, খরোষ্ঠী ডান থেকে বামে লিখতে হয়। উৎপত্তির দিক থেকে খরোষ্ঠী সেমীয় লিপি থেকে জাত, ব্রাহ্মী নিয়ে মতভেদ আছে। ব্যুহলার প্রমুখের মতে এটিও মূলত সেমীয়, কিন্তু তার বিশেষ প্রমাণ নেই। তবে ব্রাহ্মী লিপিই ভারতের প্রধান লিপি এবং খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের অর্থাৎ অশোকের ব্রাহ্মী লিপি স্থানকালের পরিবর্তন ও বিবর্তনের পথ ধরে আধুনিক ভারতের এবং পূর্ব-এশীয় বিবিধ লিপির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।[১৮] খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে প্রথম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ব্রাহ্মী লিপি মোটামুটি একই রূপ ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এর বিবর্তন শুরু হয় খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই।[১৯]

ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনের ইতিহাসে পরবর্তী দুই স্তর যথাক্রমে কুষাণ লিপি ও (প্রথম-তৃতীয় শতক) ও গুপ্ত লিপি (চতুর্থ ও পঞ্চম শতক)। খ্রিষ্টীয় শতকে ভারতজুড়ে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ-স্থানীয় লিপির উদ্ভব হয় এবং সপ্তম শতকজুড়ে সেসব লিপি থেকে আরও ভিন্ন ভিন্ন লিপির উদ্ভব হয়। পূর্বাঞ্চল লিপি কালান্তরে পূর্বী ও পশ্চিমী এ দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং পশ্চিমী শাখার নাগর লিপি গুজরাট-রাজপুতানা-মালব ও মধ্যদেশে প্রসার লাভ করে। নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতে নাগরী লিপির প্রসার ঘটে। পরে নাগর লিপি থেকে দেবনাগরী, গুজরাটি, কায়থি প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়।[২০] সপ্তম থেকে নবম শতকে পূর্ব-ভারতে পূর্বী লিপির ব্যাপক প্রচলন হয়। হরফের আকৃতি কিছুটা জটিল বা কুটিল ছিল বলে লিপিটি পরিচিতি পায় 'কুটিল' নামে। এই কুটিল লিপি থেকেই বাংলা লিপির উদ্ভব।[২১]

অশোক-উত্তরকালের ভারতীয় প্রায় সকল তাম্রশাসন বা অভিলেখ ব্রাহ্মী বা ব্রাহ্মীজাত লিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে। অশোক-অনুশাসনের ভাষা প্রাকৃত ছিল এবং তা ভারতের সর্বত্রই পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে সাহবাজগরহি ও মানসেরায় প্রাপ্ত শাসন খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ ছিল এবং বাকি শাসনগুলো ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ। ১৫০ অব্দের গিরনার রুদ্রদামনের ভাষা ছিল সংস্কৃত, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর লিপি হচ্ছে ব্রাহ্মী। ব্যুহলার অবশ্য বলেছেন, এর হরফগুলো দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মীবর্ণের পূর্বসূরি।[২২] নাসিকে প্রাপ্ত অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের পুলুমায়ির শাসনের সংস্কৃতভাবাপন্ন প্রাকৃত গদ্যের লিপিও ছিল ব্রাহ্মী। একইভাবে মোড়িয়লোবুতে প্রাপ্ত পল্লববংশীয় শিবস্কন্ধ বর্মা, কুণ্ডমুড়িতে প্রাপ্ত রাজা জয়বর্মা প্রমুখের শাসনাদি ব্রাহ্মী হরফে খোদিত ছিল।[২৩] গুপ্তযুগে গুপ্তবংশীয় রাজাদের বিভিন্ন সংস্কৃত শাসনাবলি, স্তম্ভলিপি, শিলালিপি ও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি ব্রাহ্মীজাত স্বতন্ত্র 'গুপ্তলিপি' ব্যাপক বিস্তৃতি পায়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহবাদ প্রশস্তিমূল অভিলেখের লিপিও ব্রাহ্মী, দীনেশচন্দ্র সরকার একে উত্তরভারতীয় শ্রেণির ব্রাহ্মী এবং দেবার্চনা সরকার আদিগুপ্তযুগের কৌশাম্বি শৈলীর বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৪] একইভাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলেখ ও উদয়গিরি গুহালেখ দুটিই উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ। তবে মথুরা স্তম্ভলেখে কুষাণ লিপির সাদৃশ্য বেশি বলে গবেষকদের মত।[২৫] স্থান ও কালভেদে গুপ্তলিপির নানা রূপ-রূপান্তরও ঘটেছিল এবং গুপ্তদের কালেই কয়েকটি হরফের আকৃতি নাগরীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হতে থাকে।[২৬]

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতক পর্যন্ত গুপ্তলিপির পরিবর্তিত রূপ হিসেবে কুটিল লিপি সারা উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং সংগত কারণেই রাজা যশোধর্ম মান্দাসোর, বৈসবংশী রাজা হর্ষবর্ধনের বংসখেড়া, চম্বার রাজা মেরুবর্মার চারখানা প্রভৃতি তাম্রশাসনের সংস্কৃত রূপ কুটিল হরফে খোদিত ছিল। খ্রিস্টীয় নবম শতকের পরবর্তীকালে আর্যলিপিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত নাগরী লিপি, ভারতজুড়েই এর ব্যাপ্তি ছিল। দশম শতক থেকে ভারতের অধিকাংশ স্থানে যেমন রাজপুতানা, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে লিপিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন অনুশাসন, শিলালেখ, দানপত্র প্রভৃতিতে লিপিটি উৎকীর্ণ হয় রাজকীয় মর্যাদায়। দক্ষিণ ভারতেও অপরাপর অনার্য লিপির পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কৃত শাসন নাগরীলিপিতে উৎকীর্ণ হয়। সমান কালে উত্তরভারতের বিভিন্ন রাজকীয় শাসনাবলিতে লিপিটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে শতকের শেষের দিকে উত্তরভারতীয় নাগরীলিপি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিভিন্ন শাসনে তার স্পষ্ট ছাপও লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়েছে। তাম্রশাসন বা শিলালেখ বিচারে ভারতীয় লিপিবিদ গৌরীশঙ্করের ভাষ্য—

> খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দীর উত্তরভারতীয় নাগরীলিপিতে কুটিললিপির ন্যায় অ, আ, প, ম, য, ষ, এবং স-এর শিরোভাগ দুভাগে বিভক্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে, খ্রিস্টীয় ১১শ শতাব্দী থেকে এ দু-ভাগ মিলে একটি শিরোরেখায় পরিণত হয়েছে এবং প্রত্যেক বর্ণের শির ততটা লম্বা রয়েছে যতটা অক্ষর চওড়া আছে। খ্রিস্টীয় ১১শ শতাব্দীর নাগরীলিপি বর্তমান নাগরীলিপির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আর, দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে বর্তমান নাগরীলিপির বিবর্তন পুরোপুর হয়ে যাওয়ায়, লিপি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।[২৭]

খ্রিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে নাগরীই একমাত্র লিপি ছিল।[২৮] আর রাজা প্রথম মহিপালের সময় (৯৭৫-১০২৬ খ্রি.) থেকে আদি-বাংলা (Proto-Bengali) বর্ণলিপির উদ্ভব হয়, মূলত যা কুটিলজাত।[২৯]

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্ন-ইতিহাসের প্রধান উপকরণ বিভিন্ন

অভিলেখ ও তাম্রশাসনে খোদিত লিপিমালা। বিহারে প্রাপ্ত অভিলেখের মধ্যে অশোকের অনুশাসনাবলি সবচেয়ে প্রাচীন। বাংলাতেও মৌর্যকালের একাধিক অভিলেখ পাওয়া গেছে। প্রাকৃত ভাষার এসব অভিলেখের লিপি ছিল ব্রাহ্মী হরফের। মহাস্থানগড়ের অভিলেখের লিপিও ছিল খ্রিষ্টীয় তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের হরফে উৎকীর্ণ।[৩০] এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের তাম্রশাসনগুলোর ভাষা সংস্কৃত হলেও এর লিপি বিভিন্ন। কামরূপশাসনাবলির লিপিবৈচিত্র্যের এতটা সমাবেশ দেখা যায় যে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য হর্জরবর্মা, বলবর্মা, বনমাল, রত্নপাল ও ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনের লিপিকে যথাক্রমে হাইয়ুংথল লিপি, নৌগাঁ লিপি, তেজপুর লিপি, বড়গাঁও-সোয়ালকুচি লিপি ও গৌহাটি লিপি বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসনে উত্তরী নাগরী ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশের অপরাপর তাম্রশাসনের লিপিবিচারে দেখা যায় গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের দামোদর তাম্রশাসনদ্বয়ের লিপি কেজি কৃষ্ণনের মতানুযায়ী উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীর পূর্বাঞ্চলীয় শৈলীতে উৎকীর্ণ।[৩১] এবং শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনের লিপি একাদশ শতকের উত্তরী নাগরী। সিলেটের তাম্রশাসনের বেলাতেও দেখা যায় বিভিন্ন তাম্রশাসনে একাধিক শৈলীর ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ হরফগুলো খুবই সুস্পষ্ট ছিল। ফলে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের পাঠোদ্ধারে ততটা বেগ পেতে হয়নি। লিপিটি ছিল সপ্তম শতকের উত্তরপূর্ব ভারতে পচলিত দেবনাগরী লিপির সিদ্ধমার্তৃকা ধরনের। ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনটির লিপি তাঁর সমকালীন হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে দগ্ধ হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণদের অনুরোধে যে-অনুশাসনের নবায়ন তিনি করেছিলেন তা ছিল মূল শাসনকর্তা ভূতিবর্মার সময়কার লিপিতে লিখিত অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকের লিপিতে। সেসময় উত্তর-পূর্ব ভারতে অন্যরূপ লিপির প্রচলন ছিল। দেবার্চনা সরকারের মতে, 'ওই সময় উত্তরপূর্ব ভারতে উত্তরকালীন উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। এই শাসনের লিপি সিদ্ধমাতৃকা, যা ওই লিপি থেকে বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র্য।'[৩২] ভাস্করবর্মার নবায়নকৃত শাসনের শেষে 'শাসনখানি পুড়িয়া যাওয়ার পর নূতন করিয়া লিখিত হওয়াতে যেহেতু অক্ষরগুলি (পূর্ব্ব লিখিত অক্ষর হইতে) ভিন্নরূপ হইয়াছে, অতএব এই সমস্ত কূট বা জাল নহে' কথাটির উল্লেখও আছে। ভাস্করবর্মার লিপিতে বানানগত নানা ভ্রান্তি প্রচুর। অনুস্বার, বিসর্গ প্রায় ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়নি। যিনি শাসনটি নকল করেছিলেন এ-ধরনের ভুল তারই অনবধানতা ও অজ্ঞতার ফল বলেই মনে হয়।

মরুণ্ডনাথের কালাপুর তাম্রশাসনটিও দেবনাগরীলিপিতে লেখা। লিপির ধরন উত্তর-পূর্বভারতীয় সপ্তম শতকের দেবনাগরী। ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনের লিপির সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কমলাকান্ত গুপ্ত লিপিটির আরও কিছু বিশিষ্টরূপের সন্ধান পেয়েছেন—

> Some of the letters bear strong resemblance with the letters of Afsad inscription of Gupta Emperor Adityasena of Magadha [7th century A.D.][৩৩]

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের গঠনশৈলী উত্তর-নাগরীর মতো। এ ধরনের লিপি দশম ও একাদশ শতকের বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। উৎকীর্ণ লিপিগুলো বিশেষভাবে খোদিত ছিল। মনে হয় সেটা তাম্রপট্টের পরিসরের ক্ষুদ্রতার জন্য। এতে লিপির পরিমাপ সামনেরগুলোর তুলনায় পেছনেরগুলো ছোটো।

গোবিন্দকেশব দেবের ভাটেরা প্রথম তাম্রশাসনের লিপিও দেবনাগরী, যা একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বঙ্গীয় প্রতিরূপ বলেই বিবেচনা করা যায়। অবশ্য নগেন্দ্রনাথ বসু এই লিপি দশম শতকের বলে অনুমান করেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্যও নগেন্দ্রনাথ বসুকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু অচ্যুতচরণ

চৌধুরী এব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন—

> প্রশস্তিদ্বয় নাগরাক্ষরে অঙ্কিত হইলেও কোন কোন অক্ষর যে বঙ্গাক্ষরের আদিরূপ, তাহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরও নিতান্ত আধুনিক বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ললিত বিস্তার গ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব অধ্যাপক শ্রীমিত্রের নিকট বঙ্গালিপি, অঙ্গালিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব খৃষ্টের ৫৫৭ বর্ষ পূর্বে আবির্ভূত হন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সময়ের অক্ষর যে প্রশস্তি অক্ষরের ন্যায় হইতে পারে না, তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া প্রয়োজন। তর্কস্থলে দশম শতাব্দী মানিয়া লইলেও ইহা সহস্র বর্ষের পূর্ব্বকার বলিতে হইবে।[৩৪]

তাম্রশাসনের লিপিপ্রশ্নে অচ্যুতচরণের এ-মত কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কেননা বঙ্গালিপি খ্রিষ্টের জন্মের কয়েকশত বছর পর থেকেই নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছিল। বাংলা লিপির বিবর্তনক্রম অনুসরণ করে আমরা তা একাদশ বা দ্বাদশ শতকীয় রূপ বলেই গণ্য করব। কমলাকান্ত গুপ্ত নিজেও এটা স্বীকার করে বলেছেন—

> The charecter of the letters engraved is a type of Northern Nagri of latter peried (11th or 12th century A.D.) Some of the letters may be called as precursors of Bengali scripts.[৩৫]

ঈশানদেবের ভাটেরা দ্বিতীয় তাম্রশাসনটিও উত্তরী নাগরীতে উৎকীর্ণ হয়েছে। এই লিপি বিবর্তনের মাধ্যমেই মধ্যযুগীয় বাংলা লিপির অবয়ব তৈরি হয়েছে। অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিপিটিকে খ্রিষ্টের জন্মের সমসাময়িক বিবেচনা করলেও শৈলী বিচারে মেনে নেওয়া যায় না। বরং নগেন্দ্রনাথ বসুর মত লিপিকালের কাছাকাছিই বলা যায়। তিনি বলেছেন ঈশানদেবের এই লিপি দশম শতকের লিপির অনুরূপ। কমলাকান্ত গুপ্তের লিপি বিচারই সবচেয়ে সঠিক বলে আমাদের বিবেচনা—

> The character of the letters is a type of Northern Nagri of latter period (11th or 12th century A.D.) and maay be called precurspr of Bengali script.[৩৬]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতকে উত্তরপূর্ব ভারতে দেবনাগরী, উত্তরী নাগরীসহ নানা লিপির প্রচলন ছিল এবং আর্যশাসকদের লিপিসূত্রে এসব লিপিতেই শ্রীহট্টের তাম্রশাসনগুলো উৎকীর্ণ হয়েছিল। লিপিগুলোর দুধরনের ঐতিহাসিক মূল্য এখানে ধরা পড়ে যে, পূর্বাঞ্চলে দেবনাগরী যে-রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা, আর এই দেবনাগরীর কীরূপ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মধ্যযুগে বাংলা লিপি নিজস্ব আকার ধারণ করেছিল—তার নিদর্শন-সূত্র হিসেবেও।

উপসংহার

এভাবে দেখা যায় সিলেটের তাম্রশাসনের উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষার উত্তর-পূর্ব ভারতীয় যে রূপ অর্থাৎ গুপ্তশাসন-উত্তর বাংলা ও আসামের অপরাপর তাম্রশাসনের সংস্কৃতের সমধর্মী এবং নিঃসন্দেহে তা ভারতীয় শিলালেখ-অভিলেখ বা তাম্রশাসনের ভাষার ঐতিহ্যসূত্রে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ রূপ। লিপিগত দিক থেকেও ওই একই কথা বলা চলে যে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির নানা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক রূপের বিশেষ নিদর্শন এই তাম্রশাসনগুলো। সেদিক থেকে সিলেটের তাম্রশাসনের ভাষা ও লিপি নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, ১৯৮৯, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা,* অনু.: মণীন্দ্রনাথ সমাজদার, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ২;

২. সুকুমার সেন, ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯৮;

৩. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৬৯, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, পৃ. ৯;

৪. সুকুমার সেন, ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১০১;

৫. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৬৯, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, পৃ. ৯;

৬. সুকুমার সেন, ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১০১;

৭. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৬৯, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, পৃ. ৯;

৮. দেবার্চনা সরকার, ২০১৩, *নিত্যকালের তুই পুরাতন,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ১৭;

৯. প্রাগুক্ত;

১০. সুকুমার সেন, ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১০১;

১১. প্রাগুক্ত;

১২. দীনেশচন্দ্র সরকার, ১৯৮৫, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা: সাহিত্যলোক, পৃ. ১৪;

১৩. কমলাকান্ত গুপ্ত, ১৯৯৭, 'শ্রীহট্টে প্রাপ্ত তাম্র শাসনাবলী', *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সম্পা: আবদুল আজিজ, সিলেট: বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ, পৃ. ২৮;

১৪. Kamalakanta Gupta, 1967, *Copper-Plates of Sylhet,* Sylhet: Lipika Enterprise Ltd., pp.164-66;

১৫. নৃপেন্দ্রলাল দাশ, ২০১৭, 'ভাটেরা তাম্রশাসনে আদি বাংলা নিদর্শন' *বোবা বেহাগ,* সিলেট: লোকজ প্রকাশনী, পৃ. ২০;

১৬. S. N. Chakravarti, 1908, 'Development of the Bengali Alphabet from 5th Century A.D. to the end of Mohamedan', *JRASB,* Vol. IV, p. 351;

১৭. G. Buhler, *Indian Paleography: The Origin of Brahmi Alphabet,* Indian Studies III;

১৮. সুকুমার সেন, ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২৭;

১৯. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, ১৯৭৬, *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা,* ঢাকা: মখ্‌দুমী অ্যান্ড আহসানউল্লাহ্ লাইব্রেরি, পৃ. ১৭৪;

২০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫-১৭৬;

২১. সুকুমার সেন, ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২৭;

২২. উদ্ধৃত, জর্জ ব্যুহলার। দেবার্চনা সরকার, ২০১৩, *নিত্যকালের তুই পুরাতন,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ১৭;

২৩. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৬৯, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, পৃ. ৯৬-১০০;

২৪. দেবার্চনা সরকার, ২০১৩, *নিত্যকালের তুই পুরাতন,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ৩২;

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩;

২৬. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, ১৯৮৯, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা,* অনু.: মণীন্দ্রনাথ সমাজদার, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১১১;

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭;

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬;

২৯. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, ১৯৭৬, *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা,* ঢাকা: মখ্‌দুমী অ্যান্ড আহসানউল্লাহ্ লাইব্রেরি, পৃ. ১৭৬;

৩০. দীশেচন্দ্র সরকার, ১৯৮৫, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,* কলকাতা: সাহিত্যলোক, পৃ. ১৪;

৩১. দেবার্চনা সরকার, ২০১৩, *নিত্যকালের তুই পুরাতন,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ৭২;

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬;
৩৩. Kamalakanta Gupta, 1967, *Copper-Plates of Sylhet,* Sylhet: Lipika Enterprise Ltd., p. 69;
৩৪. অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ২০০৪, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* [প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ ব.], ঢাকা: উৎস প্রকাশন, পৃ. ১৭৩;
৩৫. Kamalakanta Gupta, 1967, *Copper-Plates of Sylhet,* Sylhet: Lipika Enterprise Ltd., p. 154;
৩৬. Ibid, p. 189.

ISSN 2707-9201

নানকার ও কৃষক-প্রজা বিদোহ (১৯৩৬-১৯৪৭): 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন' ও তৎকালীন রাজনীতি

দীপংকর মোহান্ত*

সারসংক্ষেপ: আদি-মধ্যযুগে সিলেটে ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে এক বিশেষ 'দাস শ্রেণি'র উদ্ভব হয় যারা শুধু খাদ্যের বিনিময়ে নিজেদের শ্রম ভূ-স্বামী/জমিদার পরিবারে বংশানুক্রমে জোগান দিত। মোগল শাসনামলে সিলেটে সনদপ্রাপ্ত কিছু পরিবার বিশাল ভূ-ভাগের মালিক হয়। বিশ শতকে সিলেটে জমিদারিব্যবস্থায় এই শ্রেণির লোকজন 'নানকার প্রজা', 'কিরাণ' বা 'খানে-বাড়ি' লোক হিসেবে গ্রামীণ সমাজে চিহ্নিত হয়। এই শ্রমদাসদের অন্দরমহলও ছিল 'প্রভু'দের নিয়ন্ত্রণে; অর্থাৎ নানকার নারী সমাজের ওপর কোনও কোনও জমিদার ও তাদের যুবক সদস্যদের আদিম লালসা মেটানো ছিল স্বাভাবিক জীবনের অংশ। বিশ দশকের অসহযোগ আন্দোলন নানকার ও রায়তদের কিছুটা চোখ-কান খোলতে নিজেদের অধীনতার ব্যূহ ভাঙতে প্রেষণা জোগায়। ত্রিশের দশকে সিলেটে নানকার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৩৬ সাল থেকে স্পষ্টত সিলেটে নানকার ও প্রজা-কৃষকদের দ্বৈত আন্দোলন সমান্তরালবর্তী হয়ে ভোগ-দখলীয় ভূমিতে প্রজার স্বত্ব আদায়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক চেতনায় অগ্নি-যাত্রার অভিঘাত শুরু হয়ে যায়। তাই নানকারদের পাশাপাশি প্রজা-কৃষক, রায়ত, বেগার, হদ-বেগার, কিরাণ প্রভৃতি সমাজের লোক একাট্টা হয়ে মাঠে নামে। সিলেটে তখনও কোনও 'প্রজাস্বত্ব' আইন ছিল না। এমতাবস্থায় তারা 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'-এর [১৮৮৫] আদলে ভোগ-দখলীয় ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি তোলে। সূচনালগ্নে নানকার ও কৃষক আন্দোলনের উত্তাপ ছড়াতে চেতনাগত উপাদান দিয়েছিল 'শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি'র [১৯৩৫] রণ-কৌশল ও 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'র [১৯৩৬] শৃঙ্খল ভাঙার উদ্দীপনাময় গাঠনিক কাজ। নানকার ও কৃষক-প্রজার বিদ্রোহের আশঙ্কায় আসাম সরকার ১৯৩৬ সালে তড়িঘড়ি করে শিলং পার্লামেন্টে 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব' আইন পাস করে নেয়। কিন্তু এই আইন মূলত জমিদারের স্বার্থকে রক্ষা করেছিল। কৃষক সমিতি, নানকার ও কৃষক-প্রজা এ আইন প্রত্যাখ্যান করে এবং চারদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়ায়। আন্দোলনের মুখে জমিদাররা নানকার প্রথাবন্ধ কালো আইন প্রয়োগে কিছু শৈথিল্য ভাব দেখায়। যে কারণে ত্রিশের দশকে সিলেটে রায়তদের 'প্রজাস্বত্ব' আন্দোলন তাড়াতাড়ি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক নেতা ও স্থানীয় জমিদার করুণাসিন্ধু রায় [সুনামগঞ্জ] এমএলএ নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই শিলং পার্লামেন্টে 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধিত বিল' প্রজাদের স্বার্থে

* সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পিটিআই, সিলেট।

উপস্থাপন করেন। কিন্তু আসাম সরকার করুণাসিন্ধু রায়ের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন আটকে রাখার ফন্দি আঁটে। এই প্রেক্ষাপটে সিলেটের বিয়ানিবাজার, লাউতা, বাহাদুরপুর, কুলাউড়া, ভাটিপাড়া, গৌরারং, রফিনগর, সুখাইড়, রণকেলী, বাঘা, ঢাকাদক্ষিণ, ভাদেশ্বর, ফুলবাড়ি, বানিয়াচং, সানেশ্বর, দাসেরবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে নানকার ও কৃষক-প্রজা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। নানকার ও রায়তি প্রজা-কৃষকদের আন্দোলন দৃশ্যত ব্রিটিশ আমলে শুরু হলেও প্রশাসন কোনওভাবেই সে দিকে আমল দেয়নি। পরবর্তী পাকিস্তানের প্রশাসনও একই চক্রে ঘুরতে থাকে। নানকার ও কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ-সংগ্রাম করে রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি দাড়ায়। ১৯৪৯ সালে সুনাই নদীর তীরে শহিদ কৃষকদের রক্তস্রোতে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। একটা নেতিয়ে পড়া সমাজ কীভাবে ভূমির অধিকার বা 'প্রজাস্বত্বে'র জন্য সংগ্রাম করেছিল—তাই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই আন্দোলন পূর্ববঙ্গের অন্য কোথাও হয়নি।

চাবিশব্দ: জমিদার; রায়ত; নানকার; শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন; শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি; কৃষক সংগ্রাম; নানকার বিদ্রোহ।

বড়ো-বড়ো হাওড়-পাহাড়-জলাশয় এবং সমতলের অঢেল জমি নিয়ে বৃহৎবঙ্গের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীন শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার অবস্থান। ভৌগোলিক কারণে সিলেটের অধিকাংশ লোক ছিল কৃষিজীবী। তাদের বৃহৎ অংশই ছিল জমিদারদের রায়তি বা প্রজা। কোম্পানি শাসনের শুরুতে বৃহত্তর সিলেটে বড়ো জমিদারের সংখ্যা অল্প হলেও ১৭৭০ সালে ৭,৩২৭টি গ্রামের ইজারাদার ছিলেন ২,৫০০ জন চৌধুরী। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এস্টেট সংখ্যা দাড়ায় ৩০,০০০টি। সিলেটে একজন মিরাশদারের অধীনেও প্রচুর জায়গা ছিল। সিলেটে ভূমি পর্যাপ্ত জোগানের কারণে 'পাইকাস্ত রায়ত' সংখ্যা ছিল বেশি। সাধারণ রায়তের মধ্যে ভূমির মালিকানা অর্জনের জন্য 'প্রাণান্তকর' প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়নি। তারা অনাবাদি ভূমির জন্য লড়াইও করেনি। জমি পাওয়ার জন্য প্রজাদের মধ্যে 'প্রতিযোগিতা' ছিল না বললে চলে। ফলে মিরাশদার কিংবা চৌধুরীগণ তাদের জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করতে সচরাচর দেখা যায়নি। স্থানীয় ভূমির পরিমাণ বেশি থাকায় আশপাশ জেলা থেকে লোকজন এদিকে এসে 'প্রজা' হতেও দেখা গেছে। স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেকটা কেন্দ্রীভূত থাকে মূলত জমিদার, ছোটো ছোটো ভূ-স্বামী, চৌধুরী, তালুকদার এবং মিরাশদারের মতো ইজারাদার শ্রেণির হাতে। সিলেটের কৃষক-প্রজা বা রায়তি লোকেরা মূলত ছিল 'ভূস্বামীর ইচ্ছাধীন প্রজা'। এদেরকে বলা হতো 'নানকার'। ১৯৩৬ সাল থেকে স্পষ্টত সিলেটে নানকার ও প্রজা-কৃষকদের দ্বৈত আন্দোলন সমান্তরালবর্তী হয়ে ভোগ-দখলীয় ভূমিতে প্রজার স্বত্ব আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। তাই নানকারদের পাশাপাশি প্রজা-কৃষক, রায়ত, বেগার, হদ-বেগার, কিরাণ প্রভৃতি সমাজের লোক একাট্টা হয়ে মাঠে নামে। সিলেটে তখনও কোনও 'প্রজাস্বত্ব' আইন ছিল না। এমতাবস্থায় তারা 'বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন'-এর [১৮৮৫] আদলে ভোগ-দখলীয় ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে এবং আন্দোলনটি দমাতে রাষ্ট্রশক্তি দমন-পীড়ন করে। ভূমিকেন্দ্রিক সিলেটের জনজীবনে যে নানারকম সামাজিক স্তরের সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন রতনলাল চক্রবর্তী। তাঁর ভাষায়—

> ভূমি ব্যবস্থার সাথে সমাজব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিলেটে ভূমির সাথে সম্পর্কিত তিনটি শ্রেণির সামাজিক অবস্থান স্বতন্ত্র। ভূমি-অধিকারকে কেন্দ্র করে সিলেটে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা হলো: ক) জমিদার, মিরাশদার ও তালুকদার নিয়ে একটা ভূস্বামী শ্রেণি, যা মূলত উচ্চবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে; খ) ভূমির মালিকানাসহ একদল কৃষক যারা ছিল

> মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; এদের অনেকেই ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত ছিল; এবং গ) ভাগভাগী ও কৃষিশ্রমিক, যা চাকরান ও নানকার ভূমি চাষাবাদ করত। [...] তাদের ছিল না ভূমিস্বত্ব এবং ভূমিস্বত্ব পাওয়ার জন্য উদগ্র বাসনাও ছিল না।'[১]

নানকার ছিল জমিদারের 'ইচ্ছাধীন প্রজা'। সামন্ত যুগের দাস শ্রেণির মতো কার্যত তাদের কোনও স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। সিলেটে সৃষ্ট প্রান্তিক সমাজের জাত-বিচারে দশ থেকে পনেরো ধরনের নানকার প্রজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন—মাহারা ও মালাকার [হিন্দু, অন্দরমহলের নারীদের পালকি বা সোহারি টানা], পাটনী [হিন্দু], ভান্ডারি [হিন্দু], বাজনী [মুসলমান বাদ্যকর], ডুগলা বা ঢুলি [হিন্দু], ধোবা [হিন্দু], নাপিত [হিন্দু], হাজাম [মুসলিম], খালুয়া [মুসলিম], কিরাণ [মুসলিম], নমঃশূদ্র [হিন্দু], মাইমল [মুসলিম], মুচি-মেথর [অল্প সংখ্যক] প্রভৃতি। তারা বৃহৎ সমাজে সুদীর্ঘকাল 'জলচল হীন' ছিল। তাছাড়াও নানা জাতের নিরন্ন দিনমজুর ছিল। এই প্রজারা প্রাচীন দাস প্রথার মতো জমিদার পরিবারে চিরদাসত্বে বাধা থাকতো। তাদের বসবাস ছিল জমিদারবাড়ির কাছাকাছি—যাতে দ্রুত হুকুমে, হাক-ডাকে পাওয়া যায়। তারা জমিদারবাড়ির [স্নান ও রান্নার] পানি দেওয়া, আনাজকুটা, টয়লেটের পানি সরবরাহ, শিশু ও রোগীর সেবাযত্ন ও ময়লা পরিষ্কার করা, বাজারের ভারবহন [ভারুয়া], সুয়ারি-পালকি বহন, বিশেষপর্বে বাজনা বাজানো [হিন্দু], নিত্যদিন ঘরের বাসন-কুশন মাজা, ঝাড় দেওয়া, ঘর-উঠোন লেপন, পঞ্চায়েতি খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা, সামাজিক নিমন্ত্রণে কলাপাতা কাটা, ধানবানা, হুক্কা-টিক্কা বানানো, গোরু-ছাগল-ঘোড়ার ময়লা ফেলা ও যত্ন নেওয়া ইত্যাদি নোংরা কাজ করতো। তারা জন্মগত বা ক্রয়কৃত ক্রীতদাসও ছিল না; অথচ প্রদত্ত শ্রমের মূল্য হিসেবে নগদ অর্থ বা ধান কিছুই পেত না। অর্থাৎ পরিবারশুদ্ধ শ্রমের মূল্য হিসেবে ছিল খাজনা বিহীন একটুখানি চাষাবাদের জায়গা ও উচ্ছিষ্ট খাবার। ব্যবহারিক জীবনে শর্তের আবর্তে পড়ে নানকাররা অন্য কোথাও কাজে যেতে পারতো না। তাদের গাছ, পুকুর, বাঁশ—এমনকি নারী কিংবা মেয়ের ওপর জমিদারবাড়ির ষোলো আনা বৈধ ও আইনি অধিকার ছিল। জমিদারগণ নানকার প্রজাদের ওপর এই অধিকার বংশানুক্রমে ধরে রাখতো। নানকার আন্দোলনের নেত্রী অপর্ণা পালচৌধুরী [১৯২২-১৯৯২] লেখেন—'নানকারদের সুন্দরী স্ত্রীকে পর্যন্ত সারাদিন জমিদারবাড়ি থেকে সেবায় রত থাকতে হতো। এই অবস্থার কোনও প্রতিকার ছিল না।'[২] প্রফেসর আবদুল আজিজ নানকার প্রথাকে 'সিলেটের সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার একটি কলঙ্কজনক বৈশিষ্ট্য'[৩] বলে অভিহিত করেছেন।

'নানকার প্রজা' শব্দটি কখন চালু হয়—তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফারসি 'নান' অর্থ রুটি—অর্থাৎ রুটির বিনিময়ে থাকা জমিদারের অধীনস্থ বিশেষ প্রজা বোঝায়; ভালো করে বললে—'রুটি'ই হচ্ছে 'শ্রমিকের মূল্য; কিন্তু সিলেটে রুটির চেয়ে ভাতের প্রচলন বেশি ছিল। ফলে এই ধরনের প্রজাকে গ্রামাঞ্চলে 'খানে বাড়ি' প্রজা বলা হতো—এখানে 'খান'—'খানি' বা খাদ্য গ্রহণের বিনিময়ে নানকারদের শ্রমদান বোঝায়। 'নানকার প্রজা' শব্দটি নানকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও জমিদার তনয় অজয় ভট্টাচার্য [১৯১৪-১৯৯৯] তার 'নানকার বিদ্রোহ'[৪] গ্রন্থে ব্যবহার করেন বলে প্রতীয়মান। সেকালের *জাগরণ*[৫] পত্রিকার [সিলেট, ১৯৩৮] কোনও খবরের শিরোনামে 'নানকার' শব্দটি দৃষ্টিগোচর হয় না। জমিদারের 'অধীন প্রজা' অর্থে সাধারণত তারা 'কিষাণ' শব্দ ব্যবহার করেছে। নানকার ও কৃষক আন্দোলনের নেতা লালমোহন রায় [১৯১২-২০১৬] নানকারদের ওপর নানামুখি নির্যাতন স্বচক্ষে দেখেছেন। তার কথায়—

> [...] নানকারদের ভাগ্যে 'বাসিভাত' ও বাসি তারকারি, লবণ, শুটকি, কাচামরিচ থাকত নির্ধারিত। ... জমিদার পরিবারে ছোটো বড়ো সদস্যকে অবস্থা ভেদে পা ছুঁয়ে প্রণামের রেওয়াজ

> ছিল। জমিদারকে না জানিয়ে গাছ কাটা যেত না। যে কোনও কাজে তার অনুমতি নিতে হত। পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণের জন্য পানসুপারী সাজিয়ে নিয়ে জমিদারের সামনে রেখে ও মাথা নত করে এবং করজোড়ে বিনয় সহকারে আদেশ নিতে হত। আমাদের সময়ও প্রজাদের উপর জমিদারের শাস্তি ছিল বহু রকমের—যেমন লম্বা জুতা দিয়ে পেটানো, জুতা গলায় ঝুলানো, কান ধরা, লাথি মারা, নাখে খত দেওয়া, গারদে রাখা ইত্যাদি প্রায় বিশ ধরনের শাস্তি। কিন্তু জমিদার ও তার পাইকপেয়াদাদের কোনও দোষ ধরা যাবে না। তারা জমি পরিমাপ করতো হাতের তৈরি বাশের নল দিয়ে—মাপ দিত কম, বলত বেশি। ধান পরিমাপ করত নিজের ইচ্ছামতো; বড়ো 'পুরা' দিয়ে ধান পরিমাপ করলেও তারা মুখে বলতো কম। এইসব দৃশ্য আমাকে জমিদার বিরোধী ও প্রতিবাদী করে গড়ে তুলেছিল। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে আমি কৃষকদের নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি।[৬]

১৯৪৭ সালে সিলেটে নানকার প্রজা ছিল প্রায় দশ লক্ষ[৭]। নানকার প্রজারা জমিদারের অমানবিক অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং ভূমির অধিকার কিংবা ন্যায্য প্রাপ্তির কথা বৃহৎ সমাজে তুলে ধরতে পারেনি। ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব সিলেটে পড়লেও নানকারদের পালে সে হাওয়া লাগেনি। পরবর্তী অসহযোগের [১৯২১] ঢেউ কোনও না কোনওভাবে তাদের কাছে পৌঁছায়। ১৯২২ সালে ধরমপাশার সুখাইড়ের জমিদারবাড়ির নারীলোলুপ অধিকর্তার অপকর্মের বিরুদ্ধে তার নিয়ন্ত্রিত নানকার প্রজারা প্রতিবাদ জানায়।[৮] তাদের পাশে সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য না থাকলেও নিজস্ব কায়দায় তারা জমিদারবাড়ির নিত্য কাজকর্ম বর্জন করে। সুখাইড়ের জমিদারের বিরুদ্ধে অসংগঠিত এই আন্দোলনের আগুন সমকালে না বাড়লেও গৌরারং, ভাটিপাড়ার নানকার প্রজাদের প্রতিবাদী চরিত্রে সংক্রামিত হয়েছিল। তবে নানাকারদের কোনও সাংগঠনিক শক্তি ছিল না। এ অবস্থায় তারা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সমর্থন পায়। 'শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি' তখন সকল ধরনের অধিকার বঞ্চিত প্রজাদের সংগঠিত করতে থাকে। ত্রিশের শুরুতে সিলেটে কংগ্রেসিদের মধ্যে সুভাষ বসুপন্থিরা[৯] ভানুবিল[১০]মণিপুরি কৃষক বিদ্রোহে[১১]শক্তি জোগায়। অবশেষে ভানুবিলের মণিপুরি প্রজাদের বিদ্রোহের কিছু দাবি জমিদার পক্ষ মেনে নেয়। ফলে ভানুবিল কৃষক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু অনতিদূরের অঞ্চলসমূহে নানকপ্রথা রহিতকরণ ও প্রজাস্বত্ব [ভূমি অধিকার] আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। স্থানীয়ভাবে জমিদার কর্তৃক ভূমি বণ্টন, খাজনা নির্ধারণ, ভূমি পরিমাপ, খাজনা টাকার হিসাব ধানে রূপান্তর, জমিদারের ফসলি উপঢৌকন পাঠানো, পার্বণী দেওয়ার কোনও নীতিমালা যেমন ছিল না; তেমনই জমিদার কর্তৃক যে কোনও সময় ভূমি থেকে প্রজা উচ্ছেদ করতে পারত; আবার খাজনার রশিদও দেওয়া হতো না। নানকার ও কৃষক-প্রজাদের নেতৃস্থানীয়রা অনুভব করে যে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের আলোকে সিলেটে প্রজাস্বত্ব আইন করা জরুরি। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মূলনীতি ছিল 'রায়তের স্বার্থ বজায় রাখার ব্যবস্থা'[১২]। কিন্তু আসাম প্রদেশে প্রজার কোনও ভূমিস্বত্ব ছিল না। ১৯৩৫ সাল থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের বাতাবরণে সিলেটে নানকার প্রজা ও কৃষক-প্রজা অভিন্ন লক্ষ্যে তাদের 'প্রজাস্বত্বে'র দাবিকে জোরালো করে। তখন নানকার ও কৃষক-প্রজাদের পাশে দাঁড়ায় 'শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি' এবং কংগ্রেসের সুভাষপন্থি নেতাকর্মীরা। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় পড়ুয়া সিলেটের প্রগতিশীল কয়েকজন ছাত্র গোপনে 'শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ে তোলে।[১৩] মূলত এই পার্টির লোকজন নানাকার ও প্রজা-কৃষকদের মধ্যে কাজ করে সব ধরনের রায়তিদের সংগঠিত করে প্রজাস্বত্ব আন্দোলনকে বেগবান করে। সিলেটের প্রজা-কৃষক আন্দোলনের সময়ই সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ভারতীয় 'কৃষান সভা' [১৯৩৬]। বাংলাভাষীদের অঞ্চল

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৬-১৭ আগস্ট ১৯৩৬ সালে কলকাতা আলবার্ট হলে বঙ্কিম মুখার্জিকে [১৮৯৭-১৯৬১] আহ্বায়ক করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতি'র জন্ম হয়।[১৪] এই শাখার অধীনে দ্রুত গঠিত হয় 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'। অতঃপর গঠিত হয় 'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি'।[১৫] বঙ্গ প্রদেশ ও সিলেট কৃষক সমিতির সঙ্গে যোগসূত্রকারী নেতা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি [১৮৯৭-১৯৬১]।[১৬] তার অনুপ্রেরণায় সিলেটের কৃষকদের পুনর্গঠিত করে লালা শরদিন্দু দে [১৯০৪-১৯৮৭] সিলেটের বেগার, নানকার, কিরাণ, প্রজা-কৃষকদের নিয়ে সম্মেলন করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করেন করুণাসিন্ধু রায়ের [১৮৮৪-১৯৪৯] সঙ্গে। করুণাসিন্ধু রায় তখনকার 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'র সভাপতি বেহেলীর জমিদার ও রাজনৈতিক নেতা। সুনামগঞ্জের দুর্গম বেহেলী গ্রামে ১৯৩৬ সালের [?] ডিসেম্বর মাসে 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'য় [প্রথম সম্মেলন] শতশত নানকার ও কৃষককর্মী উপস্থিত হয়। এই কৃষক সভার সম্মেলন থেকে প্রথম সাংগঠনিকভাবে নানকার ও কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হচ্ছে—

১) ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর বা ১২ বৎসরের অধিককাল কোনও জমি বা বাড়ি কোনও প্রজার ভোগদখলে থাকলে সেই বাড়ি ও জমিতে প্রজারস্বত্ব বর্তাবে;
২) প্রজাদের তাদের বাড়ি ও জমিতে কূপ খননের ও পাকা বাড়ি তৈরি করার অধিকার দিতে হবে;
৩) আবওয়াব, নজরানা প্রভৃতি বে-আইনি আদায় বন্ধ করতে হবে;
৪) নানকার-প্রথার বিলোপ সাধন করতে হবে;
৫) সিলেট ও কাছাড়ের চা শ্রমিকদের চা বাগানের উদ্বৃত্ত জমিতে স্বত্বাধিকার দিতে হবে।
৬) প্রজাদের উপর সমস্ত প্রকারের পীড়ন বন্ধ করতে হবে এবং সামাজিক অবমাননামূলক রীতিনীতির বিলোপ সাধন করতে হবে;
৭) ফসলে খাজনা দেওয়ার পরিবর্তে টাকার খাজনা ধার্য করতে হবে;
৮) খাজনার ফারগা (রশিদ) দিতে হবে।[১৭]

এই সম্মিলনের নেপথ্যে ছিল 'শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি'। অন্যদিকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেতাকে সিলেটের নানা স্থানে পাঠানো হয়—যেমন সুনামগঞ্জের শহিদ কৃষকনেতা রবি দাম [(১৯১৬-১৯৪৯); ২৬ মার্চ পাকিস্তান পুলিশের গুলিতে শহিদ)] শাল্লা-ধরমপাশা-মধ্যনগর কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। তিনি বজ্রকঠিন দৃঢ়তায় গৌরারং জমিদারবাড়ি ও সুখাইড় জমিদারের এলাকায় কৃষকদের নিয়ে মিছিল ও ঘেরা করেছিলেন। জলঢুপ [বিয়ানিবাজার], ঢাকাদক্ষিণ, লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করার দায়িত্বে ছিলেন বারীন দত্ত, অবলাকান্ত গুপ্ত, সুরেশ দেব, বীরেশ মিশ্র প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে লাউতা-বাহাদুরপুরের সমন্বয়ে থাকেন ছাত্র ফেডারেশনের তরুণ কর্মী ও জমিদারপুত্র অজয় ভট্টাচার্য [১৯১৪-১৯৯৯]। সুনামগঞ্জের সুখাইড়, রফিনগর, গৌরারং, ভাটিপাড়ার নানকারদের সঙ্গে সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ, রণকেলী, লাউতা, বাহাদুরপুর, ভাদেশ্বর এবং মৌলভীবাজারের রবিরবাজার-কুলাউড়া, বড়লেখার দাসেরবাজার অঞ্চলের নানকারদের জীবনধারায় মিল ছিল। সুনামগঞ্জের প্রভাবে বিয়ানিবাজার-বড়লেখা অঞ্চলের প্রজা-কৃষকরা আন্দোলনে নামে। প্রথমদিকে 'তরুণ সংঘে'র বিপ্লবীরা স্থানীয় 'জুয়েল ক্লাব'-এর আড়ালে জমিদারের পীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে এ অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করতে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে লালমোহন রায় [১৯১২-২০১৬] সানেশ্বর-দাসেরবাজার অঞ্চলে চলে আসেন।[১৮] তিনি 'বকুল' ছদ্মনামে কৃষককের মধ্যে কাজ শুরু করেন। কৃষকরা মনে

করতো লালমোহন রায়ের বাড়ি সে অঞ্চলের কোথাও। তিনি অল্প সময়ে কৃষকদের আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন। নানকার আন্দোলনের নেত্রী হেনা দাস দাসেরবাজার অঞ্চলে লালমোহন রায়কে প্রজা-কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে দেখেছিলেন।[১৯]

'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি'র কর্মসূচি ও পরামর্শ মতো আন্দোলনরত অঞ্চলের নানকার, বেগার এবং রায়তিগণক্রমে জমিদারের হুকুম পালন থেকে বিরত থাকে, তারা জমিদারবাড়ির নিত্যদিনে গৃহকর্ম বর্জন করে। এমনকি জমিদারের বিরুদ্ধে মিছিল দিয়ে কাছারি ঘেরাও করেছে। জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীকে প্রতিহত করা শুরু করে। জমিদারের ভারুয়া, নাপিত, ক্ষৌরকর্মকার, ছুতোরগণ কাজ বন্ধ রাখে। এমনকি হাটবাজারের কৃষিপণ্য বিক্রেতারা পর্যন্ত জমিদারদের বয়কট করে।[২০] অন্যদিকে জমিদাররা প্রতিশোধ নিতে হাতি দিয়ে নানকারদের অনেক বাড়ি ভেঙে দেয়। লাউতা-বাহাদুরপুর কিংবা সুখাইড়-গৌরারং জমিদারিতে নানকার এবং জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী মুখোমুখি দাড়ায়। জমিদারের লোকজন নানকার নারীদের ওপর অত্যাচার করতে গেলে বা আন্দোলনকারীদের খোঁজতে গেলে মহিলারা মরিচের গুড়ো এবং সাবান-পানি মিশিয়ে বাশের 'পিছকিরি' দিয়ে ওদের চোখে ছোড়তো। এই ধরনের প্রতিরোধ ছিল নানকার নারীদের বাচার জন্য স্থানীয় কৌশল।[২১] জমিদারের সাথে নানাকার, বেগার, কিরাণ, রায়তি কৃষকদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে আসাম সরকার ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে তড়িঘড়ি করে শিলং পার্লামেন্টে 'শাহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন' পাস করিয়ে নেয়। 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব' আইনের [মূল] বিধানসমূহ[২২] ছিল নিম্নরূপ:

১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোর পর হতে যে সমস্ত রায়তের কোনও সময় খাজনা বৃদ্ধি করা হয়নি—সে সব রায়ত চিরস্থায়ী রায়ত হিসেবে গণ্য হবে। কোনও জমিদার চিরস্থায়ী রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবে না।

২) কোনও জমি একটানা বারো বছরকাল ভোগদখল করলে [তিনি] স্থিতিবান রায়তে পরিণত হবে। স্থিতিবান রায়তের খাজনা নিম্নলিখিত শর্তাবলি প্রমাণ ব্যতাত বৃদ্ধি করা যাবে না:
   ক) সংশ্লিষ্ট জমির খাজনার হার তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমগুণের জমিগুলোর খাজনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম।
   খ) কৃষি দ্রব্যের মূল্য স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
   গ) নৈসর্গিক বা জমিদারের নিজ প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট জমিদার উৎপাদনী শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া 'সব ধরনের আবাওয়াব সেস চাদাও বে-আইনি ঘোষিত হয়েছে।' আসাম সরকারের এই দুরভিসন্ধি আইন নানকার ও প্রজা-কৃষক এবং কৃষক সমিতির নেতারা প্রত্যাখ্যান করেন। কৃষকনেতাদের যুক্তি ছিল এই বিধানে সিলেটের প্রজাদের কোনও শর্তই মানা হয়নি। এমনকি নানকারদের ওপর আরোপিত মধ্যযুগীয় প্রথা বিলুপ্তির কোনও কথাও বলা হয়নি।[২৩] আসাম সরকার ঘোষিত 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব' আইন প্রত্যাখ্যান করে বংশীকুন্ডা, সাফেলা, ভাটিপাড়া, গৌরারং, লাউতা, বাহাদুরপুর অঞ্চলের নানকার ও প্রজা-কৃষকরা 'জমিদার বয়কট' আন্দোলন চালিয়ে যায়। এবং তারা 'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি'র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ায়। আন্দোলনকে বেগবান করতে 'শ্রীহট্ট জিলা কমিউনিস্ট পার্টি'র উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে সুরমা উপত্যকার সমাজতন্ত্রী চিন্তকদের [সুভাষপন্থী কংগ্রেসসহ] নিয়ে সুনামগঞ্জ শহরে এক সমাবেশ হয়েছিল। সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা এড এ আহমেদ।[২৪] সুরমা উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাজতন্ত্র চিন্তক নেতাদের বৈঠকে চলমান নানকার ও কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানানো

হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নানকার প্রজা ও রায়তি কৃষকদের সমর্থনের ভিত্তিতে করুণাসিন্ধু রায়কে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাড় করানো হয় আসাম প্রদেশভুক্ত সিলেটের এমএলএ পদে। তিনি কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি এমএলএ নির্বাচিত হলে পার্লামেন্টে নানকার প্রজা ও রায়তি কৃষকদের কল্যাণে প্রজাস্বত্ব আইন পাশের লক্ষ্যে কথা বলবেন।[২৫] নির্বাচনের প্রাক্কালে করুণাসিন্ধুকে নিয়ে কৃষক প্রজারা অনেক গান রচনা করে। গানগুলো বহুকাল প্রজাদের মুখেমুখে ফিরেছে।[২৬] নির্বাচনে করুণাসিন্ধু রায় গৌরারংয়ের জমিদার নগেন্দ্র চৌধুরীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন। নানকার ও প্রজা কৃষকদের প্রচারণায় নগেন্দ্র চৌধুরীর হাতি মিছিল ও অর্থ—দুই মান হয়ে যায়। করুণাসিন্ধু রায় আসাম পার্লামেন্টে যে সকল প্রশ্ন করতেন—তার ৮০ভাগ ছিল 'কৃষক প্রজার স্বার্থ সম্পর্কিত।[২৭] পার্লামেন্টে ১৯৩৬ সালে যে 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব' আইন পাস হয়েছিল—তার অসাড়তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলা শুরু করেন। কারণ সে আইনে রায়তি কৃষক প্রজাদের স্বত্ব দেওয়াতো দূরের কথা—নানকার প্রজাকে 'প্রজা'-হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ তারা 'দাস' পর্যায়ে থাকে। এই বিষয়ে অজয় ভট্টাচার্য সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।[২৮] করুণাসিন্ধু রায় কর্তৃক আসাম পার্লামেন্টে নানকার ও প্রজা কৃষকের অধিকার উত্থাপন এবং বাহিরে নানকার আন্দোলনের ফলে সরকার চাপে পড়ে যায়। নতুন প্রেক্ষাপটে সিলেটের *জাগরণ* পত্রিকা কৃষক-প্রজাদের পক্ষ নিয়ে 'কৃষক-কাহিনী' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে সুরমা উপত্যকা কৃষক সমিতির সেই দাবিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৯]

করুণাসিন্ধু রায় প্রথম অধিবেশনে 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল' উত্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিলটি আটকে যায়। আসাম পার্লামেন্টে নিয়ম অনুসারে কোনও বিল উত্থাপনের আগে গভর্নরের অনুমতির প্রয়োজন লাগত। ফলে প্রথমেই তার বিলটি আটকা পড়ে। করুণাসিন্ধুর সংশোধিত বিল উত্থাপনের বিপক্ষে থাকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, চা-কর প্রতিনিধি, জমিদার প্রতিনিধি, শ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধিসহ প্রায় সবাই। কৃষকদের কোনও প্রতিনিধি পার্লামেন্টে থাকতো না। ফলে গভর্নর বিলটি আটকে রাখে। এই বিল উপস্থাপনের অনুমতি ও পাস করানোর লক্ষ্যে কৃষক সমিতি গ্রাম পর্যায়ে প্রচারণা, মিছিল, জমিদার বিরোধী সভা চালায়। গ্রামে গ্রামে জমিদার বিরোধী উঠান বৈঠক ও হাট সভায় দাবি ওঠে যে, করুণাসিন্ধুর 'কৃষক-বিল' পাস করতে হবে। জমিদাররা নানাকার ও পজা কৃষকদের ওপর নানা ধরনের মামলা দায়েক করে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। সাধারণ প্রজারা পুলিশের হয়রানির শিকার হয়। এ অবস্থায় কৃষক সমিতির উদ্যোগে তৃণমূলের কৃষক, নানকার, কিরাণ, রায়তি—বিশেষত বিয়ানিবাজার ও গোলাপগঞ্জ এলাকা থেকে নানকার নারী-পুরুষদের পায়ে হেঁটে যূথবন্ধ হয়ে সিলেট জেলা প্রশাসন ঘেরাও করে। নানকারদের এই মিছিলে তারা নিজেরাই নেতৃত্ব দেয়। যা ছিল সাধারণ প্রজাদের যূথবন্ধ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। জনতার চাপে পড়ে 'অন্ধ' জেলা প্রশাসক অবশেষে নানকার প্রজাদের দাবির প্রতি নমনীয়তা দেখায়। বিশেষত নানকার নারীদের মুখ থেকে জমিদার ও জমিদারের লাঠিয়াল, পাইক-পেয়াদার অত্যাচারের কাহিনি শোনে জেলা প্রশাসক প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে। তখন রণকেলীর জমিদারদের অত্যাচার ছিল ভয়াবহ। জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিক রণকেলার বিদ্রোহী নানকার ও জমিদারের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেন।[৩০] নানাকারদের মিটিং-মিছিল, পথ সভা, প্রচারপত্র বিলি, জমিদারের কাজ বর্জন, পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদিও ওপর সর্বজনের দৃষ্টি পড়ে। অবশেষে তোপের মুখে পড়ে আসাম সরকার ১৯৩৮ সালের জুলাই অধিবেশনে করুণা সিন্ধু রায়ের 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধিত বিল' উপস্থাপনের অনুমতি দেয়। ১ জুলাই ১৯৩৮ সালে *জাগরণ* পত্রিকা জানায়

যে, 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিল এতদিনে উত্থাপনের অনুমতি মিলিল।' পত্রিকাটি করুণাসিন্ধু রায়ের 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলে'র প্রশংসা করে লেখে—

> 'এই বিল আইনে পরিণত হইলে প্রজাদের নিম্নলিখিত স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে—(১) চাকরাণ বা ভান্ডারি হিসাবে চাষ করা জমিতে রায়তি স্বত্ত্ব; (২) জমি হস্তান্তর বাবদ জমিদারের প্রাপ্য সেলামী লোপ; (৩) ছয় বৎসর একাধিক্রমে চাষ করিলে জমি দখলীস্বত্ত্ব বর্তিবে; (৪) জমিদারের অগ্র অধিকার লোপ; (৫) জমির খাজনা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে ধার্য্য হইবে; (৬) ইমারৎ নির্মাণে বর্ধিত জমিদারের প্রাপ্য ফিস নিয়ন্ত্রণ এবং দখলীস্বত্ত্ব বিশিষ্ট জমি খাস করিবার সম্পর্কে জমিদারি অধিকার লোপ।'

অন্যদিকে পার্লামেন্ট সংশোধিত প্রজাস্বত্ব বিলটি পাস না করার কৌশল নিয়েছিল জমিদার প্রতিনিধি, আসাম সরকার, মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের ব্যবস্থাপকগণ। তাদের বিপরীতে রাস্তায় দাড়ায় নানকার, সাধারণ কৃষক, চাকরাণ, বেগার, প্রজা-কৃষক, কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন। শিলং পার্লামেন্টে উত্থাপিত করুণাসিন্ধর প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলটি কাটছাট না করে হুবহু পাসের জন্য 'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি' আসাম সরকারকে নানামুখি চাপ দেয়। তারা স্পিকারকেও একটি দরখাস্ত পাঠায়। অতঃপর কৃষক সমিতি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে ২১ থেকে ২৭ জুলাই [১৯৩৭] পর্যন্ত সিলেটে 'প্রজাস্বত্ব বিল সপ্তাহ' পালনের আহ্বান জানায়।[৩১] এই ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র নানকার ও প্রজা-কৃষক তৎপর হয়ে ওঠে। সিলেটের প্রতিটি গ্রাম, পাড়া, মহল্লায় নানকার ও প্রজা কৃষকদের মধ্যে ক্রমাগত বৈঠক চলে। তারাও অঙ্গীকার করে প্রজাস্বত্বের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। নানকার ও কৃষক প্রজার জাগরণ দেখে *জনশক্তি* পত্রিকা সিলেট জেলার গ্রামাঞ্চলে মুক্তির 'ঢেউ লেগেছে' বলে মন্তব্য করে। পত্রিকাটি অনেক গ্রামসভার খবর প্রকাশ করে। যেমন—

১. ২০ জুলাই জশমতপুরে গোপালচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে নানকার ও কৃষকদের সভা হয়।
২. লালপুর গ্রামে রমানাথ দাসের সভাপতিত্বে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
৩. ২১ জুলাই আনন্দ কিশোর ভট্টাচার্য ছয়হড়া গ্রামে সভা করেন। সভায় 'করুণাসিন্ধু রায় কর্তৃক আসাম আইন পরিষদে প্রেরিত শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল যাতে অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হয় সেজন্য কংগ্রেসি, অকংগ্রেসি সদস্য, বিশেষভাবে ওই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সদস্য অক্ষয়কুমার দাস, মৌং মকবুল হোসেন চৌধুরকে অনুরোধ জ্ঞাপন করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।'
৪. ২৩ জুলাই শ্যামাচরণ বাজারে একটি কৃষক সভার অধিবেশন রাসবিহারী চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।
৫. ২৫ জুলাই নয়াবাজারে বনোয়ারীলাল গোস্বামীর সভাপতিত্বে বিরাট হাট সভা চলে।
৬. ২৬ জুলাই রাধাকুনায় গুণমণি নমঃশূদ্রের সভাপতিত্বে কৃষকদের সভা হয়।
৭. ২৯ জুলাই সুনামগঞ্জ টাউন হলে রমেশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে ভাটি দৌলতপুর, ভিমখালী বাজার, বিনাজুরা, খোঁজার গাঁও, বাউরভাগ, মাইজ মঞ্জুরী, আকাশীমুড়া, ধলিয়ারপার, সুনামপুর, লঘাটিয়া, শিলকুড়া, কানিহাটি প্রভৃতি স্থানে গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩২] *জাগরণ* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ২০ শ্রাবণ ফকিরবাজারে ও ২২ শ্রাবণ মানিককোনায় নানকার প্রজা ও কৃষকদের সভা হয়।[৩৩]১৮ আগস্ট ১৯৩৮ সালে তাহিরপুর থানার শাহারপুর, খিরদরপুর, বাগুর, বসন্তপুর, অনন্তপুর, রাজিন্দ্রপুর, বালিজুরী, গোপালপুর, বেহেলী, নওয়াবারুঙ্গা, লোসনপুর, মুশোলঘাট প্রভৃতি গ্রামে কৃষক

সভার অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] সুনামগঞ্জের প্রজাসাধারণ করুণাসিন্ধু রায়ের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী পাসের লক্ষ্যে এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে, তারা আসামের কৃষিমন্ত্রী তাহিরপুর থানা পরিদর্শনে গেলে মকবুল হোসেন এমএলএ, মন্ত্রী মুনাওয়ার আলী ও কৃষিমন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ করে এবং আসামে মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগের দাবি জানায়।[৩৫] ১৯৩৮ সালে শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইনের প্রতি কৃষকরা এত অনুরাগী হয়ে ওঠে যে 'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি'র কর্মী সংখ্যা তখন ১৫ হাজারের মতো দাঁড়ায়।[৩৬]

করুণাসিন্ধু রায়ের 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী' আইন উপস্থাপনের আগেই এই খসড়ার বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণি 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'র আদলে 'সুরমা ভেলী ভূম্যাধিকারী সমিতি' গড়ে তোলে। তারা অনুগত লাঠিয়ালকে 'সুরমা ভেলী ভূম্যাধিকারী সমিতি'র মাধ্যমে আসাম সরকারের কাছে প্রজাস্বত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আবেদনও পৌঁছায় এবং প্রজাদের মধ্যে বিভক্তির চেষ্টা করে। জমিদারগণ প্রথা মতো নিজেদের লাঠিয়াল বাহিনীর পাশাপাশি সরকার থেকে পুলিশি সহায়তা পায়। তারা খাজনা না দেওয়ার কারণে প্রজাদের মালামাল ক্রুক করে, প্রজাদের উচ্ছেদ করে। এই অত্যাচার নানকারগণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। ফলে অনিবয সংঘাত লেগে থাকে ও মারামরি বাড়তে থাকে। নানকার বাড়ি আক্রমণ হলে তারা 'ভাতের থালা' বাজিয়ে অন্যদের জানান দিলে—সবাই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রুখে দাড়ায়। ১৯৩৮ সালে নানকার ও কৃষক-প্রজা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই আন্দোলনে বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকে। প্রথমত খাজনা প্রদান তারা বন্ধ রাখে। দ্বিতীয়ত কোনও আইন তারা মানতে চায়নি। সিলেটের মধ্য ও পূর্বদিকের বিশেষত লাউতা-বাহাদুরপুর, পাথারকান্দি-সানেশ্বর[৩৭]-দাসেরবাজার, রণকেলী-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর অঞ্চলে নানকার প্রজারা আইন অমান্য করে চিরকালের বাধন ছিঁড়ে ও ভাঙে। কমিউনিস্ট পার্টি সেসব জায়গায় গোপনে কয়েকজন নেতাকর্মীকে কিছুদিন স্থায়ী দায়িত্ব দেয়। যেমন পাথারকান্দিতে স্থায়ী হয়েছিলেন মৃণাল দাস, লাউতা-বাহাদুরপুরে অজয় ভট্টাচার্য, সানেশ্বর ও দাসেরবাজারে লালমোহন রায়।[৩৮] লালমোহন রায়ের নিয়ন্ত্রাধীন এলাকায় গ্রাম সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাকে সাহায্যের জন্য পার্টির নির্দেশে গিয়েছিলেন রবি দাম, বিলজ্ঞাময়ী কর, রমানাথ ভট্টাচার্য।[৩৯]জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীকে প্রতিরোধ করা ও পুলিশের হাত থেকে বাচার কৌশল হিসেবে কৃষক সমিতির প্রথম সারির নেতাদের গোপনে বন্দুক চালানো ও লাঠি খেলা শেখানো হয়েছিল পাথারিয়া পাহাড়ের গভীর জঙ্গালে। ১৯৩৮ সালে সিলেটের বিভিন্ন জমিদারিতে প্রজাদের সঙ্গে জমিদারের তিক্ততা, অসন্তোষ, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ছিল সাধারণ নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রজাদের তুমুল আন্দোলনের পরিণতিতে বড়ো ধরনের সংঘাতের কয়েকটি কারণও ছিল। প্রথমত জমিদাররা মনে করতো প্রজাস্বত্ব প্রদান করলে প্রচুর ভূমি তাদের হাতছাড়া হবে। প্রজারা 'মর্যাদা' পাবে। আবার খাজনা পাওয়া পাবে না। রায়তি প্রজারা মনে করত আন্দোলন করলে ভোগ দখলীয় জমির ওপর অধিকার বর্তাবে। কৃষক আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করলে প্রজারা ঘোষণা দিয়ে জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখে। ১০ মাঘ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে *যুগভেরী* পত্রিকায় 'কৃষক আন্দোলন' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়—'...পাকশাইল ও বর্ণি ইত্যাদি কতিপয় গ্রামের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া জমিদারের খাজনা ও ধান্য দেওয়া ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিয়াছে।' কৃষক সমিতির নেতাকর্মীদের আহ্বানে দাসেরবাজার অঞ্চলের প্রজারাও খাজনা বন্ধ রাখে। খাজনা বন্ধে কৃষকদের প্রেরণাদান ও প্রকাশ্য সভা করার অপরাধে ১৬ জুলাই ১৯৩৮ সালে তিনজন কৃষক কর্মীর বিশ টাকা জরিমানা অথবা দুই সপ্তাহের জেল হয়। কর্মীরা মুচলেকা না দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। ১২ আগস্ট ১৯৩৮ সালে *জাগরণ* লেখে—

> গত ১৬ই জুলাই দাসেরবাজারের যে তিনজন কৃষক কর্মীর ২০ বিশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুই সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড বরণ করিয়া নিয়াছিলেন। ২৯শে জুলাই তাহারা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। মুক্তিপ্রাপ্ত তিনজন কর্মী শ্রাযুক্ত লোকনাথ দাস, মথুরা নাথ ও নয়ান শুক্ল বৈদ্যকে সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক [সভার] প্রধান সচিব কমরেড শরদিন্দু দে, অর্থ সচিব সুরেশচন্দ্র দেব, করিমগঞ্জ জিলা সমিতির প্রধান সচিব কমরেড স্বদেশ রঞ্জন পাল, করিমগঞ্জের শ্রাযুক্ত দুর্গাপদ দাস ও শ্রাযুক্ত অনিলচন্দ্র দাস প্রভৃতি বহু ভদ্রলোক জেল গেটে অভ্যর্থনা করেন। বেলা ১২টা ঐ তিনজন কর্মী ট্রেনে দাসেরবাজারে রওয়ানা হন। বিদায়কালে বহুলোক তাহাদিগকে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কমরেড মাতঙ্গিনী দাস ওই কর্মী তিনজনকে মাল্যভূষিত করেন।

'অবাধ্য' প্রজাকে ধরার ক্ষমতা তখনও জমিদারের হাতে ছিল। তাই প্রজা কৃষকদের সাথে জমিদারের মাসিক ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালদের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুনামগঞ্জের ভাটিপাড়া জমিদারিতে এরূপ প্রজা-কৃষক ও জমিদারের লাঠিয়ালের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছিল। ভাটিপাড়া জমিদারি সম্পর্কে *জারগরণ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> শ্রীহট্টে যতগুলি সচ্ছল জমিদার আছে ভাটিপাড়া তাহাদের অন্যতম। ইদানাং ভাটিপাড়ার জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে। জমিদার পক্ষ ইহাকে ষড়যন্ত্রমূলক প্রজাবিদ্রোহ বলিয়া রটনা করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য নিজ ব্যয়ে ভাটিপাড়ায় একটি সশস্ত্র গুর্খা সৈন্যদল পোষণ করিতেছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।[৪০]

ভাটিপাড়া জমিদারের প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও অবিচার নিয়ে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক দলগুলো বিবৃতি দেয় এবং কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি একটি যৌথ তদন্ত দলকে ভাটিপাড়া জমিদারিতে তদন্তের জন্য পাঠায়। শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটির সদস্য বীরেশ মিশ্র ও মৌলবি খবিরউদ্দিন আহমদ সেখানে গিয়েছিলেন। তারা দীর্ঘ সময় ভাটিপাড়া অবস্থান করেন। তদন্ত কমিশনের নিকট প্রজাদের অভিযোগের সারমর্ম[৪১] ছিল—

> ১) জোর করিয়া জমি হইতে প্রজাকে বেদখল করা; ২) সাদা কাগজে টীপসহি লইয়া ইচ্ছামতো দলিল সৃষ্টি করা; ৩) বাড়িতে কোর্ট বসাইয়া; ক) বিচারের অভিনয় করা; খ) পাইক প্যাদার রোড আদায় করা; গ) কোর্ট ফির টাকা আদায় করা, জরিমানার টাকা আদায় করা, চৌকির নীচে প্রজাকে ঢুকাইয়া রাখিয়া শাস্তি প্রদান করা; ৪) খাজনার জন্য প্রজার গোরু জোর করিয়া ধরিয়া নেওয়া; ৫) চাষের জমি বিলে পরিণত করা; ৬) জোর করিয়া মুসলমান প্রজার দ্বারা তাহাদের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ানো ইত্যাদি।

কমিশনও জমিদারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পায় এবং ১৭ মাঘ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে *নয়া-দুনিয়া* পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সিলেটের মধ্যে পৃথিমপাশার [কুলাউড়া, মৌলভীবাজার] জমিদারি ছিল অনেক বড়ো। তাদের অত্যাচারের কাহিনি *যুগভেরী* পত্রিকায় প্রকাশ পায়।[৪২]

গ্রামাঞ্চলের কৃষক-প্রজাদের সংগ্রামী চেতনা সিলেট শহরে বসবাসরত প্রজাদের ওপর ছায়াপাত করে। শহরের প্রজারা ব্যবসা ও কৃষিকাজ করলেও প্রকারান্তরে তারাও ছিল অধিকার হীন প্রজা সাধারণ। সিলেট শহরের প্রজারা আবার গ্রামীণ নানকার প্রজাদের মতো চরিত্র বহন করতো না। তারা শহরে নানা পেশায় নিযুক্ত ছিল। এবং জমিদারকে উচ্চমূল্যে খাজনা দিয়ে থাকত। নানকার ও কৃষক-প্রজার আন্দোলনের প্রভাবে শহরের প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে খ্যাপে যায়। কারণ সিলেট শহরে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের ওপর ধার্যকৃত টেক্স ছিল অনেক বেশি। সিলেট শহরের প্রজাবৃন্দের

মধ্যে মো. আবদুল মানান, টুনু মিয়া, শ্রীরাজেন্দ্র রায়, শ্রীকামিনীকুমার বসাক 'শ্রীহট্ট টাউন প্রজাস্বত্ব আইন' পাসের জন্য আসাম সরকারের প্রতি আবেদন জানান।[৪৩] তাদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, 'শহরের জমিদাররা প্রজাদিগকে উৎখাতের বেড়াজালে ফেলিয়া আপাতত সুখানুভব করিতেছেন'। ১৯৩৮ সালে সিলেট শহরের জমিদাররা প্রজা উচ্ছেদের নিমিত্তে প্রায় ৩০০ উৎখাত মোকদ্দমা বা উচ্ছেদ নোটিশ পাঠিয়েছিল। তখন রকম ভেদে সিলেট শহরের ১ হাল মাটির [ভূমি] বার্ষিক খাজনা ৩৯,৬৫০ থেকে ৪২,০০০ টাকা পর্যন্ত ছিল।[৪৪] গ্রামের নানকার ও প্রজারা যে কয়টি জঙ্গি মিছিল নিয়ে কয়েকবার শহরে এসেছিল—তখন শহরের প্রজারা সহমর্মিতা ও সংহতি প্রকাশ করে। তবে সিলেট শহরের প্রজারা পকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছে—এমন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীর জন্য নানাকার ও প্রজা-কৃষকরা যখন জীবন বাজি রেখে ঘরে-বাইরে আন্দোলনে মগ্ন—তখন আসাম সরকারও প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন আটকানোর লক্ষ্যে দুরভিসন্ধির ফাদ তৈরি করে বসে। প্রথমত আসাম সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী রোহণীকুমার চৌধুরী জুলাই [১৯৩৮] অধিবেশনে নতুন করে 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী' নামে আরেকটি বিল জমা দেন।[৪৫] দ্বিতীয়ত পার্লামেন্টের জনৈক ব্যবস্থাপক মৌলবি আবদুর রহমানও 'সংশোধিত প্রজাস্বত্ব বিল' জমা দেন [১৯৩৬ সালেরটি সংশোধন]।[৪৬] তৃতীয়ত 'শ্রীহট্ট প্রজাসত্ব সংশোধনী বিলে'র সঙ্গে 'গোয়ালপাড়া প্রজাসত্ব বিল' নামে আরেকটি বিল পেশ করা হয়। অর্থাৎ জমিদার ও সরকারের ইঙ্গিতে দুরভিসন্ধিমূলক কয়েকটি বিল জমা দেওয়া হয়—যাতে করুণাসিন্ধু রায়ের বিলটি আটকা পড়ে। আসামে তখন স্যার সৈয়দ মুহম্মদ সাদুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতায়। মুসলিগ লীগ সরকারের কৌশল মোকাবিলার জন্য কংগ্রেস দলের ডেপুটি লিডার অরুণকুমার চন্দ [শিলচর] বিলগুলো আলোচনার জন্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্পিকার জানান যে, বিলগুলো হাতের কাছে নেই। পুনরায় কংগ্রেস দলের লিডার বলেন যে, 'রাজস্ব মন্ত্রী যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে অন্য দুইটি বিলের বিধানগুলো সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচিত হইবে, তাহা হইলে তাহারা কোনও আপত্তি করিবেন না।' অধিবেশনের তর্কযুদ্ধে কংগ্রেস নেতা হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর যুক্তি দেখান। অবশেষে স্পিকার সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন।[৪৭] কিন্তু বাস্তবে সিলেক্ট কমিটির কোনও বৈঠক করা সম্ভব হয়নি।

প্রজাসত্ব আইন ঠেকানো এবং নানাকার-কৃষকদের আন্দোলন মোকাবিলার কৌশল করতে ৭ আগস্ট ১৯৩৮ সালে 'সুরমা ভেলী ভূম্যাধিকারী সমিতি' সিলেট শহরের শারদা হলে ভূসামী ও জমিদার সমাবেশের ডাক দেয়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন জমিদার রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তবে সভায় বলা হয়, 'প্রজা ও ভূম্যাধিকারীগণের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব থাকে তাহার চেষ্টা' করার উদ্দেশ্যে সভা হয়েছিল। জমিদার সম্মেলনে শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধ রায়ের শ্রীহট্ট প্রজাসত্ব আইনের সংশোধনী বিলটি পাসের ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে জমিদারদের সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল করুণাসিন্ধুর রায়ের বিল আটকে দেওয়া। নানকার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য কানিহাটির [মনু, কুলাউড়া] প্রভাবশালী জমিদার তার নিজস কিছু নানকার প্রজা দ্বারা বিবৃতি দেয় যে, তারা 'করুণাবাবুর বিল অপকার জনক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপনা সভার সদস্যদিগকে ইহার বিরোধিতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।'[৪৮]

'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা' শিলং পার্লামেন্টের জুলাই অধিবেশনে সংশোধিত প্রজাস্বত্ব বিলটি পাস করানোর লক্ষ্যে গোটা সিলেট জেলার রায়ত, নানকার, প্রজা-কৃষক নিয়ে সর্ব ভারতীয় 'কিষান দিবসে'র আদলে ১ সেপ্টেম্বর 'সিলেট কৃষান দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। 'সিলেট ঘেরাও'

সংবাদ শুনে গ্রামপর্যায়ে নানকার ও প্রজা-কৃষকদের সংগ্রামী চেতনা আরেও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ১ সেপ্টেম্বর পাঁচ হাজার কৃষকের পদভারে সিলেট শহর গর্জে ওঠে। কৃষকদের প্রতিবাদী সভা হয়েছিল গোবিন্দচরণ পার্কে। কৃষকদের এমন সংগঠিত সমাবেশ কখনও সিলেটে হয়নি। প্রজাদের মুখে একটাই দাবি ওঠে 'শ্রীহট্ট প্রজাসত্ব সংশোধনী বিল সম্পূর্ণ' মেনে নাও। এই সমাবেশে ৫ সেপ্টেম্বর শিলং পার্লামেন্ট ঘেরাও করার কর্মসূচি ঘোষিত হয়।[৪৯]কৃষকদের শিলং অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি চলে। ঠিক হয় তরুণ কৃষকরা দুটি রাস্তা ধরে মটর গাড়ি করে শিলং যাবেন। একটি সিলেট থেকে ডাউকি হয়ে, অন্যটি বিকল্প হিসেবে সিলেট-ভোলাগঞ্জ দুর্গম পথ ধরে। আসামের মুসলিম লীগ সরকার কৃষকদের শিলং অভিযান বন্ধ করতে গোপনে পদক্ষেপ নেয়। তখন শিলং রাস্তা ধরে মোটরবাস চলাচল কিছুটা শুরু হয়েছে মাত্র। অবশেষে অদৃশ্য কারণে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে সিলেট-শিলং রাস্তার সকল ধরনের যানবাহন বন্ধ থাকে। অথচ সিলেট থেকে শিলং প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। দুর্গম পাহাড়ি পথ। অথচ কৃষকদের যেতেই হবে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে কৃষক নেতারা সাহসী কিছু প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে পদব্রজে শ্বাপদসংকুল শিলংয়ের গিরিপথ ধরেন। তারা দুদিন ক্লান্তিহীন পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে এক রাত খাসিয়ার আশ্রয়ে বিনিদ্র রজনি কাটিয়ে দেন। হাটতে গিয়ে অনেকের পা কেটে যায় ও কারও পা ফুলে যায়। তারপরও অনেক কষ্টে তারা শিলং পৌঁছান।[৫০] প্রজা-কৃষকরা শিলং পার্লামেন্টের কাছে গিয়ে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল পাসের দাবি জানায়। শিলং শহরে গ্রামীণ কৃষকদের 'লাল ঝাণ্ডার মিছিল' দেখে শিলংয়ের 'ভদ্র' চাকরিজীবীদের জনপদে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।[৫১] এই সমাবেশ থেকে প্রজা-কৃষকরা আসাম মুসলিম লীগ সরকারের পতন ও মন্ত্রীদের পদত্যাগের দাবি জানায়।[৫২] সিলেটের প্রজা কৃষকদের 'শিলং অভিযান' গ্রামপর্যায়ে নতুন করে আলোড়ন তোলে মূল আন্দোলনকে গণমুখী ও সম্প্রসারিত করেছিল। এই সময়ে সিলেটে কৃষক প্রজা আন্দোলন আরো ঘণীভূত হওয়ার উপাদান জোগান দিয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কারণে শিলং সফরসূচি। তাকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং তার সাথে লালমোহন রায়সহ কৃষক নেতারা বৈঠক করেন। নীতিগতভাবে সুভাষ বসু নানকার ও কৃষক-প্রজা আন্দোলন সমর্থন করেন। ফলে রাজনৈতিক কর্মীদের মনে আশার সঞ্চার জাগে। স্থানীয় আন্দোলন আরও তীব্রতর করতে লালমোহন রায় সানেশ্বর [শালেশ্বর]-দাসেরবাজার এলাকায় তৎপরতা চালিয়ে ৫২ মৌজার প্রজাকৃষকদের সংগঠিত করেন।[৫৩]৫২ মৌজার কৃষক-প্রজার সভায় আশি জন কৃষক-প্রজাকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছিল।[৫৪] একই সময় আন্দোলনরত কৃষক-প্রজাদের সুসংগঠিত ও কৃষক বিদ্রোহে শক্তি জোগাতে 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'র দ্বিতীয় সম্মিলন হয়েছিল দাসগ্রামের বড়গুল ময়দানে [তৎকালীন করিমগঞ্জ এলাকা]। সভায় বিখ্যাত কমরেড মোজাফফর আহমদ [১৮৮৯-১৯৭৩] সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় কৃষকদের দখলীয় জমিস্বত্বে অধিকার প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে ৫২ মৌজার কৃষকদের আন্তঃসভায় তারা পাঁচটি দাবি তোলে।[৫৫] এসময়ে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে লাউতা-বাহাদুরপুর-সানেশ্বর-দাসেরবাজার অর্থাৎ বিয়ানিবাজার-গোলাপগঞ্জ-বড়লেখা থানা কৃষক-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৫৬] সিলেটে সামান্য মিরাশদারেরও কয়েক শত বিঘা জায়গা ছিল। সামাজিক আভিজাত্য রক্ষার্থে তারাও নানকার প্রজা রাখতেন; অনেকের বেগার বা 'ভারুয়া' [যারা কাধে করে ভার বহন করতো] থাকতো। সে দিন জমিদার করুণাসিন্ধু রায়, জমিদারপুত্র দীনেশ চৌধুরী [ধরমপাশা], জমিদার তনয় অজয় ভট্টাচার্য, জমিদার তনয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ তাদের শ্রেণিকে অস্বীকার করে যখন নানকার ও রায়তি কৃষদের সাথে একাসনে ও একপাতে খাওয়া শুরু করেন—তখন প্রান্তিজন তাদের হৃদয়ের মধ্যে ঠাঁই দেয়। প্রখ্যাত গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৫৭] তিনি কমিউনিস্ট

পার্টির নিয়ন্ত্রিত সুরমাভ্যালী সংস্কৃতি স্কোয়াডে ছিলেন। তখন গ্রামের হাট-বাজার ও জনপদে গিয়ে তারা গানে-গানে কৃষক সংগ্রামে প্রেরণা জোগান। গণ-শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান কৃষকদের মুখেমুখে ফিরতো।

এদিকে ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে আসাম পার্লামেন্টে মুসলিম লীগের স্যার সাদুল্লাহ সরকারের পতন ঘটলে গোপীনাথ বড়দৈলের (১৮৯০-১৯৫০) নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠন করে এবং করুণাসিন্ধু রায়কে নানা আশ্বাস দিয়ে বিলটি প্রত্যাহার করিয়ে নেয়। মূলত কংগ্রেস দলের অনেক সদস্য চায়নি যে দখলীয় ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত কায়েম হোক। কারণ আসামের প্রাদেশিক পরিষদে কংগ্রেস সমর্থক জমিদার এমএলএর সংখ্যা কম ছিল না। তারা এই সুযোগে জমিদারের স্বার্থ বজায় রেখে নতুন প্রজাসত্ব আইন বিল জমা দেয়। এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা ও সাধারণ প্রজা-কৃষকরা মেনে নিতে পারেনি। ফলে নানকার এবং কৃষক প্রজা আন্দোলন দ্রোহী অবস্থায় পৌঁছে বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। তখন কংগ্রেস দলের রাজস্বমন্ত্রী ফখরউদ্দিন আলী আহমদ [(১৯০৫-১৯৭৭); পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি] সংক্ষুব্ধ সুনামগঞ্জ অঞ্চল সফর করে স্থানীয় কৃষক সমিতি নেতা, নানকার প্রজা ও রায়তি কৃষকদের কথা শুনে জমিদারের সঙ্গে আপসরফার চেষ্টা করেন। তারই উদ্যোগে ভূম্যধিকারীগণের সংগঠনের প্রতিনিধি, নানকার ও কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের এক ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার আয়োজন করা হয় সিলেটের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র শারদা হলে। আলোচ্য সভার প্রথমেই বিপত্তি বাধে যে, জমিদার 'প্রভু'রা তাদের 'গোলাম' নানাকার ও প্রজা কৃষকদের সাথে একাসনে [চেয়ারে] বসতে চায়নি। বিষয়টি বেমানান দেখে জননেতা ও মন্ত্রী ফখরউদ্দিন আলী আহমদের মধ্যস্থতায় নানকার, প্রজা ও জমিদার একই সমান্তরালে সবাই চেয়ারে বসেন। সরকারি আইনি প্রক্রিয়ায় প্রজাস্বত্ব প্রদান ও নানাকার প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নে প্রত্যেক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যার যার অবস্থানে অনঢ় থাকায় এই বৈঠক নিষ্ফল হলেও প্রকারান্তরে নানকারদেরই জয় হয়। কেননা প্রথমত নানকাররা কথিত 'মুনিবের' সামনে চেয়ারে বসার সামাজিক অধিকার আদায় করতে পেরেছিল। চিরকাল থেকে অধিকারহারা লোকগুলো 'প্রভু'র সামনে মাটিতে বসার অধিকার পেয়ে আসছে। আসামে কংগ্রেস সরকারের নানা প্রচেষ্টার পরেও জমিদার ও নানাকার প্রজা-কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক দিনদিন অবনতির দিকে যেতে থাকে। নানকার ও রায়তি প্রজাদের স্বত্ব-অধিকার পাওয়ার আশায় পুরোটা বছর [১৯৩৮] চলে যায় অগ্নিঝরা সংগ্রামে ও সংঘাতে। ১৯৩৯ সালের শুরুতে সুনামগঞ্জের ভাটিপাড়ার জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদ্রোহ যেমন বাড়ে; তদ্রুপ বৃহত্তর পঞ্চখন্ড [বিয়ানিবাজার অঞ্চল] ও পাথারিয়া [বড়লেখা অঞ্চল] এলাকার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জের রণকেলী, রায়গড়, বাঘা, ভাদেশ্বর, মানিককোনা ইত্যাদি গ্রামের নানকার ও রায়তি প্রজা, কিরাণদের মধ্যে কাজ করেন কমরেড বীরেশ মিশ্র। তিনি নানকার-কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কারিগর। তার সাথে ছিলেন সুরথপাল চৌধুরী, তকবীর আলী, মো. বেদার বক্ত, জিতেন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই অঞ্চলের ছোটো জমিদার ও মিরাশদাদের কাছে নানকার এবং রায়তিরা ছিল অন্যান্য জায়গার মতো অবহেলিত ও সামাজিক বিচারে মূল্যহীন। বলা প্রাসঙ্গিক যে, সেকালে সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের মতো গোলাপগঞ্জ এলাকার গৃহস্থ পরিবার থেকে কিরাণ, নানকার, বেগার, ভারুয়া, ভান্ডারি প্রভৃতি সমাজে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ চলত না, অনেকে তাদের ঘরে উঠতে দিত না—অর্থাৎ তলানির লোকজন বৃহৎ সমাজে অচ্যুত ছিল। এই চির অবহেলিত লোকজনকে 'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি'র মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। 'প্রজা'রা আশা করেছিল যে অচিরে 'গোলামির' দিন শেষ হবে এবং দখলীয় ভূমি তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে। এই ভরসায় তারা আন্দোলনে যায়।

স্থানীয় পাঁচশত প্রজা-কৃষকদের উপস্থিতিতে গোলাপগঞ্জ থানার বাঘা গ্রামে ৮ জানুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে সিলেট কৃষক সমিতির ষষ্ঠ কনফারেন্স হয়েছিল মো. আজিজুর রহমান মোক্তারের সভাপতিত্বে।[৫৭] এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে লোকাল মুসলিম লীগ কর্মী ও মিরাশদারের সঙ্গে আয়োজকদের বাগ্‌বিতন্ডা হয়েছিল। নানকার ও রায়তদের পক্ষে বাজারে ঢোল বাজিয়ে প্রচারের সময় বাজার কমিটি বাধা দিলেও সম্মেলনে নানকার ও প্রজা-কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ঠেকানো যায়নি। এই সম্মেলনের ২ নম্বর প্রস্তাবের ক, খ এবং তিন নম্বর প্রস্তাবে উপরোক্ত কাজের জন্য নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ফলে এই থানায় কৃষকদের একটা শক্তিশালী অবস্থান গড়ে ওঠে। সম্মেলনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে স্থানীয় কৃষক সমিতির কমিটি গঠিত হয়—সভাপতি মো. মোজাম্মিল আলী (গোলাপনগর), সহসভাপতি প্যারীচরণ দে (বাঘা), সহসভাপতি মশ্রব আলী (বাঘা), সেক্রেটারি মছলেহ উদ্দিন আহমেদ (বাঘা), সহ-সেক্রেটারি শাহ তজম্মুল আলী (দৌলতপুর), শ্রীশ্রীচরণ দাস (বাঘা), কোষাধ্যক্ষ মো. মসাহিদ আলী (বাঘা)। এই সম্মেলনে 'অপরিবর্তিত আকারে করুণাসিন্ধু রায়ের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল গ্রহণ' পাস করানো অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

গোলাপগঞ্জ থানার রণকেলী গ্রামের প্রজারা মিরাশদারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আন্দোলন, সংগ্রাম ও মামলা চালিয়েছিল। তারা মিরাশদারের হাক-ডাকে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ রাখে। উভয়ের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। ১০ অক্টোবর ১৯৩৯ *জাগরণ* পত্রিকার সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'রণকেলী প্রজা'। খবরে বলা হয়—

> গোলাপগঞ্জ থানার রণকেলী একটা মিরাশদার প্রধান স্থান। অধিবাসীদের অন্যূন শতকরা চল্লিশ ভাগ মিরাশদার শ্রেণীর লোক। অবশিষ্ট সকলেই প্রজা। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ইহারা বাস করিতেছে। মিরাশদারদের মধ্যে যে জমির স্বত্ত্ব লইয়া বিরোধ আছে, এরূপ জমি ছাড়া ইহাদের কোন জোত জমিরই কবুলিয়ৎ পাট্টা নাই। কোন ফারগও নাই। মিরাশদারের খোশ মিজাজের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদিগকে চিরকাল চলিতে হইয়াছে। সর্বদাই তাহারা মিরাশদারদের হুকুম মত নিজ নিজ ভাতের জমি বাড়ী পরিত্যাগ ও পরিবর্তন করিয়াছে। মিরাশদারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পরিবার—পরিজনসহ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে 'গোলামির শৃঙ্খল' ভাঙতে নানকারদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন আসাম আইন পরিষদের সদস্য আবদুল হামিদ চৌধুরী ওরফে সোনা মিয়া।[৫৮] আবার রণকেলী ভাদেশ্বর এলাকায় জমিদার আবদুল মতিন চৌধুরী এমএলএ [মুসলিম লীগের প্রার্থী ও মন্ত্রী হয়েছিলেন] ছিলেন জমিদারের পক্ষের সমর্থক। নানকারদের দমনপীড়নে তিনি পুলিশি শক্তি ব্যবহার করেন। তবু নানকারদের চাপা আগুন বন্ধ করা যায়নি। স্থানীয় নানকারগণ জমিদারের গৃহকাজ, বেগারি, সোহারি-পালকি টানা বন্ধ করে দিলে তাদের সাথে জমিদার আপস করতে হয়। তার পাশপাশের জমিদারদের মধ্যে নৃপেন্দ্র শর্মা [জলঢুপ], সফিকুল ইসলাম [লাউতা-বাহাদুরপুর], আপ্তাব মিয়া [ছ'পনি], নজমুল ইসলাম [দশপনি], ছয়ার মিয়া [দশপনি], ফারই মিয়া [সানেশ্বর] প্রমুখ জমিদারি ও পুরাতন নানকার প্রথা রক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন। এ ধরনের পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থা সুনামগঞ্জেও দেখা যায়। বছরের শুরুতে বোরোধান চাষের সময় সুনামগঞ্জের ভাটিপাড়ার জমিদার কর্তৃক পানি আটকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে প্রজা-কৃষকরা খ্যাপে যায়। ২১ এপ্রিল ১৯৩৯ সালে *জাগরণ* পত্রিকা 'ভাটিপাড়ার প্রজা' সম্পাদকীয়তে বলে যে—'জমিদার বোরো জমিতে ফৌজদারী মামলা করে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছিলেন। ফলে প্রজারা ধান কাটিতে পারছে না।' জমিদারের এই অমানবিক আচরণের কথা শোনে পাকা ধান কাটাতে করুণাসিন্ধু রায় [এমএলএ] কৃষকদের নিয়ে ভাটপাড়া গিয়ে ১৪৪ ধারা

ভঙ্গা করে ধান কেটেছিলেন। ফলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ('ভাটিপাড়া কৃষক গোলযোগ', ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৯ জাগরণ)।

নানকার ও প্রজা কৃষকদের আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। নানকার সমাজে দীর্ঘসময় কাজ করেন কমিউনিস্ট পার্টির নারী ইউনিটের সদস্যগণ। তারা উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ বিত্ত পরিবারের হলেও গরিব কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে দ্বিধা করেননি। এতকাল নানকার মহিলাদের মধ্যে গোপনে কাজ চললেও ১৯৩৯ সালের ২৩ জুলাই লাতুর দাসগ্রামে [বর্তমান দাসেরবাজার] নানকার ও কৃষানিদের সমাবেশ হয়েছিল। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী স্নেহলতা দেব[৫৯] [তিনি আবার কংগ্রেসের মহিলা সংঘের নেত্রী ছিলেন]। এসময় নানকার পরিবার থেকে কালই বিবি নামে একজন বীরঙ্গণা নারীর উদ্ভব ঘটে। তিনি লাউতা-বাহাদুরপুরের জুলুম সহ্য করা নানকার প্রজা ছিলেন। আন্দোলনের সময় তার পদভারে কেঁপে ওঠে সমগ্র এলাকা। তিনি জমিদারের যন্ত্রণায় বিদ্রোহী হয়ে লাঠি হাতে নিয়েছিলেন। নারী নেত্রী হেনা দাস কালই বিবির সঙ্গে কাজ করেছেন ও রণাঙ্গণে তাকে দেখেছেন। তিনি তার অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনি ও ঘটনা লেখেন—

> [...] কালই বিবি পুলিশের হাত থেকে একটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে দারোগার মাথায় আঘাত করে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশবাহিনী কোন রকমে মহিলাদের হাত থেকে দারোগাকে উদ্ধার করে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। দারোগাকে আক্রমণ করার অভিযোগে পরে কালই বিবিকে গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিশের হেফাজতে তাকে অকথ্য অত্যাচার ও জুলুম সইতে হয়।[৬০]

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত নানকার ও রায়তি প্রজা-কৃষকদের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমে তারা বিচ্ছিন্ন ছিল। পরে সংগঠিত হয়ে দ্রোহী চেতনায় জ্বলে ওঠে। অতঃপর ১৯৩৯ সালে এসে দীর্ঘদিনের সংগ্রামে 'খাজনা বন্ধ' করার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের চরিত্র বহন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় রাজনৈতিক প্রবাহ, সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ, দ্রব্য মূল্যের সংকট মোকাবিলা এবং কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলে কিছু পরিবর্তন হলেও কৃষক সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আসাম সরকার উদ্‌বিগ্ন হয়ে অবশেষে ৩০ মে ১৯৩৯ সালে 'জমিদার ও প্রজার উদ্দেশ্যে' সরকারি ইস্তেহার জারি করে। বলা হয়—

> বিভিন্ন এলাকা হইতে গবর্নমেন্ট সংবাদ পাইতেছেন, বাকী খাজনা সাকুল্য মকুব এবং খাজনার নিরিখ কমান হইবে, কোন কোন লোক এইরূপ প্রচার করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় মহালের প্রজাদেরে বিপথী করিয়া ফিরিতেছে। এরূপ অভিযোগ করা হইতেছে যে প্রচারের ফলে কোন কোন প্রজা খাজনা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জমিদার প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহাও ছিন্ন হইতেছে।[৬১]

১৯৩৯ সালের ৪ মার্চ সুরমা উপত্যকার কৃষক সমিতির সম্মিলন হয়েছিল মৌলভীবাজার শহরের সন্নিকটে। চার হাজার কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে প্রজাদের স্বত্ব ও অধিকার চায়।[৬২] ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের সময় আসামে মুসলিম লীগ সরকার আন্দোলন স্তিমিত করতে কৌশল হিসেবে করুণাসিন্ধুর বিলটি ব্যবস্থাপনা সভায় আবার গ্রহণের কথা প্রচার করে।[৬৩] ঝিমিয়ে পড়া কৃষক আন্দোলন চাঙা করতে ১৯৪৩ সালের ৭ মার্চ সুরমা উপত্যকা কৃষক সভার সম্মেলন বসে সুনামগঞ্জের লাউড় এলাকার কলায়া গ্রামে। বঙ্গীয় কৃষক সভার সভাপতি কমরেড মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল [১৯০৩-১৯৯১] সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে সুরমা উপত্যকা কৃষক সমিতির সভাপতি হিসেবে করুণাসিন্ধু রায় এমএলএ এবং সেক্রেটারি হিসেবে প্রবোধানন্দ করকে দায়িত্ব দেওয়া

হয়।[৬৪] এসময় 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের কারণে কৃষক আন্দোলন সামান্য স্থিমিত হয়। এই সুযোগে কিছু জমিদার প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে বকেয়া খাজনার অজুহাতে প্রজাদের উচ্ছেদ করতে গেলে সশস্ত্র [দেশীয় অস্ত্রে] প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে। এবার নানাকার ও কৃষক আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সিলেটের আশপাশের জমিদারদের অধীনে থাকা মুসলিম নানকার প্রজাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। বিশেষত জোয়াদ আলী, আকবর আলী, নজীব আলী, আবদুস সুবহান পটল, নৈমুল্লা [জাহাজে কাজ করতেন], তকন মোল্লা [তফজ্জল আলী], জোয়াদ উল্লাহ, ইসমাইল আলী, কালই বিবি প্রমুখ নতুন মুখের অংশগ্রহণের আন্দোলন গতি পায়। তারা সমকালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেও কথা বলেন। ১৯৪৬ সালে কন্ট্রোলে কাপড় দেওয়ার সময় জমিদারের কারসাজি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে নৈমুল্লা প্রতিবাদ করেন। ঘটনা ছোট হলেও আলোড়ন তোলে। এই অঞ্চলের অনেক লাঠিয়াল জমিদারের কথায় প্রজাদের ওপর 'মার-দাঙ্গা'য় যেতে অস্বীকার করেছিল। ১৯৪৬ সালে বাহাদুরপুরের কৃষকরা 'জমিদারি উচ্ছেদে'র দাবিতে মিছিল করে ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনে দৃষ্টান্ত রাখে। তখন সিলেটে মুসলিম লীগের পালে দ্রুত হাওয়া লাগতে থাকে। মুসলিম লীগপন্থি জমিদারগণ নানকার মুসলিম প্রজাদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক কথা ও রাজনীতির কৌশল ছড়ানোর চেষ্টা চালায়। তারা প্রচার করে যে 'মুসলমান রাষ্ট্র' হলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণ নানকার মুসলমান প্রজারা কৃষক সমিতির আদর্শের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব খোঁজে। করুণাসিন্ধু রায় ছিলেন তাদের চোখের মণি। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে লাউতা-বাহাদুরপুর-সানেশ্বর [সালেশ্বর] এলাকার প্রজা কৃষকদের গোপন বৈঠকে কর্ম-কৌশল নির্ধারিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নানকার নেতা তৈয়ব আলী। উদ্দেশ্য ছিল নানকার ও প্রজা-কৃষকদের সংগ্রামী চেতনা ধরে রাখা। যে সমস্ত প্রজা জমিদারের কাজ বর্জন করেছিল তারা যাতে জমিদারের কাজে ফিরে না যায়, সে দিকে খেয়াল রাখা হয়। তারা সমকালের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিকূলতা এবং 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' সৃষ্টির উন্মাদনার মধ্যে নানাকার ও রায়তিরা প্রজাস্বত্ব নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে থাকে। এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও বাহাদুরপুরে কৃষক সমিতির একটি অফিস খোলা হয়। সেখানেই কৃষকদের আড্ডা চলত। অন্যান্য জায়গার নানকার প্রজারা এই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তখনও জমিদারের 'তেজ' ফুরিয়ে যায়নি। তাদের পালিত শখের ঘোড়া প্রজা-কৃষককের ধান খাওয়ার অধিকার রাখতো। কিন্তু ঘোড়াকে 'প্রহার' করার কোনও প্রজার অধিকার বা সাহস ছিল না। রাতের বেলা ধান খাওয়ার জের ধরে 'গরম জমিদার' ছোয়াব মিয়ার ঘোড়াটি কে-বা কারা মেরে ফেলে। সব দায় গিয়ে পড়ে আন্দোলনকারী প্রজাদের ওপর। অবমানিত জমিদার তারই প্রতিশোধ নেয় নানা কায়দায়। ১৯৪৭ সালের ১৬ জানুয়ারি বাহাদুরপুরের প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে মিছিল করে। তারা জমিদারের হদ-বেগার বন্ধ করতে স্লোগান দেয়। বাহাদুরপুরের জমিদার কয়েকজন প্রজার ওপর মামলা করলে তারা বিপাকে পড়ে জমিদারের জায়গা ত্যাগ করে স্থানান্তরিত হয়েছিল। নানকার কৃষকরাও একাট্টা হয়ে বেগারি, হালচাষ, খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখে।[৬৫]

১৯৪৭ সালের শুরুতে সিলেট-আসামের রাজনীতি দ্রুত বদলাতে থাকে। এই অঞ্চলে প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসকে ছাপিয়ে তাড়াতাড়ি মুসলিম লীগের উত্থান ঘটে। চোখের সামনে পাকিস্তানের হাতছানি। সিলেটের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ধুলায় লুটে তৃণমূলে নতুন আঙ্গিকে 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' পৃথকীকরণের প্রভাব নানকারদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। সিলেট কৃষক সমিতির নেতারা দেশভাগের প্রাক্কালে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া সংগ্রামী নানকার ও কৃষক-প্রজাদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন ও অঞ্চলভিত্তিক সমন্বয় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবশেষে

ঢাকাদক্ষিণের কৃষক নেতা বীরেশ মিশ্রের নীরব তৎপরতায় ১৯৪৭ সালের মে মাসে সুনামগঞ্জ জেলার সদর ও জামালগঞ্জ প্রভৃতি থানা; সিলেটের কোতোয়ালি, গোলাপগঞ্জ থানা, বিয়ানিবাজার থানা এবং মৌলভীবাজারের বড়লেখা থানার নেতৃস্থানীয় নানকার কর্মীদের গোপন সম্মেলন হয় ঢাকাদক্ষিণ রায়গড় গ্রামে। সম্মেলনে নানকারদের ভূমি অধিকারের চলমান আন্দোলন অব্যাহত রাখা এবং ঢাকাদক্ষিণ এলাকার সংগ্রামী কৌশল অন্যান্য এলাকায় অনুসরণ করতে বলা হয়।

১৯৪৭ সালের জুনে ভারত বিভক্তির [৩ জুন] ঘোষণার পরপর-ই কথা আসে যে, সিলেট আসাম তথা ভারত, না পাকিস্তানে যাবে—এমন প্রশ্নের সমাধান হয় 'গণভোটে'র মাধ্যমে [৬ ও ৭ জুলাই ভোট হয়]। গণভোটের সময় নানকার আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়ে। ধর্মভিত্তিক চিহ্নায়নে হিন্দু ও মুসলিম নানকার ও কৃষক-প্রজারা ভোট দেয় [টেক্স ভিত্তিক]। এই 'গণভোটে হিন্দু-মুসলমান কৃষক ঐক্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে সাময়িকভাবে হলেও নানকার আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।'[৬৬] ব্রিটিশ চলে যাওয়ার ঘোষণার পর থেকে আইনের শিথিলতার কারণে হোক বা বিদ্রোহ থেকে হোক সংগ্রামী নানকার ও রায়তি প্রজারা জমিদারের বকেয়া এবং চলমান খাজনা পরিশোধ না করে দিব্যি জমি ভোগ করতে থাকে। 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান' ঘোষণার সময় হাজার-হাজার নানকার প্রজা, রায়তি কৃষক এবং কিছু হিন্দু জমিদার মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। কিন্তু আন্দোলনের মূল নেতাদের কেউ-ই প্রথম দিকে দেশ ছাড়েননি। নব গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার সাময়িক চাপা পড়া নানকার আন্দোলনের আগুন যাতে ফুস্কি দিয়ে বের না হয়—সে উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের ওপর দমন-পীড়ন এবং গ্রেফতার শুরু করে। কৃষক অন্দোলনের 'গরম অঞ্চলে' স্থাপিত সেই আসাম রাইফেলসের পরিবর্তে পাকিস্তান পুলিশ এসে 'গারদ' বসায়। কৃষক আন্দোলনের নেতা করুণাসিন্ধু রায়, লালা শরদিন্দু দে প্রমুখ আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু অধিক নিরাপত্তার জন্য ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাউতা-বাহাদুরপুর এলাকার কৃষক সমিতির অফিস থেকে নানকার নেতা অজয় ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হলে নানকার প্রজাদের ভেতরের চাপা আগুন আবার বিস্ফোরিত হয়। দেশভাগে নানকার প্রজারা সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম 'ধর্মভিত্তিক' চেতনায় দেখা গেলেও নতুন রাষ্ট্রে নানকার ও রায়তি প্রজারা দেখেছে তাদের মৌল অধিকার উপেক্ষিত থেকেছে। অর্থাৎ তারা আগের মতো-ই জমিদারের 'প্রজা' ও 'গোলাম' হয়ে রয়েছে। অজয় ভট্টাচার্য গ্রেফতারের পর হিন্দু-ম্সলিম প্রজারা দ্রুত এক হয়ে যায়। তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্ট লাউতা-বাহাদুরপুর, ঢাকাদক্ষিণ, রণকেলী, দাসেরবাজার প্রভৃতি এলাকার নানকার ও প্রজা-কৃষকরা বিক্ষোভ মিছিল করে। এই মিছিলে ছিল লাল পতাকার বাহার—যা পাকিস্তান সরকার পছন্দ করেনি। জনপ্রিয় এই কৃষক নেতা গ্রেফতারের প্রতিবাদে কেউ-বা হাল বন্ধ রাখে; কেউ-বা আগের মতো জমিদারকে এড়িয়ে চলে। কৃষক সমিতির প্রথম সারির আন্ডারগ্রাউন্ড নেতারা নানকার ও প্রজা-কৃষককর্মীদের দিয়ে সিলেট শহরে প্রজা-মিছিলের আয়োজন করে। সিলেট শহর প্রদক্ষিণের পর তারা স্থানীয় গোবিন্দচরণ পার্কে জনসভার মাধ্যমে প্রশাসনকে জানান দেয়। তারা সেই আগের প্রজাস্বত্ব ও নানকার প্রথা বিলোপের দাবি ওঠায়। কিন্তু পাকিস্তানের শুরুতে হিন্দু জমিদার প্রধান সুনামগঞ্জ অঞ্চলের আন্দোলন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। কিছু জমিদার ভারতে চলে যায়; আবার কিছু পরিবার আগের 'প্রতাপ' [প্রভাব] হারায়; কেউ-বা নানকার প্রথাকে বাদ দেয়। তখন আন্দোলনের কেন্দ্র পুনরায় হয়ে ওঠে বিয়ানিবাজার ও গোলাপগঞ্জ অঞ্চল। ইতোমধ্যে পাকিস্তান পুলিশ কৃষক নেতা নৈমুল্লাকে [নইম উল্লাহ] গ্রেফতার করে। কালই বিবিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়।

পাকিস্তানের শুরুতে নানকার আন্দোলন কমাতে পূর্ব-বাংলার মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন নেতারা সিলেটের রেফারেন্ডামকালীন নেতাদের মাধ্যমে কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে আলোচনা অনেকটা ব্যর্থ হয়। মুসলিম লীগ সমর্থক [রেফারেন্ডাম কর্মী] প্রগতিশীল ছাত্র নেতা—নূরুর রহমান, তছদ্দুক আহমদ, পীর হবিবুর রহমান প্রমুখ নানকারদের পক্ষে থাকেন। এই তিন তরুণ নেতা পরে মুসলিম লীগ ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝোঁকেন—যা সমকালীন আন্দোলনে গতি দেয়। মুসলিম লীগের একটি অংশের সমর্থন কৃষক সমিতির পক্ষে থাকায় প্রজা আন্দোলন কমেনি। অজয় ভট্টাচার্য গ্রেফতারের পর লাউতা-বাহাদুরপুরের নানকারদের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকেন বীরেশ মিশ্র ও সুরত পালচৌধুরী। 'পাকিস্তান রক্ষা'র নামে লাউতা-বাহাদুরপুর এলাকার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী ও গারদের পুলিশ মিলে নানকারদের ওপর অত্যাচার বাড়ায়। তারা আন্দোলনকারীদের নামে হুলিয়া, গ্রেফতারি কিংবা উচ্ছেদ মামলার অজুহাতে নানকারদের বাড়িতে 'খানা-তল্লাশি'র নামে নারীদের ওপর অত্যাচার চালাতো। পুরুষরা গ্রেফতার এড়াতে দুর্গম হাওরড়গাঁয়ে রাত কাটাতো। কৃষক নেতা লালমোহন রায় গোপনে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সানেশ্বর ও উলুর গ্রামে অবস্থান করে চারদিকে যোগাযোগ রক্ষা করেন।[৬৭] যে কারণে প্রতিকূল অবস্থায়ও নানকার আন্দোলনে গতি হারায়নি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার উত্তপ্ত সিলেট অঞ্চলে নানকারদের আন্দোলন থামানোর কৌশল হিসেবে ১৯৪৭ সালে ১ ডিসেম্বর মনওয়ার আলীকে [এমএলএ] সভাপতি করে 'চাকরাণ প্রথা তদন্ত কমিটি' গঠন করে।[৬৮] হঠাৎ করে সরকারের এই কমিটি গঠনের পেছনে দুরভিসন্ধিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলে তখনও সন্দেহ পোষণ করা হয়। 'নানকার প্রথা'র ভেতর 'চাকরাণ প্রথা' আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত থাকলেও প্রজাস্বত্ব ও নানকার প্রথা বিলুপ্তি আন্দোলনকে ভিন্ন আঙ্গিকে রূপ দেওয়ার প্রয়াস ছিল বলে *নওবেলাল*[৬৯] মন্তব্য করে। পত্রিকার ভাষ্য—

> মধ্যযুগীয় নানকার প্রথার অবিলম্বে অবসান ঘটাইবার জন্য চারিদিক হইতে শোরগোল শুরু হইয়াছে—বর্ব্বর যুগের ধ্বংসাবশেষ এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে যখন প্রবল জনমত গঠিত হইয়া উঠিয়াছে—[...] সেই যুগসন্ধিক্ষণে আমলাতন্ত্রীয় মনোভাবাপন্ন পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্ববঙ্গ চাকরাণ প্রথা তদন্তের নামে কমিটি গঠন করিয়া জনমত সংগ্রহ [...] করিতেছে।

এই কমিটি কতগুলো নির্ধারিত প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উত্তর বিশ্লেষণপূর্বক প্রায় ছ'মাস পরে পারস্পরিক দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটো রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয়। অর্থাৎ একপক্ষ নানকারদের দখলীয় জমিতে প্রজাদের স্বত্ব প্রদানের সুপারিশ করে। অন্যপক্ষ ঘুরিয়ে-পেছিয়ে নানকারদের বর্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে থাকে।[৭০]

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে একমাত্র সিলেট জেলায় নানকার ও রায়তি কৃষক-প্রজাদের সমস্যা ছিল ব্যতিক্রম। নানকার প্রথা এত হীন ছিল যে, চলমান সমাজে তাদের 'মানুষ' হিসেবে পরিচয় দেওয়ার উপায় ছিল না। চল্লিশের দশকে অনেক নানকার ও কৃষক-প্রজার পরিবারে শিক্ষার দীপ-শিখা প্রবেশ করতে শুরু করে। অথচ জমিদারদের মনোজগতে সমাজের এই গুণগত পরিবর্তনের রেখাপাত বা আঁচড় দিতে পারেনি। তাই অনেক নানকার প্রজা তাদের পরিচয় গোপন রাখতো। শৃঙ্খল ভাঙা-ই তাদের কাছে মুখ্য ছিল। তাছাড়া অতিদরিদ্র নানকার প্রজাদের জমিজমা না থাকায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল করুণ। রায়তি কৃষকরাও ছিল অধিকার হারা। দেশ ভাগের পর সিলেটের নানকার ও প্রজা-কৃষকরা আশা করেছিল মুসলিম লীগ সরকার দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত 'খানে-বাড়ি' প্রথা রদ ও প্রজা-কৃষকদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে। কিন্তু স্থানীয় ভূমি

সমস্যার সমাধানে প্রাদেশিক সরকার ও ক্ষমতাসীন নেতারা থাকে উদাসীন। সিলেট পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গেলেও সিলেটের জমিদারি আইনের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই সিলেট ছাড়া পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার প্রজারা 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় সুবিধা পায়। কার্যত সিলেটে জমিদারের স্বার্থের দিকে আসাম সরকার দৃষ্টি রাখে; পাকিস্তান সরকারও কোনও জমিদারি আইন পরিবর্তনে কোনও ঝুঁকি নেয়নি। মুসলিম লীগের দাপটের সময় জমিদারের প্রতিশোধ পরায়ণ মনোবৃত্তি জেগে ওঠে। ক্রমে অতিষ্ঠ নানকার ও কৃষক-প্রজারা জমিদারি আইন ও আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। নানকার প্রজারা 'প্রভু'দের অত্যাচার সহ্য করতে-করতে এক সময় তাদের ওপর ব্যক্তিগত চড়াও হয়। বঞ্চিত প্রজারা জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল করে; জমিদারের সামনে জুতা পায়ে ও ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটাচলা করে—যা কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। গোলাপগঞ্জ থানার কানিশালী গ্রামের নানকার-প্রজা মুখলেস আলী একদিন অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে জমিদারের উপরেই জুতা ছুঁড়ে মারেন। এমন ঘটনা সচরাচর ঘটেনি। ফলে জমিদাররা অপমানবোধ করেন। ঐক্যবদ্ধ নানকারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়াও কঠিন হয়ে যায়। প্রজা কর্তৃক 'জমিদার সাহেব' আক্রমণের ঘটনা উপরের মহলে টনক নাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি ঢাকার লীগ সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের হাই-কমান্ড পর্যন্ত গড়ায়। মুসলিম জমিদারগণ সংগত কারণে মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে 'বঙ্গীয় [পূর্ব] প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' ঘটনাটি আমলে নেয়। অবশেষে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে নানকার আন্দোলনের সার্বিক পরিস্থিতি তদন্ত, জনক্ষোভ প্রশমনের উপায় ও সুপারিশ করতে তিন সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।[৭১] কমিটি ১৯৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর উত্তপ্ত গোলাপগঞ্জ ও ঢাকাদক্ষিণ অঞ্চল, ১৪ ডিসেম্বর বাহাদুরপুর অঞ্চল পরিদর্শন করে। তারা পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমিদার, নানকার ও কৃষক-প্রজা, সিলেট কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং সিলেট জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেন। ১৫ অক্টোবর সিলেট সার্কিট হাউসে একদল নানকার প্রজা কমিটির কাছে তাদের ওপর অত্যাচারের নমুনা হিসেবে সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিল-স্বাক্ষরিত ১৪৪ ধারার ফরমান, প্রজা উচ্ছেদ নোটিশ, মামলার নথি, সমন জারির কপি ইত্যাদি প্রদর্শন করে। ফলে তদন্ত কমিটি জমিদার কর্তৃক নানকার ও রায়তি-প্রজাদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের অখাট্য প্রমাণ পায়। আবার জমিদারের সঙ্গে প্রশাসনের যোগসাজশও প্রমাণিত হয়। তব তদন্ত কমিটি জমিদার ও নানকার প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালায়। জমিদাররা নানকারদের সাধারণ দাবির প্রতি নমনীয় হলেও ভূমির ওপর প্রজাস্বত্ব দিতে তারা রাজি হয়নি। তদন্ত কমিটি সিলেট থেকে ফিরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও সরকারের কাছে নয়টি সুপারিশ পেশ করেছিল।[৭২] কিন্তু জমিদার পক্ষ এই কমিটির প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করে। পরিশেষে তদন্ত কমিটি পূর্ব-বাংলা সরকার ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে আলাপক্রমে নানকার আন্দোলনের নেতা [কৃষক সমিতিসহ], জমিদার প্রতিনিধি এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধির মধ্যে চুক্তি করতে ঢাকায় ত্রিপক্ষীয় আলোচনার আয়োজন করে। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—ফুলবাড়ি ও ঢাকাদক্ষিণ এলাকার নানকারদের পক্ষে ইসমাইল আলী ও ডক্টর মজিদ এবং নানকারদের চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষক সমিতির পক্ষে বারীন দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস; মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে পদস্থ কর্মকর্তা হামিদুল হক চৌধুরী, হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন এবং আবদুল হামিদ; এবং জমিদারের পক্ষে কালীসদয় চৌধুরী, [ঢাকাদক্ষিণ], আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী [বাহাদুরপুর] ও খান বাহাদুর গউস উদ্দিন চৌধুরী [দাউদপুর]। কয়েকদিন পারস্পরিক এই বৈঠক চলে। কিন্তু সমাধান হয়নি। অবেশেষে অনেক বাদানুবাদের পর তিনপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৭৩]এই

ত্রিপক্ষীয় চুক্তির সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল যে, চুক্তিটি কেবল ফুলবাড়ি ও ঢাকাদক্ষিণ এলাকার জন্য প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। অথচ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের নানকার ও প্রজা কৃষকদের মৌল প্রজাস্বত্বের সমস্যা থেকে যায়। ঢাকায় সম্পাদিত চুক্তিটি পাকিস্তান সরকার থেকে কোনও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন না হওয়াতে তার কোনও আইনগত মূল্য থাকেনি; বা কোনও গেজেট হয়নি। জমিদাররা এই চুক্তি মানতে বাধ্য ছিল না। ফলে নানকার প্রথা ও প্রজাস্বত্ব আইন উপেক্ষিত থাকে। অর্থাৎ মূল সমাধানের পথে সরকার ও জমিদার কেউ-ই যায়নি। যে কারণে নানকার ও কৃষক আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করে। *নওবেলাল* জানায় ঢাকায় সম্পাদিত চুক্তিগুলো জমিদারগণ বাস্তবায়ন করতে অনীহা প্রকাশ করে।[৭৪] তবে চুক্তির শর্ত হিসেবে কমিউনিস্ট, নানকার ও কৃষক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এভাবে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ১৯৪৭ সালও শেষ হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল নানকার এবং রায়তি কৃষক-প্রজারা জমিদারের সঙ্গে অসম শক্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংগ্রাম, বিদ্রোহ করেও বড়ো ধরনের কোনও অধিকার আদায় করতে পারেনি। কেবল অবমাননাকর কিছু আইনের প্রয়োগ সাময়িক বন্ধ করতে পেরেছিল। বলা আবশ্যক যে আসাম প্রদেশে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার ১৯৩৮ সালে দশ মাস এবং ১৯৩৯ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলেও কার্যত তারা নানকার ও রায়তি প্রজাদের মৌল আর্থসামাজিক পরিবর্তনে কোনও কার্যকর ভূমিকা রাখেনি।[৭৫] সূক্ষ্মভাবে দেখলে নানকার প্রজা ও রায়তি কৃষকদের ভূমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং আসাম সরকার কেউই মনোযোগী ও উদ্যোগী ছিল না।[৭৬]'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' [১৮৮৫] পাস হওয়ার পর বঙ্গ প্রদেশের প্রজাকৃষক সমাজে সামাজিক গতি, শিক্ষা ও অর্থনীতি বিকাশ সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কিন্তু সিলেটে প্রজাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় পাকিস্তান আমলেও নানকার প্রথার মতো ভিন্নভাবে 'বান্দি' প্রথা চালু থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তেমন গড়ে ওঠেনি বা প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জুতসই নীতিমালা হয়নি।[৭৭] যে কারণে সিলেটের উপরতলার লোকজন প্রাচীন প্রথা নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে থাকে এবং শিক্ষা ও অর্থনীতিতে পিছিয়েই থাকে।

তথ্যসূত্র

১. রতনলাল চক্রবর্তী, ঔপনিবেশিক সিলেটের ভূমি-ব্যবস্থা, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* [প্রথম খণ্ড], সিলেট, ১৯৯৭, পৃ. ২২৭;

২. অপর্ণা পালচৌধুরী, স্মৃতিকথা, *একসাথে*, অপর্ণা পালচৌধুরী স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪;

৩. মো. আবদুল আজিজ, ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* [দ্বিতীয় খণ্ড], সিলেট, ২০০৬, পৃ. ২১০;

৪. 'নানকার বিদ্রোহ' বইটি নানকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা অজয় ভট্টাচার্যের লেখা আকর গ্রন্থ। গ্রন্থটি পুথিপত্র প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে ১৩৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তার আগে 'সিলেটে নানকার বিদ্রোহ' নামে কৃষক নেতা রোহিণী দাসের একটি চটি বই ছিল [নারী নেত্রী হেনা দাসের ভাষ্য]। অজয় ভট্টাচার্য ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। তিনি লাউতার জমিদারপুত্র হয়েও নানকার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে গ্রেফতার হন; ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ছাড়া পাওয়ার পর পুনরায় গ্রেফতার হয়ে বহু বছর জেলে বন্দি ছিলেন। তিনি ফিল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে নানকার বিদ্রোহের ওপর আকর গ্রন্থ প্রকাশ করলে বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে অজানা অধ্যায় সংযোজিত হয়। বইটি বাংলাদেশ ও ভারতে সমাদৃত হয়।

৫. ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে সিলেটের মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে *জাগরণ*

পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। সম্পাদক ছিলেন মো. আজিজুর রহমান। কংগ্রেস ভাবধারার সমর্থক ছিলেন। সমকালীন সকল নানকার, প্রজা-কৃষক ও রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন-সংগ্রামের খবর এই পত্রিকায় অধিক পাওয়া যায়। ১৯৩৮–৩৯ সালের ফাইলটি সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদে সংরক্ষিত আছে।

৬. লালমোহন রায়, 'জীবন খেয়া' [অপ্রকাশিত আত্মস্মৃতি, অনুলিখন: দীপংকর মোহান্ত], তার বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার বর্তমান মধ্যনগর উপজেলায়। জন্ম: ১৯১২ সাল। তিনি তরুণ সংঘের কর্মী ছিলেন পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। লালমোহন রায় কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক নানকার আন্দোলন ও প্রজা-কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে সানেশ্বর ও দাসেরবাজার অঞ্চলে ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে চলে যান এবং 'বকুল' ছদ্মনামে প্রায় দেড় যুগ কাটিয়ে দেন। তিনি প্রচারবিমুখ নেতা ছিলেন। ফলে তাঁর কথা জনসমক্ষে তেমন আসেনি। লালমোহন রায় ২০১৬ সালে গ্রামের বাড়িতে মারা যান। তাঁর কর্মের মূল্যায়ন করেছেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেতা চঞ্চল শর্মা [*সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১২১]।

৭. *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* [সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত], এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬, ভূমিকা অংশ [viii];

৮. এই তথ্য নিশ্চিত করেন নানকার ও কৃষক নেতা লালমোহন রায়। মো. আবদুল আজিজ সুখাইড় জমিদারের বিরুদ্ধে নানাকার প্রজাদের আন্দোলনকে 'নানকার বিদ্রোহের প্রথম সূচনা' হিসেবে অভিহিত চিহ্নিত করেছেন [ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ. ২১৪]

৯. সিলেটে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সমর্থক স্কুল-কলেজ ত্যাগী ছাত্ররা কুলাউড়ার রঙ্গিরকূল পাহাড়ের মধ্যে আশ্রম করে সামাজিক-রাজনৈতিক কাজ করতেন। তাঁরা সর্বত্যাগী ছিলেন [মাতৃভূমিকে স্বাধীনতা করার নিমিত্তে তারা পরিবার ত্যাগীও করেন]। এই দলের অন্যতম দলপতি পূর্ণেন্দুকিশোর সেন [১৯৯৫-১৯৭৮] সুভাষপন্থি কংগ্রেসি ছিলেন। তিনি ভানুবিল প্রজা আন্দোলনে যুক্ত থেকে 'ভানুবিল প্রজা সত্যাগ্রহের ডাক' দেন। প্রজারা জমিদারের নায়েব, পাইক-পেয়াদাদের ওপর আক্রমণ করে। ফলে ১৯৩২ সালে পূর্ণেন্দু সেন তাঁর কয়েজন কর্মীসহ গ্রেফতার হয়েছিলেন। আবার ১৯৩৩ সালে ও২২ জন কর্মীসহ গ্রেফতার হন [সূত্র: নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী, *কর্মযোগী পূর্ণেন্দুকিশোর সেন*, কাছাড়, শিলচর, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭-৩১]

১০. ভানুবিল: মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মণিপুরি অধ্যুষিত গ্রাম। যা কুলাউড়া পৃথিমপাশার জমিদার আলী আমজদের জমিদারিভুক্ত ছিল। তাঁর নায়েবরা দুর্নীতি করে খাজনা কোষাগারে জমা দেয়নি; আবার প্রজাদের ওপর নোটিশ পাঠায়। অন্যদিকে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মণিপুরি কৃষকরা নিজেরো সংগঠিত হয়ে খাজনা বন্ধ রাখে। প্রায় ১৯৩০ সাল থেকে মণিপুরি কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়।

১১. আহমদ সিরাজ, *ভানুবিলের কৃষক বিদ্রোহ ও অন্যান্য*, মৌলভীবাজার, ২০০৬;

১২. শচীন সেন, *বাংলার রায়ত ও জমিদার*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪;

১৩. নিশীথ রঞ্জন দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ধারায় অসম প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টি*, করিমগঞ্জ, ভারত, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭ [অন্য বই: চঞ্চল শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতি*, কলকাতা, ১৯৮৩]

১৪. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি [চতুর্থ সংস্করণ], কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫৫;

১৫. সর্বভারতীয় 'কৃষান সভা' গঠনের পরপর ১৯৩৬ সালের অক্টোবরের দিকে 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'র জন্ম হয়। 'সুরমা উপত্যকা কৃষক সভা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন লালা শরদিন্দু দে [১৯০৪-১৯৮৭] এবং সভাপতি ছিলেন করুণাসিন্ধু রায়। তাঁদের উদ্যোগে 'শ্রীহট্ট কৃষক সমিতি' গঠিত হয়।

তার মূল কেন্দ্র থাকে সুনামগঞ্জে। কমরেড লালা শরদিন্দু দে, কমরেড করুণাসিন্ধু রায়, রোহিণী দাস প্রমুখ ছিলেন সংগঠনের প্রাণশক্তি। সকলের বাড়ি ছিল সুনামগঞ্জ জেলায়।

১৬. বঙ্কিম মুখার্জির [১৮৯৭-১৯৬১] বাড়ি কলকাতার পাশে হাওড়া জেলায়। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলকাতায় 'শ্রীহট্ট কমিউনিস্ট পার্টি' গঠনের সময় লালা শরদিন্দু দে, চঞ্চল শর্মার সাথে বঙ্কিম মুখার্জির যোগাযোগ ছিল। ভানুবিল কৃষক আন্দোলনের সময় তিনি এই অঞ্চল সফর করেছিলেন বলে জানা যায় [সূত্র: বিপ্লবী সূর্যমণি দে (শ্রীমঙ্গল; ১৯১০-১৯৯৯)। তিনি প্রথম যুগের কমিউনিস্ট ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট কৃষক সমিতির নেতা ছিলেন।

১৭. চঞ্চল শর্মা, *সুরমা উপত্যকা কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস,* ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৮;

১৮. অজয় ভট্টাচার্য, *অর্ধ শতাব্দী আগে গণ-আন্দোলন এ দেশে কেমন ছিল,* ঢাকা, ১০৯০, পৃ. ৭৯;

১৯. হেনা দাস, *চারপুরুষের কাহিনী,* গ্লোব লাইব্রেরি প্রা. লি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৯৩-১৯৪;

২০. অপর্ণা পালচৌধুরী, স্মৃতিকথা, *একসাথে পত্রিকা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪;

২১. মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা,* সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ১৪০;

২২. নারী নেত্রী হেনা দাসের সাক্ষাৎকার [তারিখ ও স্থান: ১০.০৩. ২০০১; উমেশচন্দ্র নির্মলাবালা ছাত্রাবাস, চালিবন্দর, সিলেট। তিনি নানকার নারীদের মধ্যে কাজ করতেন।]

২৩. নানকার ও কৃষক নেতা লালমোহন রায়ের সাক্ষাৎকার [তারিখ ও স্থান: ০১.০২. ২০০৪; পিটি আই ক্যাম্পাস, সুনামগঞ্জ]

২৪. জেড এ আহমেদ [জয়নাল আবেদীন আহমদ]: ১৯৩৪ সালে ভারতের বামপন্থি নেতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে থাকা সমাজতন্ত্র সমর্থক ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা চালায়। সেসূত্রে গড়ে ওঠে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (সংক্ষেপে সি এস পি)। ওই সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জেড এ আহমেদ এবং ই.এম.এস. নাম্বরিদিপাদ। জেড এ আহমদ ছিলেন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা। মধ্য-ত্রিশে ভারতের কৃষক আন্দোলনকে বেগবান করতে সমাজতন্ত্রী সমর্থকদের মধ্যে ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করার মতো। সিলেটে সমাজতন্ত্র চিন্তক রাজনৈতিক কর্মীদের একত্র করে কৃষক আন্দোলনে গতি দিতে জেড এ আহমদকে সুনামগঞ্জে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

২৫. সাক্ষাৎকার: প্রসূনকান্তি রায়—বরুণ রায় [১৯২২-২০০৯]। তিনি প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। তাঁর পিতা হলেন করুণাসিন্ধু রায়। বরুণ রায় ১৯৫৪ সালে জেলে বন্দি অবস্থায় এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। মূলবাড়ি: বেহেলী, সুনামগঞ্জ। শেষ জীবনে তিনি সুনামগঞ্জ শহরের নতুনপাড়া হাসননগর এলাকায় বসবাস করতেন। সাক্ষাৎকারটি তাঁর বাসায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে গৃহীত।

২৬. প্রদীপ সরকার, *জনজীবন যুদ্ধ,* আগরতলা ভারত, ২০০৮, পৃ. ২০;

২৭. চঞ্চল শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন—স্মৃতিকথা,* কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭২;

২৮. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ,* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭০;

২৯. *জাগরণ,* শ্রীহট্ট, ২৯ এপ্রিল, ১৯৩৮ [সুরমা উপত্যকা কৃষক সমিতির মূল (১৯৩৬) আট দফা দাবি তারা জনসমক্ষে তোলে ধরে]

৩০. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ,* অখন্ড সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৯-৮০;

৩১. *জনশক্তি,* শ্রীহট্ট, ২০ জুলাই ১৯৩৮, ১৮ খন্ড, ৮ম সংখ্যা;

৩২. *জনশক্তি,* ১০ আগস্ট ১৯৩৮ [এই সংখ্যায় গ্রাম বৈঠকের তালিকা পাওয়া যায়];

৩৩. *জাগরণ,* ৯ আগস্ট ১৯৩৮;

৩৪. *জাগরণ,* ২১ আগস্ট ১৯৩৮। তাছাড়া *জাগরণ*-এর পাতায় সিলেটের বহু জনপদে কৃষক-প্রজার বৈঠকের খবর ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন—২ মে রাজবাড়ি, ৭ মে মানিককোণা, ১৪ মে গিরিশগঞ্জ বাজারের নানকার প্রজাদের নিয়ে কৃষক সমিতির সভার সংবাদ রয়েছে।

৩৫. *জাগরণ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। শিরোনাম: 'মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর তাহিরপুর সফর—দর্শনপ্রার্থী জনতার বিক্ষোভ প্রকাশ—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন দাবি।'

৩৬. *জাগরণ*, ২৯ এপ্রিল ১৯৩৮;

৩৭. সানেশ্বর গ্রামকে আঞ্চলিকভাবে—শালেশ্বর, সালেশ্বর, সালেস্বর, সানেশ্বর নামে ডাকা হয়। অধিকাংশ জায়গায় 'সানেশ্বর' থাকায় আমরা এই বানান গ্রহণ করেছি।

৩৮. রঞ্জন রায়, 'কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ। *গণ-আন্দোলন ও রঞ্জন রায়*, সম্পদনা: দুলাল উড়িয়া, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০২, পৃ. ২৪ [রঞ্জন রায়ের মূল বাড়ি: দিঘলী, বিশ্বনাথ, সিলেট। তিনি ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টির সংস্কৃতি ফ্রন্ট দেখতেন এবং কৃষক সমিতির পক্ষে সানেশ্বর-দাসেরবাজারে মধ্যে কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে সানেশ্বর কৃষক হত্যা নিয়ে তাঁর কিছু নোট রয়েছে। পরে পার্টির নির্দেশে ত্রিপুরার খোয়াই অঞ্চলে চলে যান। তখন তাঁর ছদ্মনাম হয় রঞ্জন রায়। তাঁর আসল নাম হলো হেমন্ত দাশপুরকায়স্থ]

৩৯. স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবেন্দ্র প্রসাদ দাম রায়-এর প্রবন্ধ 'বিপ্লবী রবি দাম ও তৎকালীন রাজনীতি', *বিপ্লবী রবি দাম* [স্মারক], সম্পাদনা: মুতাসীম আলী, সুনামগঞ্জ, ১৯৭৯, পৃ. ৩৩;

৪০. *জাগরণ*,২০ মাঘ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ;

৪১. *নয়াদুনিয়া*, শ্রীহট্ট, ১৭ মাঘ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ;

৪২. *যুগভেরী*, শ্রীহট্ট, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ['পৃথিমপাশার জমিদারের আদেশে জুড়ির নিকটবর্ত্তী পাথারিয়ার জমিদারের দখলীয় কালীনগর নামক স্থান জোরপূর্বক দখল করিবার উদ্দেশ্যে হাতিসহ লোকজন উপস্থিত হইয়া জোর করিয়া একটি বাড়ি দখল করে এবং একখানা ঘর ও একজন মানুষ পুড়াইয়া দেয়।...তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা দীর্ঘদিন প্রজাদের উপর গিয়া পড়েছিল।']

৪৩. *জাগরণ*,২১ আগস্ট ১৯৩৮;

৪৪. *জাগরণ*, ২১ আগস্ট ১৯৩৮;

৪৫. *জাগরণ*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮;

৪৬. *জাগরণ*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮;

৪৭. দীপংকর মোহান্ত, 'করুণাসিন্ধু রায়ের শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও সমকালীন কৃষক প্রজা আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রসূনকান্তি রায়, সংগ্রামী স্মৃতির মোহনায়, উৎস প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পরিশিষ্ট—২, পৃ. ৮৯। শিলং পার্লামেন্টের স্পিকার ১৪ সদস্য-বিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু আসামে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সিলেক্ট কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং করুণাসিন্ধুর বিলও চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ে।

৪৮. *জাগরণ*, ২০ আগস্ট ১৯৩৮;

৪৯. *জাগরণ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮;

৫০. লালমোহন রায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন' ও কৃষকদের শিলং অভিযানের স্মৃতি' [সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'সুনামকণ্ঠ' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। মূল কপি সংরক্ষিত]

৫১. *জাগরণ*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮;

৫২. *জনশক্তি*, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। পত্রিকার শিরোনাম: 'শিলং-এ কিষাণ অভিযান'—'অদ্য অপরাহ্নে স্থগিত প্রস্তাব আলোচনা চলাকালে শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কংগ্রেস ও কৃষক কর্মীদের পরিচালিত কৃষক শোভাযাত্রা নানাবিধ প্লেকার্ড কংগ্রেস এবং কৃষক পতাকাসহ পরিষদ গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা কৃষক সমিতির নানাবিধ ধ্বনি ছাড়া 'মন্ত্রীমন্ডলী ধ্বংস হোক' ইত্যাদি সরকার বিরোধী ধ্বনী করিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট হইতে গত দুইদিনে সে কৃষকরা আসিয়াছিলেন। তাহারা তাতে যোগ দেন।

৫৩. বারীণ দত্ত, *সংগ্রামমুখর দিনগুলি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪১ [৫২ মৌজার তালিকা রয়েছে]

৫৪. অজয় ভট্টচার্য, *অর্ধশতাব্দী আগে গণ-আন্দোলন এ দেশে কেমন ছিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০ [কমিটির নাম

রয়েছে]

৫৫. ৫২ মৌজার বৈঠকে উপস্থাপনকৃত দাবি: ১. প্রজার দখলীয় জোত জমির উপর দান-বিক্রয় হস্তান্তরের অধিকারসহ স্থায়ী প্রজাস্বত্বের স্বীকৃতি; ২. জমির খাজনা সরকারি রাজস্বের পাঁচগুণের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ; ৩. নানকার (বেগার) ব্যবস্থার বিলোপ সাধন; ৪. ফসলে (ধানে) খাজনা প্রদান রহিতকরণ; ৫. জমিদারের জোর-জুলুম, বিচার-অবিচার, বেআইনি ভেট-পার্বণী, উপঢৌকন, নজরানা, সেলামি, তহুরি, জরিমানা প্রভৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে আইনগত বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। [অজয় ভট্টাচার্যের নানকার বিদ্রোহ, প্রাগুক্ত ৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।]

৫৬. এক সময় নানকার আন্দোলনের মূল স্থান হয়ে দাঁড়ায় লাউতা-বাহাদুরপুর-সানেশ্বর ও দাসেরবাজার অঞ্চল। ১৯৩৯-১৯৪৯ পর্যন্ত এই এলাকার আন্দোলন ছিল শীর্ষে। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানি পুলিশ ও ইপি আরদের সাথে সানেশ্বর এলাকায় কৃষকদের সংঘর্ষ হয় এবং কয়েকজন কৃষক শহিদ হয়েছিলেন।

৫৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 'সুরমা উপত্যকায় প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ, *উজান গাঙ বাইয়া*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯০-সহ অন্যান্য [নদীয়া দাস (৯৩), গ্রাম: বাঘমারা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। তিনি দাসেরবাজার এলাকার লোক; এখনও সেকালের গণসংগীত তাঁর মনে আসে।)

৫৮. নিশীথ রঞ্জন দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ধারায় অসম প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯। সোনা মিয়া ১৯২৭ সালে আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপনা সভায় বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

৫৯. *জাগরণ*, ৫ আগস্ট ১৯৩৯;

৬০. হেনা দাস, *উজ্জ্বল স্মৃতি* ['নানাকার নেত্রী কালই বিবি' অংশ], ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৭২

৬১. *জাগরণ*, ৯ জুন ১৯৩৯;

৬২. সাক্ষাৎকার: বিপ্লবী সূর্যমণি দে [১৯১০—১৯৯৯], তিনি এই সম্মেলনের কনভেনার ছিলেন। সমকালীন পত্রিকায় খবরও ছাপা হয়।

৬৩. *যুগের আলো*, সম্পাদক: শ্যামাধন সেনগুপ্ত, শ্রীহট্ট, ১৪ মার্চ ১৯৪৩

৬৪. *যুগের আলো*, ১৪ মার্চ ১৯৪৩;

৬৫. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* [দ্বিতীয় খণ্ড], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৩;

৬৬. চঞ্চল শর্মা, *সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৬৭. দীপংকর মোহান্ত, *সানেশ্বর-দাসেরবাজার কৃষক আন্দোলন: প্রেক্ষিত লালমোহন রায়*, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি [সংরক্ষিত]

৬৮. *নওবেলাল*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮ ['চাকরাণ প্রথা তদন্ত কমিটি': সভাপতি: মনওয়ার আলী এমএলএ (সুনামগঞ্জ); সেক্রেটারি: খান সাহেব আজিজুর রহমান (আসামের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন); ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (পাইলগাঁওয়ের জমিদার, সুনামগঞ্জ ও কংগ্রেস নেতা); যোগেন্দ্র দাস এমএলএ; ইদ্রিস আলী এমএলএ; আবদুল লতিফ এমএলএ; আবদুল মোমেন এমএলএ; মির্জা আবদুল হাফিজ এমএলএ।

৬৯. *নওবেলাল*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮;

৭০. *নওবেলাল*, ৬ মে ১৯৪৮ [রায়তি ও নানকারদের ভোগ-দখলীয় জমির প্রজাস্বত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেন—মনওয়ার আলী এমএলএ, যোগেন্দ্র দাস এমএলএ; আবদুল লতিফ এমএলএ; আবদুল মোমেন এমএলএ; মির্জা আবদুল হাফিজ এমএলএ। আবার রায়তি ও নানকারদের প্রজাস্বত্ব না দিয়ে স্থিতাবস্থায় মতামত দেন—খান সাহেব আজিজুর রহমান, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ইদ্রিস আলী এমএলএ। তারা একমত হতে না পেরে আলাদ-আলাদা রিপোর্ট পাঠায় বলে পত্রিকাটি জানায়]

৭১. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫ [তিন সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি: ১. সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন (প্রাক্তন মন্ত্রী); ২. আওলাদ হোসেন এমএলএ; ৩. আবদুল বারী এমএলএ]

৭২. *নওবেলাল* পত্রিকা ১ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখ প্রস্তাবগুলোর সারাংশ প্রকাশ করেছিল।

৭৩. মো. আবদুল আজিজ, 'ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ' শীর্ষক প্রবন্ধ, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* [দ্বিতীয় খন্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-এ লেখেন যে ৬ দফা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। আবার বদরুদ্দীন উমর তাঁর '*পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* [দ্বিতীয় খন্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯-এ লেখেন চার দফা চুক্তি হয়। তবে চুক্তিগুলোর মূলানুগ কথা প্রায় একই বলে প্রতীয়মান। চুক্তির বিষয়াবলি [বদরুদ্দীন উমরের লেখা থেকে]: ১. নানকারদের সংশ্লিষ্ট যে শতাধিক বন্দি আছেন—তাঁদের ওপর দেওয়া মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তি দিতে হবে [কমিউনিস্টপার্টিসহ]; ২. জমিদার তার বাড়িসংলগ্ন নানকারদের বাড়ি উচ্ছেদ করতে পারবেন। তবে তাকে নতুন করে জায়গা দিতে হবে এবং একই সাথে বাড়ি স্থানান্তরের খরচ জমিদার বহন করবেন; ৩. যে সমস্ত জমি নানকারদের দখলে আছে তার অর্ধেক জমিদারকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বাকি অর্ধেকে নানকারদের জোতস্বত্ব স্বীকৃত হবে। যে জমিতে নানকারদের জোতস্বত্ব স্বীকৃত হবে সেগুলো খাজনারী জমিতে রূপান্তরিত হবে; ৪. জমি হস্তান্তরের সময় যাবতীয় কাজ দেখাশোনার জন্য সেটেলমেন্টের অভিজ্ঞ একজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। এই অফিসার ঘরের মূল্য, খাজনা ইত্যাদি নির্ধারণ করবেন; [(আবদুল আজিজের লেখা থেকে) ৫. অতিরিক্ত জোতজমি প্রচলিত হারে নগদ অর্থে খাজনা ধার্য হবে; ৬. এ চুক্তি শুধু সংঘর্ষে লিপ্ত অঞ্চলে কার্যকর হবে।]

৭৪. *নওবেলাল*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮;

৭৫. কংগ্রেস নেতা নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামীর [১৯১৩-১৯৯৩] সাক্ষাৎকারের নোট: ১৯৯১; উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাস, চালিবন্দর, সিলেট।

৭৬. শিবেন্দ্রপ্রসাদ দে, সাক্ষাৎকার: ১৯৯৯, বড়িশা, কলকাতা [মূল বাড়ি: নাথেরদিঘী, মহলাল, রাজনগর, মৌলভীবাজার। তিনি দেশভাগের সময় দিল্লিতে স্টেটম্যান পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর সিলেটে নানাকার ও প্রজা-কৃষক-আন্দোলন সম্পর্কে নোট ছিল]।

৭৭. আসামে পাঠশালা স্থাপনের ক্ষেত্রে 'এক গুরু—এক পাঠশালা' নীতি ছিল বেশি। অর্থাৎ পাঠাশালা চালাবেন একজন বা দুইজন গুরু। কিন্তু বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব পাশের পর পাঠশালার শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেখানে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার নীতিমালায় ছিল ঘরের পরিমাপ, ভূমির পরিমাপ এবং শিক্ষাগুরুর সংখ্যা [ন্যূনতম ৩/৪জন] প্রভৃতি। কিন্তু 'আসামী নীতি'র কারণে নব্বই সালেও সিলেটে এক শিক্ষক ও দুই শিক্ষকের স্কুল ছিল চোখে পড়ার মতো।

ISSN 2707-9201

সৈয়দ আলী আহসান: শিল্পবোধ ও শিল্পাদর্শ

ড. কামাল উদ্দিন শামীম*

সারসংক্ষেপ: সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২) বাংলাদেশের মননশীল জগতে একজন প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্য সাধক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমস্ত উচ্চারণের কেন্দ্রবিন্দু কবিতা হলেও গদ্য রচনায়ও তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। দেশ, জাতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধ এবং স্মৃতিকথা নিয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া শিল্পকলা বিষয়ে তিনি অনেক সৃষ্টিশীল, সমালোচনাধর্মী ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শিল্পকলা আলোচনায় তিনি একদিকে যেমন রূপদর্শী অন্যদিকে তেমনই স্বকীয় শিল্পাদর্শ নির্মাণে সমুজ্জ্বল। ভারতীয় উপমহাদেশে যে কয়জন শিল্পরসিক পন্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নন্দনতত্ত্ব চর্চায় একজন অসাধারণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসাবে তাঁর আলাদা একটি পরিচিতি রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে শিল্পতাত্ত্বিক সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পবোধ ও শিল্পাদর্শ বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

চাবিশব্দ: শিল্পবোধ; শিল্পচৈতন্য; শিল্পকলা; চিত্রশিল্প; ভিঞ্চি; বিহ্যাদ; জয়নুল।

সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পরসিক ও তাত্ত্বিক। কবিতা-বিশ্ব তাঁর স্বপ্নের ভুবন হলেও শিল্পকলার জগৎ ছিল একটি আধেয়। ফলে ভারতীয় শিল্পবলয়ের অজন্তা[১]-ইলোরা[২] হতে যাত্রা শুরু করে ইউরোপীয় শিল্পের জগৎ, মার্কিনি শিল্পকলা, মধ্যপ্রাচ্য তথা পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতি এবং সুমেরীয় শিল্পসভ্যতায়ও তাঁর বিপুল ও বিস্ময়কর অভিগমন ঘটেছে।

সৈয়দ আলী আহসানের মনোজগতে শিল্পবোধের উন্মেষ ঘটে বাল্যকালে, আরমানিটোলা স্কুলে অধ্যয়নকালে। শৈশবে তাঁকে শিল্পকলা বিষয়ে পাঠগ্রহণে উজ্জীবিত করেছিলেন স্কুলের শিক্ষক জনাব এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী। আলী আহসানের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়: 'ট্রেনিং কলেজের এই শিক্ষকের নাম এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলা। আমার কিশোর মনে তিনি অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমার কিশোর মনকে তিনি এতটা উদ্দীপিত করেছিলেন যে আমি ক্লাসের পরও তাঁর বাড়িতে যেতাম। ... জুলফিকার আলী সাহেব ছিলেন আধুনিক শিল্পানুরাগী ব্যক্তিত্ব (আহসান, ১৯৮৩: ৭৩)।' বস্তুত এভাবে শৈশবেই আলী আহসানের চিত্তে শিল্পবোধের উৎসারণ ঘটে। চিত্রকলায় রঙের ব্যবহার এ সময়ে তাঁকে সম্মোহিত করে। উল্লেখ্য, বাল্যকালের এই শিল্পানুরাগ সৈয়দ আলী আহসানকে আজীবন প্রভাবিত করেছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া।

সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পচেতনার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে কলকাতা নগরের শিল্পবলয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতা নগরে তিনি এক চিত্রকলাময় পরিমন্ডলে বৃত হন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে চিত্রশিল্পী আনোয়ারুল হক (১৯১৮-৮১), সফিউদ্দিন আহম্মদ (১৯২২-২০১২), লেডি রানু মুখার্জি (১৯০৬-৮২) এবং যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) প্রমুখের সঙ্গে। অপরদিকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-৭৬) ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ সময়ে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চিত্রকলার পরিমন্ডলটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। এভাবে পরিণত বয়সে সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পসমালোচনায় যে অগাধ পান্ডিত্য ও মনোহর বিশ্লেষণ পরিদৃষ্ট হয় তার ভিত্তি এখানেই তৈরি হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং সৃষ্টি হয় দুটি নতুন রাষ্ট্র- ভারত ও পাকিস্তান। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত শিল্পকলার জগতেও এক সংকটের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৪৮ সালে সৈয়দ আলী আহসান আবদুল গণি হাজারীকে (১৯২১-৭৬) সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় শিল্পকলা চর্চা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নিজেকে শিল্প আন্দোলনে নিয়োজিত করেন। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিভূমি হিসাবে 'ঢাকা আর্ট স্কুল' (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া এ সময়ে তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' (১৯৫১) নামে একটি শিল্পচর্চা বিষয়ক সংগঠন গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য যে, ঢাকা আর্ট গ্রুপের সভাপতি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ আলী আহসান।

সৈয়দ আলী আহসান ১৯৫৯ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে প্রখ্যাত শিল্পরসিক প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯০-১৯৬৫) সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আলী আহসান চিত্রসমালোচনার পাঠ গ্রহণ করেন এবং চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পবোধকে আর একজন প্রথিতযশা শিল্পী উজ্জীবিত করেছিলেন—তিনি ভারতীয় লেখক ও চিত্রশিল্পী মূল্করাজ আনন্দ (১৯০৫-২০০৪)। মূল্করাজ আনন্দের সঙ্গে শিল্পবিষয়ক আলোচনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। ১৯৭৪ সালে সৈয়দ আলী আহসান আনন্দ সম্পাদিত *মার্গ* পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় (বাংলাদেশ হেরিটেজ সংখ্যা) অতিথি সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিদেশ যাত্রায় তাঁর নানা দেশের চিত্রশালা উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। বস্তুত এভাবে কালের পরিক্রমায় চিত্রকলা বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পমানস গড়ে উঠেছে।

সৈয়দ আলী আহসান শিল্পকলা বিষয়ে যে কয়খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—*শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (১৯৮৩), *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ* (২০০২), *জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম* (২০০৬)। এ ছাড়া তাঁর রচিত ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রকাশিত *Contemporary Art Series of Bangladesh-29* এবং 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা'সহ আরও দু-একটি প্রবন্ধ অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসানের *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* গ্রন্থটি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে: ১. শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য: ভূমিকা; ২. প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পচৈতন্য; ৩. শিল্পকর্মে দৃষ্টি চেতনা; ৪. বিমূর্ত শিল্পকর্ম; ৫. চিত্রকর্মে রং এর ব্যঞ্জনা ও রস প্রতিপত্তি; ৬. লিওনার্দো দা ভিঞ্চি; ৭. বিহ্যাদ; ৮. পল ক্লি; ৯. কিউবিজম এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা; ১০. পিকাসো; ১১. স্থাপত্য শিল্প; ১২. ভাস্কর্য; ১৩. শিল্পচিন্তা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; ১৪. আধুনিক শিল্পকলা: স্যুররিয়ালিজম; ১৫. আধুনিক শিল্পকলা: ভাষার ব্যবহার;

১৬. আধুনিক জার্মান শিল্পকলা; ১৭. ভাববাদী শিল্প এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক শিল্পকলা; ১৮. চীন এবং জাপানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি; ১৯. ইসলামী শিল্পকলা; ২০. ভারতীয় শিল্পকলা-১; ২১. ভারতীয় শিল্পকলা-২; ২২. অপ্রধান শিল্প; ২৩. শিল্পকলা এবং ইসলাম এবং ২৪. বাংলাদেশের শিল্পকলা।

শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য: ভূমিকা'। প্রবন্ধটিতে সৈয়দ আলী আহসান শিল্প ও শিল্পকলা বিষয়ে হারবার্ট রিড (১৮৯৩-১৯৬৮), প্লেটো (খ্রি.পূ. ৪২৭-খ্রি.পূ. ৩৪৭) ও পল সেজাঁর (১৮৩৯-১৯০৬) শিল্পাদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া শিল্পচিন্তায় রং, রেখা এবং দৃষ্টির তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে আলোচনা রয়েছে।

প্রবন্ধে লেখক অবলোকন করেছেন শিল্পকর্ম পৃথিবীকে উপলব্ধি করার একটি আবেগময় কৌশল। অবশ্য এ ছাড়াও পৃথিবীকে আরও অনেকভাবে অবলোকন করা যায়। কিন্তু শিল্প হচ্ছে একটি ভিন্নতর চৈতন্যভিত্তিক সিদ্ধি। শিল্পী বিশেষ কৌশলে তাঁর দৃষ্টিনির্ভর অনুভূত সত্যকে রং ও রেখার সাহায্যে চিত্ররূপ প্রদান করেন কিংবা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূর্তিময়তায় পর্যবসিত করেন। মানুষের পৃথিবীকে বিচিত্ররূপে উপলব্ধি করার কৌশল দেখা যায় শিল্পসত্তা বিকাশের ইতিহাসে।

গ্রন্থের পরবর্তী প্রবন্ধ 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পচৈতন্য'-এ সৈয়দ আলী আহসান শিল্পকলা চর্চায় শিকড় সন্ধানী হবার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাচীন যুগের গুহাচিত্র হতে কীভাবে শিল্পচর্চা বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে উপনীত হয়েছে সে সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে তাঁর মূল্যায়ন রয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে: 'জীবনকে স্পর্শ করেই শিল্পের উন্মোচন। জীবনের প্রাত্যহিকতাকে আনন্দিত রাখবার জন্যই শিল্পের বিকাশ, জীবনের আশ্লেষ এবং বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করেই ক্রমাগত শিল্পরীতির বিবর্তন' (আহসান, ২০০৪: ২৩)।

আদিম মানুষের শিল্পকে আবিষ্কার করা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। প্রাচীন মানুষ বন্যপ্রাণীর গতিভঙ্গি এবং অঙ্গসঞ্চালন নকল করত। এছাড়া তারা প্রাণীর গতিভঙ্গির 'রিদম' বা গতি-তরঙ্গকে অনুকরণ করত। যেহেতু প্রয়োজনীয় আহার্য কিংবা আত্মরক্ষার জন্য প্রাণীকে হত্যা করতে হচ্ছে তাই মানুষকে প্রাণিকুলের বিশ্রাম, আহার এবং পলায়নপর ভঙ্গিকেও পূর্ণ আয়ত্তে আনতে হয়েছে। এভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্য অভিব্যক্ত করতে গিয়ে মানুষ গুহাগাত্রে শিল্পের জন্ম দিয়েছে।

'শিল্পকর্মে দৃষ্টিচেতনা' প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন একজন শিল্পীকে শিল্প নির্মাণে দৃষ্টিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং এ অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পায় শিল্পকর্মে নিপুণতা তত বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে শিল্প উপভোগের অধিকারও প্রসার লাভ করে। একজন শিল্পীর নিপুণতা প্রমাণিত হয় তার দৃষ্টিচেতনা চিত্ররূপে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত ফরাসি চিত্রশিল্পী অঁরি মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) এর রাজহাঁসের এচিং এর কথা বলা যায়। এচিংয়ে মাতিস রাজহাঁসের শরীর দেখেননি, অবলোকন করেছেন তার মাধুর্যকে যা লীলায়িত গ্রীবাভঙ্গিতে ধরা পড়েছে। এভাবে ড্রয়িং-এ ধরা পড়েছে মাতিসের বিশেষ দৃষ্টিচেতনা।

'বিমূর্ত শিল্পকর্ম' গ্রন্থটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এখানে সৈয়দ আলী আহসান বিমূর্ত শিল্পকর্মের গঠন, বৈচিত্র্য, প্রকৃতি এবং ইতিহাস আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেন যে, মার্ক শাগাল (১৮৮৭-১৯৮৫), ফরাসি চিত্রশিল্পী এদগার দেগা (১৮৩৪-১৯১৭), পিয়েৎ মনদ্রিয়ান (১৮৭২-১৯৪৪), কানদিনস্কি (১৮৬৬-১৯৪৪) এবং পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) বিমূর্ত শিল্পকর্মের চূড়াস্পর্শী চিত্রকর। তাঁর মতে পাবলো পিকাসো বিমূর্ত চিত্রশিল্পের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। পিকাসো সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মূল্যায়ন—

> পিকাসোর বিখ্যাত চিত্র 'গোয়েনির্কা' শিল্পগত বিমূর্ততার একটি বলিষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু উক্ত চিত্রের বিমূর্ততা ইচ্ছাকৃতভাবেই সীমাবদ্ধ কেননা সেখানে অশ্ব, ষাঁড়, রমণী, পুরুষ, আগুন এ সমস্তের সুচিহ্নিত নিদর্শন আছে। সংগীতের মতো বিমূর্ত চিত্রকলা রিপ্রেজেন্টেশন বা প্রতিনিধিত্বতা থেকে মুক্ত হবে (২০০৪: ৩৪)।

'চিত্রকর্মে রং এর ব্যঞ্জনা ও রস প্রতিপত্তি' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান চিত্রকর্মে রং ও এর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধটিতে রঙের বৈচিত্র্যময় প্রভাব নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিকের প্রজ্ঞা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি' প্রবন্ধ ইতালির রেনেসাঁ যুগের শিল্পী লিওনার্দোর জীবন ইতিহাস এবং শিল্পকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়ন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) জ্ঞানের অসাধারণ ব্যাপ্তিতে, শিল্পকর্মের নীতি নির্ধারণে এবং অভূতপূর্ব কল্পনার কালজয়ী আশ্রয় ছিলেন। তিনি জ্যামিতির কৌশলে চিত্রকলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে শিল্পকর্মকে বৈজ্ঞানিক সততায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> লিওনার্দো প্রেমের অভিজ্ঞানে জীবনকে কবিতায় পরিণত করেছিলেন, আত্মার সম্যক সূচনা করেছিলেন বিজ্ঞানে এবং বহির্জাগতিক ও অন্তর্গত অভিজ্ঞতার মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিলেন। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সাধারণ বিবেচনায় যে ব্যবধান রয়েছে তা তিনি দূর করেছিলেন। তাঁর হস্তস্পর্শে য়ুরোপীয় শিল্পকলা মধুর, প্রেমময়, মহৎ এবং সম্পন্ন হল (২০০৪: ৫৬)।

'মাইকেল এঞ্জেলো' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান ইতালীয় রেনেসাঁর যুগপুরুষ মাইকেল এঞ্জেলোর (১৪৭৫-১৫৬৪) শিল্পীসত্তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন য়ুরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম বৃহৎ শক্তিধর ভাস্কর, স্থপতি, চিত্রকর্মী এবং কবি। তাঁর শিল্পকর্মে মানব জীবনে জন্ম এবং মৃত্যুর রহস্য, দীপ্যমানতা এবং যন্ত্রণা শিল্পীর মর্মমূলে কাজ করেছে। মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিভা যেন বিশ্বপ্রভুর কাছ থেকে অকস্মাৎ অধিকৃত বিদ্যুৎবিভা, বহু অজস্রের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত একটি বিস্ময়, প্রবল প্রশান্ত অনন্য এক নাগরিকতা। তিনি তাঁর সমকালের মধ্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও যুগান্ত আশ্রয়ী, সর্বকালের।

শুধু পাশ্চাত্য শিল্পকর্ম নয় প্রাচ্য শিল্পকর্মও সৈয়দ আলী আহসানের আগ্রহের প্রধন কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মধ্য এশিয়ার চিত্রশিল্পী বিহ্যাদকে (১৪৬০-১৫৩৫) আলোচনায় উপজীব্য করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আলী আহসানের মতে, বিহ্যাদের শিল্পকর্মে রঙের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যকে তুলনা করা যায় ফরাসি শিল্পী অঁরি মাতিস-এর রং ব্যবহারের সঙ্গে। বিহ্যাদের চিত্রকর্ম রেখার যথার্থ পরিমাপ্গত ব্যবহারে, অলংকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চাতুর্যে, মনুষ্য মূর্তির অবস্থানগত নাটকীয় ব্যঞ্জনায়, লিপিশিল্পের মাধুর্যে অসাধারণ শিল্পদক্ষতার পরিচয় বহন করে।

আধুনিক চিত্রশিল্পী পল ক্লি (১৮৭৯-১৯৪০) সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান আলোচনা করেছেন 'পল ক্লি' প্রবন্ধে। তাঁর মতে পল ক্লি আধুনিক চিত্রকলায় ভিন্ন মাত্রার ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত। তিনি এমন এক একক ব্যক্তিসত্তা যা এক প্রকার নিজস্বতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি অতুলনীয় এবং একক কিন্তু কোনক্রমেই নির্বাসিত চৈতন্যের নিমজ্জমান প্রতিভা নন।

'কিউবিজম এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান কিউবিস্ট শিল্প আন্দোলন সম্পর্ক বিশদ তথ্য উপস্থাপন এবং আধ্নিক শিল্পকলায় কিউবিজমের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। পাশ্চাত্য জগতে ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে কিউবিস্ট শিল্প আন্দোলনের জন্ম হয়। প্রথাগত শিল্পধারাকে প্রতিহত করে একটি প্রবল বিরুদ্ধতাকে এ শিল্প প্রক্রিয়ায় রূপ দেওয়া হয়।

সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থাপনায় যে অস্থিরতা ছিল এবং বিকার ছিল তা থেকে বেরিয়ে আসতে সে সময়ের চিত্রশিল্পীদের প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ইউরোপে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে শিল্পীরা নতুন পথের সন্ধান করছিলেন। শিল্পীরা অনুসন্ধান করছিলেন জীবনের একটি নতুন শৃঙ্খলা যার সঙ্গে পুরাতন বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রেক্ষাপটে শিল্প আন্দোলনে কিউবিজমের জন্ম। পিকাসো, কান্দিনস্কি, ভাডিম দেলোনে (১৯৪৭-৮৩) ও পল গগ্যাঁ (১৮৪৮–১৯০৩) কিউবিজম শিল্প আন্দোলনে পুরোধা শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বিশ শতকের চিত্রকলার ইতিহাসে কিউবিস্ট শিল্প আন্দোলনই এককভাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কাজ করেছে। শিক্ষাগত বুদ্ধি, যুক্তি এবং জ্ঞানের এমন পরিশীলিত প্রকাশ অন্য কোনও শিল্পভঙ্গির মাধ্যমে সে সময়ে সুস্পষ্ট হয়নি। তাই অনুকরণের সর্বপ্রকার নির্ণেয়তাকে অস্বীকার করে শিল্পীরা 'কিউবিজম' শিল্পকর্মকে একটি নতুন প্রতীকী ভাষা দিলেন।

'পিকাসো' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান স্প্যানিশ শিল্পী পিকাসোর জীবন এবং শিল্পদর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। পিকাসো আধুনিক চিত্রশিল্পে বিমিশ্র বা কম্পোজিট আকৃতির স্রষ্টা। বিমিশ্র আকৃতি হচ্ছে স্বাভাবিক আকৃতিকে বিচূর্ণ করে সেখানে একটি আশ্চর্য অযৌক্তিকতায় শরীরী অংশগুলো নতুনভাবে সাজানো হয়। আলী আহসান পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা'কে বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর এ মূল্যায়ন যে অতিরঞ্জিত নয় এ কথা বলাই বাহুল্য।

'স্থাপত্যশিল্প' ও 'ভাস্কর্য' প্রবন্ধ দুটোতে সৈয়দ আলী আহসান স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্পের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত এখানে তিনি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎস নির্ণয়ে সমাজ প্রেক্ষিতকে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, অন্যান্য শিল্পের মত স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্য নির্মাণে শিল্পনির্মাতার মানসলোকের অনুভূতি ও কল্পনার অনিবার্য প্রতিফলন দেখা যায়। শিল্পকলার অন্যান্য বিষয়ের মত স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্কর্যশিল্পের বিকাশ ঘটে গ্রিক যুগে। প্রাচীন গ্রিসের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পে সারা বিশ্বের মানুষের গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

'শিল্পচিন্তা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। ১৮৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাচ্য শিল্পকলার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পকলার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ সময়ে পাশ্চাত্য শিল্পীরা প্রাচ্যের শিল্পকর্মের কম্পোজিশন, ডিজাইন, টোনাল রিলেশনশিপ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত হন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের শিল্পকৌশলের ব্যবস্থাপনা প্রাচ্যশিল্পীরা মর্মগতভাবে গ্রহণ করেন। প্রাবন্ধিকের মতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের ব্যবধানটা হচ্ছে: যেখানে ইউরোপের শিল্পী একটি সময়ের এবং একটি দৃষ্টির নিরীক্ষণকে উৎসাহের সঙ্গে সুস্পষ্ট করেন সেখানে প্রাচ্যের শিল্পী নির্দিষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্যতাকে অস্বীকার করে সকল দৃষ্টির একটি প্রতীকগত রূপ-ব্যঞ্জনা নির্মাণ করতে চান।

সৈয়দ আলী আহসানের 'আধুনিক শিল্পকলা: স্যুররিয়ালিজম' প্রবন্ধে স্যুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদী শিল্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। 'স্যুররিয়ালিজম' শব্দটি শিল্পের জগতে প্রথম পরিচিত করান ফরাসি কবি লুই অ্যাপোলিনিয়র (১৮৮০-১৯১৮) তাঁর রচিত একটি নাটকের মাধ্যমে, ১৯১৭ সালে। তবে চিত্রকলায় 'স্যুররিয়ালিজম' প্রভাব বিস্তার করে ১৯২৪ সাল থেকে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য চিত্রকলার ইতিহাসে জোয়ান মিরো (১৮৯৩-১৯৮৩), মার্ক শাগাল এঁরা পরাবাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

'আধুনিক শিল্পকলা: ভাষার ব্যবহার' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান এক নতুন ধরনের শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। এ ধরনের শিল্পকলাকে তিনি 'বর্ণসংকর শিল্প' নামে অভিহিত করেন। এই শিল্পপদ্ধতি স্থাপত্যের নির্মিতি, ভাস্কর্যের গঠন এবং চিত্রকলার রং ও রেখার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

'আধুনিক জার্মান শিল্পকলা' প্রবন্ধটিতে জার্মানির শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে জার্মান শিল্পকলার মানস প্রেক্ষাপট তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। ফরাসি শিল্পকলা এক সময় জার্মানির শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছিল। এর ক্রমবিবর্তনেই জার্মান চিত্রকলায় 'অভিব্যক্তিবাদী শিল্প আন্দোলনের' বিকাশ ঘটে। জার্মান শিল্পজগতে আধুনিক চিন্তাধারার প্রকাশ হচ্ছে *জরস্টুর্ম পত্রিকা*। জার্মানির চিত্রশিল্পীরা আধুনিক কালের জীবন-জগতের দ্বন্দ্ব, সমস্যা এবং সংশয়ের প্রতীক হিসেবে তাঁদের শিল্পকে গড়ে তুলেছিলেন। একটি বিব্রত এবং বিক্ষিপ্ত সময়ের অনুচেতনা এঁদের শিল্পকে জটিল অভিব্যক্তির রূপকল্প করেছে।

'ভাববাদী শিল্প এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক শিল্পকলা' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক শিল্পকলা নিয়ে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪০ সালে এডলফ হিটলার যখন ফ্রান্স আক্রমণ করেন তখন আধুনিক শিল্পের উৎস ভূমি প্যারিসের শিল্পীরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হন। ফলে তখন থেকে এই শহর একটি নতুন ধারার 'বিমূর্ত শিল্পধারা'র কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরিণতিতে ১৯৭০ সালে নিউইয়র্কে 'কনসেপচুয়াল' বা 'আইডিয়া আর্ট'[৩] নামে শিল্পের একটি নতুন ধারা জন্মলাভ করে। নতুন শিল্পচেতনা 'আইডিয়া আর্টে'র দৃশ্যমান রূপ হচ্ছে যে, এখানে শব্দ, সংখ্যা, বর্ণলিপি, রং এবং প্রতীক সবকিছুকে এক অবস্থানে অথবা একসঙ্গে ব্যবহারের প্রচেষ্টা করা হয়।

'চীন এবং জাপানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি' সৈয়দ আলী আহসানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধ। এখানে লেখক প্রাচ্যের দুটি দেশের শিল্পকলার অন্তর বৈশিষ্ট্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রবন্ধে গ্রিক এবং ইউরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে চীন ও জাপানি শিল্পরীতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। চীন এবং জাপানের শিল্পকলা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের বিমুগ্ধ উচ্চারণ: 'চীন এবং জাপানের শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব স্বভাবকে বিনম্র ও মধুর করা। হৃদয়কে উপলব্ধির তাৎপর্যে কুশলী করা এবং উচ্চ ও গভীর চিন্তায় মনকে প্রশান্ত করা। একটি চিত্র দর্শন হচ্ছে একটি মুহূর্তকে শান্ত, স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা' (২০০৪: ৬৬)।

'ইসলামী শিল্পকলা' এবং পরিশিষ্টে সংযুক্ত 'শিল্পকলা এবং ইসলাম' প্রবন্ধ দুটো এ গ্রন্থের অলোকপ্রয়াসী রচনা। প্রবন্ধদ্বয়ে লেখক শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। উল্লেখ্য, 'জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্ত্তিগড়া, অথবা ঐরূপ ছবি বা মূর্ত্তি ব্যবহার করা, এছলামের বিধান অনুসারে সিদ্ধ কি না, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে মোছলেম জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে' (খাঁ, ১৩৪৫: ৮৯)। এ বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত হচ্ছে, ইসলাম শিল্পকলার প্রতিবন্ধক নয়। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেখানে চিত্রকলা বা ভাস্কর্য পৌত্তলিকতায় সহায়ক ও উদ্‌বুদ্ধকারী এবং গৌণভাবে হলেও আরাধনা-বিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেখানে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মে অপরাধ। তাঁর মতে, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আরও একটি কারণে চিত্রকলা বা ভাস্কর্য নিষিদ্ধ হতে পারে; যখন চিত্রকর আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণ করে আল্লাহকে স্পর্ধা করে। ইসলামে চিত্রকলা সম্পর্কে এ বিশ্লেষণ সৈয়দ আলী আহসানের সাহসী এবং প্রগতিপন্থি মনোভাবের পরিচায়ক এতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত মোহাম্মদ আকরম খাঁর (১৮৬৮–১৯৬৯) 'সমস্যা ও সমাধান' (১৩৪৫) গ্রন্থের কথা

উল্লেখ করা যায়, যেখানে চিত্রকলা বিষয়ে ইসলামের উদার মনোভঙ্গির বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'ভারতীয় শিল্পকলা-১' ও 'ভারতীয় শিল্পকলা-২' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান ভারতের চিত্রকলা, স্থাপত্য, প্রাচীন গুহাচিত্র, মন্দির এবং ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাঁর আলোচনায় একে একে উঠে এসেছেন ভারতীয় চিত্রকলার কয়েকজন দিকপাল চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬), গণেশ পাইন (১৯৩৭-২০১৩), শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন (১৯১৫-২০১১) প্রমুখ। আলী আহসান ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে ধর্মের নিবিড় সম্পর্কের কথাও পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় শিল্পকলায় জার্মান অভিব্যক্তিবাদের গভীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভারতের শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেছেন: 'ভারতীয় শিল্পীরা নতুন নতুন ভঙ্গি আবিষ্কার করছেন তাদের শিল্প প্রয়াসে। ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে একটি আধুনিকতার সংজ্ঞা তাঁরা দেবার চেষ্টা করছেন। একটি বিরাট দেশে বিপুল জনসমষ্টির যে বিচিত্র স্বরগ্রাম শিল্পীরা তা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন' (২০০৪: ১৯৮)।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'অপ্রধান শিল্প' ও 'বাংলাদেশের শিল্পকলা' নামে আরও দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। 'অপ্রধান শিল্প' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান মূলধারার বাইরের শিল্পকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। মানুষের প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী যখন শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেগুলোকে 'অপ্রধান শিল্প' বলা হয়। অপ্রধান শিল্পের একদিকে থাকে মানুষের জাগতিক চাহিদা আবার তাতে সৌন্দর্যের সমর্থনও থাকতে হয়। ইংরেজিতে অপ্রধান শিল্পকে 'functional art' নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন গ্রিসে এবং চীন ও জাপানে মাটির পাত্র, ফুলদানি, দোয়াত এবং কলমদানি এগুলোকে অসাধারণ শিল্পমন্ডিত করে তৈরি করা হত। এগুলো যেমন মানুষের নিত্য প্রয়োজন সিদ্ধ করত আবার অন্যদিকে শিল্পের আধার হিসেবেও বিবেচিত হত। এদিক থেকে বাংলাদেশের পোড়ামাটির কাজকে অপ্রধান শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

'বাংলাদেশের চিত্রকলা' প্রবন্ধটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাংলাদেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পর্যালোচনা রয়েছে। বাংলাদেশের চিত্রকলা একদিকে যেমন মোগল চিত্ররীতি, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কলা পদ্ধতি এবং ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত তেমনই তা কখনও কখনও চীনা বা জাপানি শিল্প-কৌশলেও সমৃদ্ধ হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের চিত্রকর্মে লোকজ ধারা নামে একটি শিল্প-প্রকৌশল প্রবহমান রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের যে মৌলিক ভিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) নির্মাণ করেছিলেন, এঁদের উত্তরসূরি রূপে শিল্পী জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-৭৬) আমাদের চিত্রশিল্পে নতুন শিল্পভঙ্গির জন্ম দিয়েছেন। বাংলাদেশের চিত্রকলাকে সৈয়দ আলী আহসান মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

> আমাদের দেশে শিল্পচর্চার সূত্রপাতে ১৯৪৮ সালে মরহুম জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্প সম্ভাবনার দ্বার প্রথম উন্মুক্ত করেছিল। তাঁর সমর্থনে, উৎসাহ, ধৈর্য এবং ক্ষমতায় এখানকার শিল্পসত্তা শুধু যে উন্মোচিত হয় তাই নয় নব নব প্রক্রিয়ায় বিচিত্র পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আধুনিকতার মুক্তাঙ্গনে এসে উপনীত হয়েছে (২০০৪: ২৩৫)।

সংগতকারণে বাংলাদেশের চিত্রকলা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের এ মূল্যায়ন যথাযথ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ গ্রন্থটি সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পকলা-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ। এটি ২০০২ সালে বইপত্র প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের স্বভাব ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকলা দর্শক চিত্তে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দের উপলব্ধিকে প্রকাশ করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত সৈয়দ আলী আহসান এ গ্রন্থে পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার শিল্পকলা চর্চাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে পাশ্চাত্য জগৎ এবং ভূমধ্যসাগরীয় ও প্রাচ্য ভুবন তাঁর শিল্পগত বিচারের অধিক্ষেত্র ছিল।

শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ গ্রন্থে ভূমিকা অংশসহ মোট তেইশটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে: ১. ভমিকা; ২. আদিম মানুষের শিল্প-সুকৃতি; ৩. প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা; ৪. প্রাচীন গ্রিসের শিল্প সাধনা; ৫. প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার শিল্প নিদর্শন; ৬. প্রাচীন রোমক স্থাপত্য; ৭. প্রাচীন ক্রীট সভ্যতার শিল্প সম্ভার; ৮. সিন্ধু সভ্যতা: মহেনঞ্জোদারোর নগর নির্মাণ পরিকল্পনা; ৯. ইসলামী শিল্পকলা: ভূমিকা-১; ১০. ইসলামী শিল্পকলা: ভূমিকা-২; ১১. ইসলামী শিল্পকলা: আরবী হস্তলিখন শিল্প; ১২. ইসলামী শিল্পকলা: স্থাপত্য; ১৩. রেনেসাঁ পূর্ব গথিক শিল্প; ১৪. ইউরোপে রেনেসাঁ যুগ: ভূমিকা; ১৫. রেনেসাঁ যুগের শিল্পকলা: মাইকেল এঞ্জেলো; ১৬. রেনেসাঁ যুগের শিল্প: লিওনার্দো দা ভিঞ্চি; ১৭. চীন এবং জাপানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি; ২০. আধুনিক শিল্পকলায় আন্দোলন: অভিব্যক্তিবাদ; ২১. শিল্প-চিন্তা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; ২২. প্রাচীন পারস্যের শিল্প ঐতিহ্য: ইসলামী শিল্পকলা; ২৩. বিমূর্ত শিল্পকর্ম। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আলী আহসানের পূর্ববর্তী রচনা *শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য* গ্রন্থের 'বিমূর্ত শিল্পকর্ম', 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি', 'মাইকেল এঞ্জেলো', 'শিল্পচিন্তা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধগুলো আলোচ্য গ্রন্থ *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ*-তেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে তিনি 'বিমূর্ত শিল্পকর্ম' ও 'শিল্প চিন্তা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ দুটো ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে বিস্তর সম্প্রসারণ করেছেন। এর ফলে প্রবন্ধগুলো আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ* গ্রন্থের 'আদিম মানুষের শিল্প সুকৃতি' প্রবন্ধটির বক্তব্য পূর্ববর্তী গ্রন্থ *শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য*'র 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্প চৈতন্য' প্রবন্ধের বক্তব্য প্রায় একই রকম। তাই প্রবন্ধটি এখানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়নি।

শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ গ্রন্থের 'ভমিকা' অংশে প্রাবন্ধিক সৈয়দ আলী আহসান শিল্প, শিল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা যায়, তাঁর এ আলোচনা দার্শনিক মননে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া ভূমিকা অংশে শিল্পক্ষেত্রে প্রতিবর্ণীকরণ, স্পেস বা পরিসরের গুরুত্ব, রং, রেখা এবং বর্ণবিভা সম্পর্কে পর্যালোচনা রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের 'প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা' প্রবন্ধে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়রা ধর্মীয় অনুষঙ্গে শিল্পের চর্চা করত। তাদের ভাস্কর্যগুলো দেবার্চনার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা শিল্পচর্চায় অসাধারণ দীপ্তিমান, সমৃদ্ধ এবং কুশলী জাতি যাদের তুলনা একমাত্র তারা নিজেরাই।

'প্রাচীন গ্রীসের শিল্প সাধনা' প্রবন্ধে দেখা যায় গ্রিসের প্রাচীন শিল্পসৌকর্য প্রাবন্ধিক আলী আহসানকে আনন্দিত করেছে। কেননা গ্রিক স্থাপত্যের সুনিপুণতা, জ্যামিতিক বিন্যাস এবং নির্মাণ কৌশল বিস্ময়কর রূপে ধরা পড়েছে বিশ্ববাসীর নিকট। প্রাবন্ধিকের মতে, গ্রিক শিল্পসাধনা সৌন্দর্যের তন্ময়তায়, যুক্তির গভীরতা এবং বিদগ্ধতায় সকল যুগের মানুষের বিস্ময়ের আকর।

'প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার শিল্প নিদর্শন' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান মেসোপটেমিয়া সভ্যতার

শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক। সুমেরীয় সভ্যতাকে বিভিন্ন নগরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—নিনেভা সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ইত্যাদি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সুমেরীয় সভ্যতার দান হচ্ছে—নগর নির্মাণ, লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার, ধাতব দ্রব্য ব্যবহার এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ। প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান গ্রিক শিল্পকলার সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে সুমেরীয় সভ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> মিসরীয়দের কাছে ধর্ম বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারা তাদের স্থাপত্য নির্মাণ করেছিল আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে, জাগতিক প্রয়োজনে নয়। মেসোপটেমিয়রা দুর্গ নির্মাণ করেছিল, রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল এবং প্রাসাদের বিস্তার এবং অধিকারের জন্য নগর নির্মাণ করেছিল। এ সমস্ত কিছুই ছিল জাগতিক, আধ্যাত্মিক নয় (২০০২: ৫৮)।

'প্রাচীন রোমক স্থাপত্য' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান রোমক স্থাপত্যকলার বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলকে অবলোকন করেছেন। বর্তমানকালে স্থাপত্যকে আমরা পরিসর বা স্পেসের শিল্প বলে থাকি। প্রাবন্ধিকের মতে অভ্যন্তরীণ পরিসর এবং বহিরঙ্গাগত পরিসরের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বর্তমানে অট্টালিকা নির্মাণের যে কৌশল গড়ে উঠেছে তার উদ্ভাবন ঘটেছিল রোমক যুগে।

'প্রাচীন ক্রীট সভ্যতার শিল্প সম্ভার' প্রবন্ধে আলী আহসান ক্রিট দ্বীপের শিল্পচর্চায় সেখানকার দর্শন, জীবন-চৈতন্য এবং সভ্যতার প্রভাবের কথা বলেছেন। ক্রিটের অধিবাসীরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ক্রিট সভ্যতাকে মিনোয়ান সভ্যতা বলেও অভিহিত করা হয়। এই সময়ে মিনোয়ান সভ্যতাকে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পের মানদণ্ড হিসেবে মনে করা হত। মিনোয়ান সভ্যতা ছিল দেবতাদের সভ্যতা।

'সিন্ধু সভ্যতা: মোহেনজোদারোর নগর নির্মাণ পরিকল্পনা' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। সিন্ধু সভ্যতা মূলত নগর সভ্যতা। প্রাচীন ভারতের মানুষেরা সিন্ধু নদকে ঘিরে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ সালে 'মোহেনজোদারো' এবং 'হরপ্পা' নামে দুটি সুপরিকল্পিত নগর গড়ে তুলেছিল। লেখকের মতে প্রাচীন সমস্ত সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র সিন্ধু অববাহিকার মহেনজোদারোর নগর পরিকল্পনা অনন্য সাধারণ। কেননা, প্রাচীন পৃথিবীতে একটি জাতির আদিম সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিক জীবন গড়ে তোলা তার উন্নত সভ্যতারই পরিচায়ক।

সৈয়দ আলী আহসানের 'ইসলামী শিল্পকলা: ভূমিকা-১', 'ইসলামী শিল্পকলা: ভূমিকা-২', 'ইসলামী শিল্পকলা: আরবি হস্ত লিখন শিল্প', 'ইসলামী শিল্পকলা: স্থাপত্য' প্রবন্ধ চারটি মূলগতভাবে প্রায় একই চেতনার আলোকে রচিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর মৌল বিষয় হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পকলা চর্চা। উল্লেখ্য, সৈয়দ আলী আহসান *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* গ্রন্থে ইসলামি শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করলেও বর্তমান গ্রন্থে এ আলোচনা আরও বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ* গ্রন্থে আরবি হস্তলিপি এবং স্থাপত্যকলা বিষয়ে আলোচনা আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধগুলোতে প্রাবন্ধিক সৈয়দ আলী আহসান বলতে চেয়েছেন যে, ইসলাম কখনও শিল্পচর্চার বিরুদ্ধতা করেনি। বরঞ্চ পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে ইসলাম একটি নতুন অভিব্যক্তি এনেছিল। ইসলামি শিল্পকলা যেমন অ্যাসিরীয় সভ্যতা, সামানীয় এবং পারসিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ঠিক তেমনই আধুনিক ইউরোপে বিমূর্ত শিল্পকলার উদ্ভবে প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছিল। ইসলামি শিল্পকলা বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেন: 'রঙে এবং রেখায় এবং উৎকীর্ণতায় ইসলামী শিল্পকলা একটি অনন্য সাধারণ স্বাক্ষর রেখেছে। ইসলাম শিল্পকলাকে

মর্যাদাবান করেছে, সমৃদ্ধমান করেছে এবং আনন্দলোকের লীলাভূমি করেছে' (২০০২: ৮৩)।

'রেনেসাঁ-পূর্ব গথিক শিল্প' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পকলা আলোচনার সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। গথিক শিল্পের মূল উৎস ফরাসি দেশে এবং ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে এ শিল্পের প্রথম বিকাশ ঘটে। গথিক শিল্পকলার বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি একক অনুধ্যান অনুভূত হয়। বিশ্বপ্রভু এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু অজস্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি একটি বৈচিত্র্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাই দেখা যায় গথিক শিল্পীরাও তেমনই তাদের শিল্পকলায় বিচিত্র রূপ বিকাশের সাহায্যে বিধাতার একটি একত্ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

'ইউরোপে রেনেসাঁ যুগ: ভূমিকা' প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান রেনেসাঁ যুগে ইউরোপের শিল্পবৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। রেনেসাঁ যুগের শিল্পীরা চেয়েছেন বাস্তবে মানুষ যেমন ত্রিমাত্রিকতায় প্রকাশিত হয় এবং সে গতিমান, ঠিক তেমনই শিল্পকর্মেও মানুষকে বাস্তব প্রকৃতিসহ উপস্থিত করতে হবে। এ যুগের শিল্পীদের অপর একটি কৌশল হচ্ছে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক গণনায় পরিপ্রেক্ষিতকে নির্মাণ। এভাবে ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের শিল্পসাধনা গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং অন্বেষার পরিচয় বহন করেছে।

'বুদ্ধ-মূর্তির রূপকল্প' *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ* গ্রন্থটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আলী আহসানের শিল্পপ্রজ্ঞার সঙ্গে বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিকের মতে গৌতম বুদ্ধের মূর্তিকে বৌদ্ধ ধর্মদর্শন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই কালের পরিক্রমায় বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে বুদ্ধ-মূর্তিগুলো গড়ে উঠেছে। এভাবে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ 'গান্ধার' শিল্পে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ-মূর্তির সৌন্দর্যে অবগাহন করে প্রাবন্ধিক সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করেন: 'প্রজ্ঞাবান পুরুষ হিসেবে গৌতম বুদ্ধ যেমন জীবনে বিস্ময়কর প্রভায় আবৃত ছিলেন, তেমনই শিল্প সত্তায়ও তিনি চিরবরণীয় হয়ে আছেন' (আহসান, ২০০২: ১২৯)।

'আধুনিক শিল্পকলার রূপকল্প' প্রবন্ধটিতে সৈয়দ আলী আহসান আধুনিক শিল্পের বিবর্তন তুলে ধরেছেন। এখানে আধুনিক শিল্পকলার জনক সেজাঁ থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার সাম্প্রতিক 'আইডিয়া আর্ট' পর্যন্ত আলোচনা সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্প-আন্দোলন[৪], ফভবাদ[৫], কিউবিজম শিল্পধারা[৬], কানদিনস্কির বিমূর্ত শিল্প[৭], হাইব্রিড শিল্প[৮] ও এর বিকাশ, বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য এবং সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'আধুনিক শিল্পকলায় আন্দোলন: অভিব্যক্তিবাদ' প্রবন্ধটি অভিব্যক্তিবাদী শিল্প আন্দোলনের পর্যালোচনা। আলী আহসানের মতে 'অভিব্যক্তিবাদ' আধুনিক শিল্পজগতের একটি জীবনবাদী দর্শন। ফরাসিরা যেখানে যান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিকবোধে শিল্পের কলা-নিপুণতা নির্মাণ করেছেন, জার্মানরা সেখানে ধর্মবোধ, মরমিবাদ এবং বাস্তব অতিক্রান্ত সভ্যতাকে আবিষ্কারের চেষ্টায় শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করেছেন। অভিব্যক্তিবাদী আন্দোলন শিল্প আন্দোলন হয়েও মূলত এটা ছিল প্রজ্ঞার আন্দোলন এবং দার্শনিক আন্দোলন।

'প্রাচীন পারস্যের শিল্প ঐতিহ্য: ইসলামী শিল্পকলা' প্রবন্ধে ইরানের ইসলামি স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি শিল্পকলার মধ্যে ইরানের স্থাপত্য কলায়-ই সৈয়দ আলী আহসানের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হয়েছে। ইরান সর্বদা চেষ্টা করেছে তাঁর নির্মাণকর্মে জাতীয় স্বকীয়তা প্রস্ফুটিত করতে। প্রাবন্ধিকের মতে ইরানি মসজিদের স্থাপত্যকর্ম এবং মিশরের অলংকরণ বিশেষ করে ইস্পাহান লালিত্য, মাধুর্যে এবং মহার্ঘতায় একটি চিরকালীনতার স্বাক্ষর

রেখেছে যা অতুলনীয় এবং অনন্য সাধারণ।

জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পকলা-বিষয়ক তৃতীয় এবং সর্বশেষ গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর ২০০৬ সালে। দ্বি-ভাষিক গ্রন্থটি বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশ করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। *জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকম* গ্রন্থটি উপসংহারসহ মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে জয়নুল-চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। গ্রন্থটি রচনায় লেখকের বক্তব্য—

> আমি মূলত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত তাঁর চিত্রাবলী, দুমকার স্কেচ বই, ময়মনসিংহে আবেদিন চিত্রশালা দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছি। আবেদিনের শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যামিনী রায় এবং উপমহাদেশীয় বিখ্যাত শিল্পরসিক প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আমার যে পরিচয় ছিল তার স্মৃতির উপর ভিত্তি করেই আমার নিজস্ব শিল্পবোধের জন্ম। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্ম দেখে এবং শিল্পসংক্রান্ত পরিচর্যায় ব্যাপৃত থেকে আমি শিল্প বিবেচনা নির্মাণ করেছি (আহসান, ২০০৬: ৬২)।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন আবহমান বাংলার চিরায়ত ভাষ্যকার। তিনি আজীবন গ্রামলগ্ন। এছাড়া শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অসাধারণ। ফলে তিনি গ্রামের বিভিন্ন বস্তুর রেখাঙ্কনগুলো লক্ষ করেছেন অনুপুঙ্খভাবে। এভাবে জয়নুল আবেদিন তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিতে যে রূপকল্প নির্মাণ করেছেন সেগুলো এক ধরনের আদর্শ স্বরূপতা বা আইডিয়ালাইজেশন নির্মাণ করেছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আধুনিক ভারতীয় শিল্পভূমিতে এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ১৮৫৪ সালে যখন কলকাতা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে ইউরোপীয় চিত্রকলার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯১৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোকে ভিত্তি করে একটি ভিন্ন ধারার শিল্পচর্চার জন্ম দেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল বসু এ সময়ে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে নিজস্ব শিল্পসত্তাকে আবিষ্কার করেন। এর অনেক পরে এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন শিল্পী যামিনী রায়। মূলত এ ত্রয়ীর মেলবন্ধনেই নির্মিত হয় বাংলাদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্যবাহী ধারা। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের স্বকীয় জীবনবোধের উৎস ছিল এখানে। প্রাবন্ধিক আলী আহসানের ভাষায়: 'জয়নুল আবেদিন থেকেই চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের স্বকীয়তা সমুপস্থিত এবং সমুচ্চারিত। কলকাতা শিল্পধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কলারীতির সমর্থন নিয়েই ১৯৪৭ সালে আমাদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির অভিযাত্রা' (২০০৬: ৩১)।

সৈয়দ আলী আহসান জয়নুল আবেদিনকে চিরকালীন শিল্পী হিসেবে অবলোকন করেছেন। জয়নুল একটি নব নির্মিতির কৌশলে তাঁর চিত্রকর্মে চিরায়ত আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আঁকা পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষের স্কেচসমূহের কথা বলা যায়। জয়নুলের অঙ্কিত দুর্ভিক্ষের চিত্রগুলো সমসাময়িককালে সংবেদন সৃষ্টি করলেও এতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি। *জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম* গ্রন্থটিতে সৈয়দ আলী আহসান শিল্পী জয়নুলের মানসলোককে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে জয়নুল আবেদিনের শিল্পস্বভাব। আলী আহসানের ভাষায়: 'এক কথায় বলা যায় বিদেশের আধুনিক শিল্পকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্ণ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তিনি দেখেছেন অনেক এবং অভিভূত হয়েছেন কিন্তু কখনওই প্রভাবিত হননি' (২০০৬: ৩১)।

জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের শিল্পজগতে বলিষ্ঠ কর্মী পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। শিল্পকলার প্রসারে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠায় এই মহৎ শিল্পীর অবদান রয়েছে।

জয়নুল আবেদিনের মৌলিক প্রেরণা ছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। তাই দেখা যায় শিল্পী নন্দলালের মানুষ এবং প্রকৃতি যেমন ছিল বাঁকুড়া আর বীরভূম অঞ্চলের তেমনই জয়নুলের মানুষ এবং প্রকৃতি ছিল নদীমার্তৃক বাংলাদেশের। জয়নুল আবেদিনের লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জীবনধারার প্রক্রিয়াকে প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে বলা যায় অসাধারণ।

সৈয়দ আলী আহসান শিল্পকর্মের ইতিহাসগত প্রেক্ষাপটে জয়নুলের শিল্পকর্মকে তুলনা করেছেন ইউরোপীয় শিল্পাদর্শের সঙ্গে। প্রসঙ্গত তিনি শিল্পী পাবলো পিকাসোর চিনামাটির পাত্রে অঙ্কিত চিত্রকর্মগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। পিকাসো এ চিত্রগুলোতে একটি সংঘর্ষের চিরকালীন সত্তাকে জাগ্রত করেছেন। অন্যদিকে শিল্পী জয়নুল তাঁর গ্রামীণ আবহের চিত্রগুলোতে গ্রামীণ মানুষের গতিবেগকে রেখায় চিত্রিত করেছেন। অতঃপর আলী আহসান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

> জয়নুল আবেদীন তাঁর দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। এ ভালবাসায় কখনও প্রকৃতি এসেছে, কখনও মানুষ এসেছে এবং কখনও মানুষের বিবিধ কর্মকান্ডের ধারা প্রবাহ এসেছে। ... জীবনকে এই সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং সাধারণ মৃত্তিকা ও জল প্রবাহের মধ্যে আবিষ্কার করে জয়নুল আবেদিন আমাদের দেশের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চিত্রাবলীতে আমাদের দেশ এবং দেশের মানুষকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন (২০০৬: ৫৯)।

বলা যায়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম ও শিল্পদর্শন সম্পর্কে এটিই মৌলিক এবং সবচেয়ে মূল্যবান পর্যালোচনা।

সৈয়দ আলী আহসান বাংলা ভাষার একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পতত্ত্ব গ্রন্থ রচয়িতা ও সমালোচক এবং মেধাবী শিল্পবিশ্লেষক। এ ছাড়া আলী আহসান বাংলাভাষায় শিল্পকলার বেশ কিছু পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন যা সাবলীলভাবে আত্মীকৃত হয়েছে (আইয়ুব, ১৯৮৫: ১৮৯)। তিনি শিল্পের অভিপ্রায়ের কথা, শিল্পে বিষয়বস্তুর কথা, শিল্পের রসবোধের কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পচৈতন্য বিষয়ে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর *প্রিফেসেস* এবং সৈয়দ আলী আহসানের *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* শিল্পবিচার ও ব্যাখ্যা এবং সাহিত্য ও শিল্পবোধের আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণে সমপর্যায়ভুক্ত গ্রন্থ (আইয়ুব, ১৯৮৫: ১৯০)। তবে সৈয়দ আলী আহসানের গ্রন্থটি আরও বেশি গুরুত্ব বহন করে একারণেও যে এটি বাংলা ভাষায় রচিত এবং এর মধ্যে বাংলা গদ্যের একটা প্রবল তৃপ্তিকর উৎকর্ষ পরিণতি লাভ করেছে।

সৈযদ আলী আহসানের শিল্প-সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলো আমাদের শিল্পচর্চার জগৎ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান করে। শিল্প বিষয়ে তাঁর চিন্তা, অনুভূতি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শিল্পকে সাধারণের ধরাছোঁয়ার পরিসীমায় এনে দেয় ও শিল্পবোধের দূরতিক্রম্যতার অপসারণে প্রভূতভাবে সাহায্য করে। সৈয়দ আলী আহসান কেবল সাহিত্যসমালোচক কিংবা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে দক্ষ ছিলেন না চিত্রশিল্প ও শিল্পীর সমঝদার হিসেবেও যে কত সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সফল ছিলেন এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর রচিত শিল্পবিষয়ক গ্রন্থগুলো।

পাদটীকা

১. ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত বৌদ্ধ গুহাশ্রেণি। এগুলো খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রি. অষ্টম শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। পাথর কেটে এইসব গুহা নির্মিত হয়। এই গুহাশ্রেণির খ্যাতি ও গুরুত্ব এর ফ্রেস্কো পেইন্টিংয়ের জন্য। ফ্রেস্কো প্রধানত আঁকা হয়েছিল বৌদ্ধজাতকের গল্প বর্ণনা করতে।

২. মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলার ২৮ কি.মি. উত্তরে ইলোরা মন্দির-গ্রাম অবস্থিত। এখানে প্রায় চৌত্রিশটি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রি. পঞ্চম হতে অষ্টম শতক পর্যন্ত ইলোরায় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মানুসারীদের মন্দির ও স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটে। হিন্দুদের কৈলাস মন্দির ইলোরার প্রসিদ্ধ স্থাপত্যকর্ম। এখানকার স্থাপত্যশিল্প ও মন্দির চিত্রকলা প্রাচীন ভারতের শিল্প-ঐতিহ্য।

৩. 'আইডিয়া আর্ট' শিল্পের এমন একটি প্রকরণ যেখানে ছোটো ব্যক্তিগত ধারণাগুলো বড়ো মতাদর্শ বা সাধারণ নান্দনিক উপাদান ও শৃঙ্খলাগত উদ্‌বেগের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। আইডিয়া আর্টের কাজ যে কোনও মাধ্যমে হতে পারে। এখানে শিল্পী কেবল একজন স্থপতি বা প্রকৌশলীর মতই কাজ করেন না, তাঁকে একজন কিউরেটর বা শিল্পলেখকের ভূমিকাও পালন করতে দেখা যায়।

৪. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া একটি শিল্প আন্দোলন। সমকালীন সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ইম্প্রেশনিজমের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করেছিল। এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা ছবিতে রং ও টোনকে সঠিকভাবে ব্যবহারে প্রয়াসী হন। বুদ্ধিদীপ্ত বিষয়ের অভাব এই শিল্পপ্রকরণের একটি ত্রুটি বলে মনে করা হয়। ফ্রান্সের বাইরেও ইমপ্রেশনিস্ট শিল্প আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে।

৫. 'ফভ' কথার অর্থ হল 'বন্যপশু'। 'ফভবাদ' বা 'ফভিজম'কে শিল্পকলার ইতিহাসে 'সহিংস বিপ্লব' বলা হয়। ফভিজম শিল্পকলায় পূর্বেকার রীতি, নিয়ম ও ঐতিহ্য থেকে শিল্পীদের মুক্ত করতে প্রয়াসী ছিল। রঙের স্বাধীন ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা ছিল ফভিস্ট শিল্পীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও শিল্পাদর্শ না থাকায় ফভিস্টদের কর্মকাণ্ড টিকেছিল ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত।

৬. ১৯০৭ সালে প্যারিসে কিউবিজম শিল্পধারার জন্ম। কিউবিজম সমকালীন ফ্রান্সের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অংশত স্থাপত্যকলাকে প্রভাবিত করেছিল। কিউবিজম বা ঘনকবাদ বিংশ শতাব্দীর আদি পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলন। এই শিল্প আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক উপস্থাপনা ভেঙে চিত্রকর্মের পৃষ্ঠতলে একসাথে বেশ কয়েকটি প্লেন ক্যাপচার করা। কিউবিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব পাবলো পিকাসোর 'দেমোয়াজেল' নামীয় চিত্রকলা থেকে।

৭. রুশ চিত্রশিল্পী ওয়াসিলি কান্দিনস্কিকে বিমূর্ত শিল্পের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। বিমূর্ত চিত্রকলা বাস্তব জগতের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই ধারার শিল্পীগণ চিত্রকলায় বাস্তব জগৎ সৃষ্টি করতে রঙ, রেখা, আকৃতি ও ফর্মের প্রয়োগ করেন। বিমূর্ত চিত্রকলা বাস্তব জগতের বিচারে অর্থহীন হলেও এর একটি ভিন্নতর নান্দনিক বোধ রয়েছে।

৮. 'হাইব্রিড আর্ট' সমকালীন বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলন, যেখানে শিল্পীরা বিজ্ঞান ও অগ্রসরমান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের নিকট চিত্রকলা গবেষণার একটি স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়। 'হাইব্রিড শিল্পী'গণ জীববিজ্ঞান, রোবোটিক্স, ভৌতবিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক ইন্টারফেস প্রযুক্তি (যেমন: অঙ্গভঙ্গি), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্য ভিজ্যুয়ালাইজেশন নিয়ে কাজ করেন।

সূত্রনির্দেশ

খাঁ, মোহাম্মদ আকরম (১৩৪৫), *সমস্যা ও সমাধান*, কলিকাতা: মোহাম্মদী বুক এজেন্সী;

আহসান, সৈয়দ আলী (১৯৮৩), *সতত স্বাগত*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড;

আইয়ুব, সালাউদ্দিন (১৯৮৫), 'অমোঘ প্রস্বর: সৈয়দ আলী আহসান', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও মাহমুদ শাহ কোরেশী (সম্পা.) *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ*, ঢাকা: সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা সমিতি;

আহসান, সৈয়দ আলী (২০০২), *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ*, ঢাকা: বইপত্র;
আহসান, সৈয়দ আলী (২০০৪), *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি;
আহসান, সৈয়দ আলী (২০০৬), *জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

ISSN 2707-9201

জীবন আমার বোন: বিচ্ছিন্ন–বিচ্যুত ব্যক্তিমানসের রূপকল্প

হোসনে আরা কামালী*

সারসংক্ষেপ: একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যে কটি শিল্পসফল উপন্যাস রচিত হয়েছে মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) রচিত *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬) তার মধ্যে প্রধান একটি। কথাসাহিত্যিকের জীবনদর্শন ও জীবন নিরীক্ষার মানদণ্ডে *জীবন আমার বোন* সমসাময়িক মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ বিস্তৃত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু উপন্যাসে যুদ্ধের পটভূমি ও পর্যবেক্ষণ রূপায়ণের চাইতে মাহমুদুল হক সময়ের মূল স্রোতের বাইরে থাকা ব্যক্তি খোকার বিচ্ছিন্নতা, বিচ্যুতি ও নৈসঃঙ্গ নির্মাণের দিকে মনোযোগী হয়েছেন। যার জন্য খোকা সময়কে নির্মাণ করতে পারে না। সমষ্টির অংশ হতে পারে না। ইতিহাসে খোকার কোনও স্থান নেই। কারণ সে বীর নয়। সে নিস্পৃহ, ভীরু কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী নয়। খোকার যে জীবন সেটাও যেন তার নিজের নয়! জীবনের সকল অমঙ্গল তাড়ানিয়া বোন রঞ্জুর দেওয়া উপহার খোকার এ জীবন। উপন্যাসে রঞ্জু মহান ইতিহাসের অংশ হলেও সে ইতিহাসেই খোকাকে প্রথম মুখ লুকাতে হয়েছে। নব্য ধনিক শ্রেণির উদ্ভব, ভোগবাদ, লোভ, হঠকারিতায় সমাজ-মানসের পচন আর তাতে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিকতা, যৌনতা ইত্যাদি *জীবন আমার বোন* উপন্যাসটিকে স্বাধীনতা উন্মুখ বাংলাদেশের একটি অসহায় চালচিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়। আবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে মানুষের জীবনের ধরনকে আমূল বদলে দিতে পারে মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ চরিত্রচিত্রণ তার সফল প্রয়াস। স্বল্পপরিসর চরিত্র হয়েও মুরাদ, নুরুদ্দিন, গঞ্জালেশকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে সমান্তরালভাবে নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন কথাশিল্পী মাহমুদুল হক। খোকার জীবনগল্প, কথাকারের দর্শন ও শৈলী প্রবণতার নির্মোহ বিশ্লেষণই আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য।

চাবিশব্দ: একাত্তর; খোকা; বিচ্ছিন্ন; বোন; উন্মূল; আত্মকেন্দ্রিক।

জীবন আমার বোন মাহমুদুল হকের সর্বাধিক আলোচিত উপন্যাস। উপন্যাসটি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে রচিত। ১৯৭৬ সালে গ্রন্থাকারে পাঠকের সামনে আসে। স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোর দীপ্যমান বিজয়ের উল্লাস সে সময়টিতে বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মনোজগৎকে প্রচণ্ডভাবে আবেগতাড়িত করে তোলে। সংগত কারণেই তাঁদের উপন্যাসের আবহ ও চরিত্রগুলো তখন মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করার চেষ্টায় নিমগ্ন হয়েছে। কিন্তু মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) তাঁর

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মদনমোহন কলেজ, সিলেট।

জীবন আমার বোন এই তৃতীয় উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের গোটা প্রেক্ষাপট নয়, বরং সংঘটিত ছোটো ছোটো ঢেউ নির্মাণে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। বড়ো বড়ো ঢেউ উতরোল উত্তাপে অনেক সময় জীবনের ছোটো ছোটো ঢেউ অলক্ষ্যে হারিয়ে যায়। নিরীক্ষাধর্মী কথাশিল্পী মাহমুদুল হক সেই দিকেই দিয়েছেন তাঁর অনন্য সফল দৃষ্টিপাত। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে মাহমুদুল হক *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র খোকাকে নির্মাণ করলেন সময়ের উলটোরথে। যে খোকা সময় নির্মাণে আগ্রহী নয় বরং সময়ের পঙ্কিল ঘূর্ণিবর্তে নিজেকে মেলাতে না পেরে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গই থেকে যায়। সমষ্টির চেতনাকে সে অস্বীকার করে। এ সব কিছু মিলিয়ে বাঙালি পাঠক যখন গ্রন্থটি হাতে পায় তখন ভিন্ন এক সুরের সঙ্গে পরিচিত হয়। ভিন্ন জীবনদৃষ্টির জন্য একটি অন্য ধরনের গল্প পাঠকের কাছে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে এবং মাহমুদুল হককে বিরলপ্রজ ঔপন্যাসিক হিসেবে *জীবন আমার বোন* বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়।

দুই.

উনিশ ও বিশশতকে বিশ্বসাহিত্যে যে দর্শন চর্চিত হচ্ছিল, তা ছিল বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭), আলবেয়ার কামু (১৯১৩-৬০), মিশেল ফুকো (১৯২৬-৮৪), সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) প্রমুখ প্রভাবজাত। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের ভাবশিষ্য ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। যাঁরা সাহিত্যে দুর্দান্তভাবে মানুষের জীবনের মনোদৈহিক রূপের সঙ্গে সঙ্গে কদর্য রূপেরও নির্মিতি দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে ষাটের দশকে যাঁরা কাব্য-কথার চর্চা করেছেন, তাঁরা তিরিশের ভাববৈশিষ্ট্যকেই আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। তা ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যে স্তাদাঁল (১৮৯৫-১৯৬১), ফিওদোর দস্তয়েবস্কি (১৮২১-১৮৮১), লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), হেরমান হেসে (১৮৭৭-১৯৬২), টমাস মান (১৮৭৫-৭৯৫৫), আমোস তুতুয়ালা (১৯২০-১৯৯৭), হোর্হে বোহেসের (১৮৯৯-১৯৮৬) কথাসাহিত্যে যেমন ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা আছে, মাহমুদুল হকের উপন্যাসেও তার পরিচয় স্পষ্ট। ব্যক্তির অন্তর্বাস্তবতাকে নির্মাণে তিনি ইউরোপীয় এক্সপ্রেশনিজমের অনুসারী হলেও তাঁর অস্তিত্ব ও শিল্পভাবনার শিকড় প্রোথিত বাংলার মাটি ও মানুষের গভীরে। তাই ঔপনিবেশিক তত্ত্বের বিচারে মাহমুদুল হককে বিচার করা সমুচিত নয়।

মাহমুদুল হক আকস্মিক সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেননি। কৈশোর থেকেই তিনি পড়াশোনা করতেন প্রচুর। একটা সময় আজিমপুর কলোনিকেন্দ্রিক তাঁদের একটি পড়ুয়া গ্রুপ ছিল। মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ (১৯৩৩-২০১৩), শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১), মীজানুর রহমান (১৯৩১-২০০৫), শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)-সহ অনেকের সঙ্গে মাহমুদুল হকের ছিল ভীষণ সখ্য। মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, শহীদ সাবের, মীজানুর রহমান এবং আবাল্যের বন্ধু শেখ আবদুর রহমান প্রত্যেকেই ছিলেন আলাদা ধরনের মানুষ। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মাহমুদুল হকের ঘনিষ্ঠজন। শহীদ সাবের ছিলেন বামঘেঁষা চিন্তা-চেতনার মানুষ, অন্যদিকে মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, বিনয়ী, সহিষ্ণু মীজানুর রহমান আর লোকবাংলার অন্যতম চেতনাবাহী ছিলেন শেখ আবদুর রহমান (চলচ্চিত্র সাংবাদিক)। বিবিধ রুচির ও পেশার এই সকল বন্ধুজন মাহমুদুল হকের জীবনে ছিলেন এক একটি স্তম্ভ। এঁদের প্রতি মাহমুদুল হকের দৃষ্টিপাত ছিল শ্রদ্ধার, ভ্রাতৃত্বের এবং বন্ধুত্বের। এঁরা কেউই উদ্ধত ও অসহিষ্ণু ছিলেন না। মাহমুদুল হকও বাংলা সাহিত্যে কথা বলেছেন নিচু স্বরে, ইশারায়। শহীদ সাবের ছাড়া বন্ধুদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বভাবে-সৌজন্যে নিখাঁদ সংসারী মানুষ। পরবর্তী সময়ে মাহমুদুল হকের আড্ডার সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন আহসান

উল্লাহ খান, রবিউল হুসাইন (১৯৪৩-২০১৯), মফিদুল হক (১৯৪৮) বিপ্রদাস বড়ুয়া (১৯৪০-) সহ আরও অনেকেই। সত্তর দশকের তরুণ কবিদের অনেকেই ছিলেন বিউটি বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা। ওখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল মাহমুদুল হকের। তাছাড়া তাঁরা রেক্সে আড্ডা দিতেন। তাঁদের এই আড্ডার কথাই উঠে এসেছে *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে। জীবনের প্রথমার্ধে যাঁদের সাহচর্য মাহমুদুল হক পেয়েছিলেন, তাঁরাই তাঁর মানস গঠনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। এই সময়ই মাহমুদুল হক নিজেকে তৈরি করেছেন। গল্প দিয়ে লেখালেখির কুরু যেমন হয়েছিল, তাঁর লেখার শেষ হয়েছে গল্প দিয়েই। ১৯৬৭-১৯৮০ সময় জুড়ে তিনি লিখেছেন উপন্যাস।

মাহমদুল হকের বেশির ভাগ উপন্যাস সত্তর দশকে লেখা। উপন্যাস লেখা কুরু করেছেন ১৯৬৭ সালে *অনুর পাঠশালা* দিয়ে। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে *যেখানে খঞ্জনা পাখি* নামে। দ্বিতীয় উপন্যাস *নিরাপদ তন্দ্রার* রচনাকাল ১৯৬৮। *বিচিত্রা* বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৭২, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ সালে *বিচিত্রা* ইদ সংখ্যায়। ১৯৭৭ সালে আগস্ট মাসে লেখা হয় *কালোবরফ* উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে *পূর্বাণী* পত্রিকা, ইদ সংখ্যায়। *মাটির জাহাজ* রচনাকাল ১৯৭৭। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯, *পূর্বাণী* ইদ সংখ্যায়। *খেলাঘর* ১৯৭৮ সালে লেখা, এ বছরই *সচিত্র সন্ধানী* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। *অশরীরী* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে *রোববার* পত্রিকায় এবং শেষ উপন্যাস *পাতালপুরী* ১৯৮১ সালের একই পত্রিকার ইদ সংখ্যায়। এগারোটি গল্প নিয়ে *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৯), *মানুষ মানুষ খেলা* (২০০৯) গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া আবু হেনা মোস্তফা এনাম সংগ্রহ ও সম্পাদনায় তেতাল্লিশটি গল্প নিয়ে *অগ্রন্থিত গল্প* (২০১০) প্রকাশিত হয়েছে। মাহমুদুল হক জীবিকার প্রয়োজনে কিছু অনুবাদের কাজও করেছেন। Paul Horgan-এর *The Peach Stone*-এর নির্বাচিত গল্প (১৯৬৯) বুকভিলা নিউমার্কেট থেকে, Walter Van Tilburg Clark-এর *The Track of the Cat* উপন্যাসের বাংলানুবাদ *শ্বাপদ* (১৯৭০) খোশরোজ কিতাবমহল থেকে, Stephen Beacker রচিত *When the War is Over* উপন্যাসের *যুদ্ধ যখন শেষ হলো* ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে বের হয়। সে যাই হোক মোটামুটি ভাবে এই হল মাহমুদুল হকের সৃষ্টির জগৎ। তিনি লিখেছেন কম। কিন্তু জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পবোধকে অসামান্য করে তুলেছে। সে হিসেবে *জীবন আমার বোন* উপন্যাসটি তাঁর অনন্য জীবন ভাবনার আদিকল্প।

জীবন আমার বোন মাহমুদুল হকের তৃতীয় উপন্যাস। বরিস পাস্তারনাক (১৮৯০-১৯৬০) ছিলেন মাহমুদুল হকের প্রিয় কবিদের একজন। পাস্তারনাকের *হ্যামলেট* কবিতাটি ছিল মাহমুদুল হকের প্রিয়। কবির *Sister My Life* (১৯২২) কবিতার নাম অনুসরণে উপন্যাসের নাম হয়েছে *জীবন আমার বোন*। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র *খোকা* সময়ের গ্রন্থিল বুকে কোন আঁচড় আঁকতে পারে না। সে একা, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন। মহান মুক্তিযুদ্ধ সারা জাতিকে যেভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, খোকা তার অংশ হতে পারে না। তবে *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ স্বয়ংক্রিয় কোনও বিষয় নয়, মাহমুদুল হক মূল বিষয়ে পৌঁছানোর জন্য প্রেক্ষাপটটি নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের ট্র্যাজেডি নির্মাণেও খোকার কোনও ভূমিকা নেই। তাই *জীবন আমার বোন*কে খাঁটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস বলার কোনও সুযোগ নেই। কথাকারের ইচ্ছেও তেমনটি ছিল না। 'জীবনের বড়ো ঢেউ নয়, ছোটো ছোটো ঢেউগুলোকে ধরতে চেয়েছেন মাহমুদুল হক।'

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনের পেছনে যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন

তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। পুরো জাতি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। এই সোনালি ইতিহাসে খোকার কোনও স্থান নেই। কারণ সে সমষ্টির অংশ হতে পারে না। ইতিহাসের গৌরবগাথায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি খোকারই তো প্রথম মুখ লুকানোর কথা। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের কাহিনি বলতে ওইটুকুই।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বর্ণনা বা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আনোয়ার পাশা (১৯২৮–৭১) রচিত *রাইফেল রুটি আওরত* (১৯৭৩), শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮)-এর *দুইসৈনিক* (১৯৭৩), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১) রচিত *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)'র *ওঙ্কার*, সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)-এর *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮৪), রশীদ হায়দার (১৯৪১-২০২০) রচিত *খাঁচা* (১৯৭৫), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)-র *যাত্রা*, আমজাদ হোসেন (১৯৪২-২০১৮) রচিত *অবেলায় অসময়* (১৯৭৫), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭)-এর *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) ইত্যাদি উপন্যাস। কিন্তু এসব উপন্যাস থেকে *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস আলাদা। উপন্যাসটিতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর আগের দিনগুলো অস্থির সময়ে মুক্তিকামী মানুষের তীব্র অথচ টালমাতাল সংগ্রাম-মুখরতা সংক্ষিপ্ত বয়ানে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'সেই নিরিখে *জীবন আমার বোন* উপন্যাটিকে আমাদের আরেকজন বিরলপ্রজ ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭) উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়।' *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল ১৯৭১ সালের সাত মার্চ থেকে ছাব্বিশ মার্চ পর্যন্ত। প্রেক্ষাপট ঢাকা শহর—

> জাহাজ বোঝাই সৈন্য চট্টগ্রামের দিকে ছুটে আসছে, বেলিচিস্তানে ঈদের জামাতের ওপর বোমা দাগানো টিক্কা খান আসছে নতুন লাট-বাহাদুর হয়ে; দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, ছবি, তবু এসবের কোন গুরুত্ব খোকার কাছে নেই। রাজনীতি ব্যাপারটাই আগাপাস্তলা একটা জমকালো ছেনালী; একজন শিক্ষিত নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে তার পুরোপুরি ধারণা থাকলেও ভোটার লিস্টে সে তার নাম তোলেনি। রাজনীতির ব্যাপারটা তার কাছে শিকার ফসকাতে না দেওয়া সেই মাদামোয়াজেল ব্লাশের মতো (হক, ১৯৯১: ১৪)।

ব্যক্তির কোনও রাজনৈতিক পরিচয় উপন্যাসে নেই। আপাত বিচারে এমন অনুভূতি আপামর বাঙালির জাতীয় অনুভূতির বিরোধী—এমন সরল ব্যাখ্যার সুযোগও এখানে নেই। কারণ কথাশিল্পী কী দেখাতে চান উপন্যাসে তাই মুখ্য। মাহমুদুল হক এখানে সমাজ-রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ভূমিকার বিপরীতে খোকাকে দাঁড় করিয়েছেন। তার কারণ মাহমুদুল হক দেশভাগোত্তর বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। নব্য ধনিক শ্রেণির উত্থান এবং রাতারাতি বদলে যাওয়া সমাজকে অবিশ্বাস করা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় আত্মাকে বিক্ষত ও অবিশ্বাসী করে তুলেছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খোকা এ সমাজের সৃষ্টি। সমাজ তাকে অস্বীকার করতে না পারলেও এ সমাজে সে অস্তিত্বহীন। সে নিরাসক্ত। তাকে আকর্ষণ করে ভোগবাদ। দেশ-রাজনাতির চেয়ে নীলাভাবির শরীর তার কাছে অনেক আকর্ষণীয়—

> বরং নীলাভাবী অনেক ভালো। কথার প্যাঁচে ফেলে একে অপরকে অহেতুক হেনস্থা করার কোনও অপপ্রয়াসই নেই ওখানে। আড্ডা আর তর্কের মুখোশ এঁটে বন্ধুরা যখন মাঝে মাঝে হীন মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে একে অপরের নামে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, জারিজুরি ফাঁসের ব্যাপারে পরস্পর নোংরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, তখন তার মন বিশ্রী রকম তেঁতো হয়ে যায়। নীলাভাবীর ওখানে আর যাই হোক এইসব কদর্য ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয় না তাকে; কখনও

> কুঁজো বামন অঙ্কারের মতো টিন ড্রাম বাজায় না কেউ, বরং 'ঘুমের ভিতর বালকের পেচ্ছাবের মতো' অলক্ষ্যে সময় কেটে যায় (হক, ১৯৯১: ১৫-১৬)।

অথচ খোকা দেশের স্বাধীনতাবিরোধী নয়। সে ভোগবাদী সমাজেরই প্রতিনিধিত্বকারী। উপন্যাসে নীলাভাবির যৌন আবেদনময়ী শরীর, লুলু চৌধুরীর উন্মাদনার ব্যবসায়িক স্বাধীনজীবন, রেক্সের বিয়ারের হিল্লোল, ভুসিমালের কারবারি, ঘুসের টাকায় রাতারাতি বড়োলোক হয়ে যাওয়ার বাহারি অথচ সত্যকাহিনির বয়ান আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে মুক্তিযোদ্ধার চিন্তাচেতনা, তর্ক-বিতণ্ডা, আছে মুরাদ, রহমান, ইয়াসিন, নুরুদ্দীন, গঞ্জালেশ তরুণ মুক্তিযোদ্ধার রক্ত শপথের মুখর তর্ক, নানা আলোচনা—

> এতোদিন তো শুধু শ্লোগান আর চিৎকারের খোসার মধ্য বাদামের মতো দেখেছিস সংগ্রামকে, এবার দেখবি তার সত্যিকার রাক্ষসমূর্তি। রক্তের বদলে রক্ত, সেই রক্ত হবে স্বাধীনতা (হক, ১৯৯১: ৬৪)।

কিন্তু খোকা তাতে শরিক হতে পারে না। সে দলছুট, বিচ্যুত। তারপর একসময় এই খোকাকেই পালাতে হয়। ২৫ মার্চের কালরাতে সে আটকা পড়ে রাজীব ভাই-নীলাভাবির বাসায়। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যাবে, সে অনুমান করতে পারেনি। বাসায় একা আছে রঞ্জু! দুরাত একদিন পার করার পর সে আসতে পেরেছিল রঞ্জুর কাছে। কিন্তু সে রঞ্জু কথা বলতে পারেনি। বাকরুদ্ধ জ্বরাক্রান্ত রঞ্জুকে নিয়ে সে যখন সমষ্টির অংশ হতে চাইল, পালাতে চাইল, তখন রঞ্জুকে তার হারাতে হল। অচৈতন্য রঞ্জু কুয়ে থাকল গাছের নিচে। ভাইয়ের বুকে থুথু দিয়ে বোন রঞ্জু ভাইয়ের সব অমঙ্গল দূর করে দিত। খোকার এই জীবন যেন বোন রঞ্জুর দেওয়া জীবন। পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে তো বটেই, খোকার নিজের কাছ থেকেও তাকে পালাতে হয়। কারণ পলায়নবাদী ছাড়া ইতিহাসে তো তার কোনও পরিচয়ই নেই। মাহমুদুল হক এভাবে উপন্যাসে তার বয়ান করেছেন—

> খোকার গল্পের এইখানেই সমাপ্তি, কেননা খোকা এমন কিছুই করেনি যে ইতিহাসের পাতায় তার নাম থাকবে। মুমূর্ষু বাঙালি ইতিহাস তৈরির নেশায় মেতে উঠেছিল; এক পলায়ন ছাড়া সেখানে খোকার কোনও ভূমিকা নেই, ইতিহাসের ধূসর আড়ালে খোকারই তো প্রথম মুখ লুকোবার কথা (হক, ১৯৯১: ১৫৭)।'

ঔপন্যাসিক হিসেবে মাহমুদুল হকের যে বিশেষ গুণ চোখে পড়ে তা হল তাঁর পরিমিতিবোধ। কাহিনির গাঁথুনিতে তিনি সেটাই রেখেছেন, যেটা তিনি বলতে চেয়েছেন। কাহিনির বুননে তিনি যথেষ্ট সংযমী। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল খোকা। দেশ-কাল থেকে খোকাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে মাহমুদুল হক সংযমের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকুশলতায়ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। আবার স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে মুরাদ, ইয়াসিন, নুরুদ্দীন, গঞ্জালেশ, রহমান ইত্যাদি তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছেন যাতে বাঙালি জাতির বৃহত্তর এবং মহত্তর মুক্তিসংগ্রামের, ত্যাগের কথাটিও খোকার মনস্তত্ত্বের সমান্তরালে পাঠকের সামনে চলে আসে। তার ফলে খোকার জীবনের নিরাসক্তি, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতার সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ সহজ হয়েছে। অন্যদিকে নব্য ভোগবাদী যে ধনিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল এবং সমাজের একটা অংশ ফুলেফেঁপে উঠেছিল, দিনকে দিন তাদের দ্বারাই সমাজনীতি-রাজনীতিতে সুবিধা হাসিল করছে, তার চিত্রও উঠে এসেছে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে। রাজীব ভাই, নীলাভাবি, লুলু চৌধুরী চরিত্রগুলোর পরিবেশ ও ভাষা সেই সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত সমাজকেই প্রতিবিম্বিত করে।

তিন

জীবন আমার বোন উপন্যাসের খোকা চরিত্রটি বাংলা উপন্যাসে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র। বয়সে সে মাত্র যুবক হয়ে উঠেছে। বয়স বাইশ বছর। বোন রঞ্জু ছাড়া তার পরিবার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মা জীবিত নেই, তবে বাবা বাইরে। তার বাবার হদিশ দিতে একটি মাত্র শব্দ ব্যয় করেছেন কথাকার—'রাওয়ালপিন্ডি'। এছাড়া উপন্যাসে আর কোনও তথ্য নেই। মাহমুদুল হক সংসারী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো অনিকেতবোধে আক্রান্ত। খোকার কোনও পিছুটান নেই। খোকার কথাইবা কুধু বলছি কেন, *অনুর পাঠশালার* অনু, *নিরাপদ তন্দ্রার* ইদ্রিস কম্পোজিটর, কামরান রসুল, *কালোবরফের* পোকা, *পাতালপুরীর* আমিনুল, *অশরীরীর* আম্বিয়া ইত্যাদি চরিত্রগুলোর মধ্যে এই অনিকেতবোধ প্রবলভাবে সক্রিয়। পারিবারিক জীবনের সাধারণ হাসিকান্না, বিরহ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব মাহমুদুল উপন্যাসে মুখ্যত গৌণ।

খোকা দাঁত মাজে না, দাড়ি কাটে না, তার গা থেকে আসে ভুসভুস গন্ধ। নাকে লাগে রঞ্জুর। একমাত্র ছোটোবোন রঞ্জুই খোকার জীবন। দেশের দুর্দিনে একমাত্র বোনের জন্যই তার মনে কিছুমাত্র চিন্তার উদ্রেক হয়, কিন্তু রঞ্জুর প্রতি অবহেলাও তার কম নয়। উপন্যাসের শেষে গিয়ে তা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে নীলাভাবিকে তার একমাত্র নিরুপদ্রব বলে মনে হয়েছে, সেই তার আবেদনও খোকার কাছে একসময় ফুরিয়ে যায়—

> নীলাভাবীর জন্য আর অকারণে তার মন আকুল হয় না; যেন অভাবনীয় একটি বই, প্রথম কয়েকটি পাতা পড়ার পরই দুর্মদ কৌতূহল সামলাতে না পেরে অধৈর্য পাঠকের মতো সে শেষটা পড়ে ফেলেছে (হক, ১৯৯১: ১৫)।

ফরাসি সাহিত্য মাহমুদুল হকের পড়া ছিল। খোকার জবানিতে বোদলেয়ারের *প্রবল মধুর* কবিতার কথা আছে। জাঁপল সার্ত্র ও সিমেন দ্য ব্যভোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় খোকার জবানিতে। মোদিল্লিয়ানির *মাইগ্রেশন টু নো হ্যয়ার* সিনেমাটি তার প্রিয়, তা জানা যায়। মাহমুদুল হক জানিয়েছিলেন, 'খোকার মধ্যে বোদলেয়ার প্রভাব আছে।' বাঙালির মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা করে দ্য এসিয়েঁৎ এর বৈদগ্ধ আর এনর্সটের দৃষ্টিপাত। সে মোপাসাঁর (১৮৫০-৯৩) *লা হোর্লে* (১৮৮৭) গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখে। তাই বলা যায়, খোকা চরিত্রটি মাহমুদুল হকের পাশ্চাত্য ভাবনাজাত। মাহমুদুল হক জানিয়েছিলেন—'খোকা ৫৮ এর সামরিক শাসনের ফসল। খোকা বর্তমানের নয় ভবিষ্যতের।' *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের খোকাকে পাঠ করলে আলবেয়ার কামুর *দ্য আউটসাইডার* (১৯৪২) এর নায়ক মারসোকে একবার হলেও মনে পড়বে। কিন্তু খোকার গল্পের যে ইতি টেনেছেন ঔপন্যাসিক সেটা মারসো নয়, সে খোকা বাংলাদেশের পোড়খাওয়া মাটির সন্তান। যৌবনের আবেগ-উদ্যমতায় অনেক কিছু জানে না বলেই সে খোকা। তার নামকরণে মাহমুদুল হকের এমন চিন্তাই কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। খোকার জাহেদুল করিম নাম উপন্যাসে মাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। খোকার বয়স মাত্র বাইশ বছর, পঁচিশ-ছাব্বিশ করা হয়নি হয়তো খোকা নামের মাহাত্ম্যের কারণেই। রঞ্জু যেমনটি মনে করেছে—'বুড়োধাড়ি হলেও এখনও তুই নিজেকে খোকা মনে করিস, এটাই তোর দোষ (হক, ১৯৯১: ১৪৫)!'

খোকার মধ্যে আসক্তি বা আকর্ষণ বলতে তার বোন রঞ্জু। খোকা থেকে সাত বছরের ছোটো। তাদের মাঝখানে অঞ্জু-মঞ্জু নামের বোনদ্বয় মামাবাড়ির পুকুরে ডুবে মারা যায়। তাদের কথাও খোকার ভাবনায় চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রেক্ষণে কয়েকবার স্মৃতির পাতায় ঝলক দিয়ে উঠেছে। অঞ্জু-মঞ্জু কি তবে দেশভাগে বিভক্ত মাহমুদুল হকের স্মৃতিজাগানিয়া দুই দেশ? আর রঞ্জু রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশ! চারদিকের অস্থির সময়, বেলী, লুলু চৌধুরীদের সময়ের জোয়ারে রঞ্জুর নিরাপত্তা নিয়ে

সে ভেবেছে। রঞ্জুর প্রতি বন্ধু মুরাদের চিন্তা বা ভালোবাসা কোনটিকেই সে সহজভাবে নিতে পারে না। সে রঞ্জুকে আগলাতে চায় মুরাদের কাছ থেকে, 'এঁচড়ে পাকা' খালাত বোন বেলীর কাছ থেকেও! রঞ্জুকে নিয়ে তার মনে একটা অজানা আতঙ্ক কাজ করত। রঞ্জুর মুখের দিকে তাকালেই সে কেবল স্বস্তি পায়, সুস্থ হয়; এমন স্নিগ্ধ, এমন নির্মল, এমন নিষ্কলঙ্ক হতে পারে কেবল করুণাধারা—এমনই মনে হয় খোকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। 'রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা-লাল ঢাকার রাজপথ' স্লোগান খোকাকে বিচলিত করে—সে অবচেতন মনে ভাবতে থাকে তাকে কি রক্ত দিতে হবে? রঞ্জুকে? আবার সে ভাবতে থাকে যদি রক্ত না দিই? উপন্যাসের এই অংশটুকুর বর্ণনায় মাহমুদুল হকের মুনশিয়ানা চমৎকৃত করে। খোকার এই অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ চিত্রায়নে মাহমুদুল হকের ভাষাও অনবদ্য—

> বাংলাদেশ, তুমি কুয়ে আছো অর্ধেন্দু দস্তিদার হ'য়ে থেকে থেকে কাতরাচ্ছো, বোমা বিস্ফোরণে নিদারুণ ক্ষত—বিক্ষত তোমার মুখ; তোমার মুখ পুড়ে গেছে। বাংলাদেশ, তুমি মরে গেছ প্রীতিলতার মতো বিষপান করে!(হক, ১৯৯১: ৭৯)

উপন্যাসের সব শেষে খোকাকে মাহমুদুল হক তুলে দিয়েছেন বিষাদমাখা এক দেশের ঠিকানায়—'দেশ তাহলে একটা পুকুর। অঞ্জু-মঞ্জুর মতো এর নিথর তলদেশে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে রঞ্জু (হক, ১৯৯১: ১৫৮)।'

যে নীলাভাবির জন্য এক সময় খোকা নিরুপদ্রব মনে করেছিল, যার শরীরকে সুখপাঠ্য বইয়ের মতো অধৈর্য পাঠক হয়ে পড়ে ফেলেছিল, সে নীলাভাবির কোনও দায়িত্ব নিতেও তার অনিচ্ছা, স্বার্থপর নিরাসক্ত খোকা—

> নারীদেহ সম্পর্কে যতো বিশ্লেষণই প্রয়োগ করা হয়ে থাক না কেন, আসলে তা নিছক তালতাল গোবরের মতো মাংসছাড়া আহামরি অমন কিছু নয়; স্পষ্ট মনে আছে খোকার সেদিন সে চরম মুহূর্তের পর কিভাবে গ্লানিতে ভরে গিয়েছিলো তার মন। অবসন্নতায়, মনহীনতায়, নিরাসক্তিতে, সে দুমড়ে পড়েছিলো যখন দেখলো সারা গায়ে দুর্গন্ধ নিয়ে প্যাচপ্যাচে ভাগাড় থেকে নেড়ীকুত্তার মতো সে উঠে আসছে। [...] আমরা যাকে দেহ বলি, শরীর বলি, রাজভোগ বলি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ বলি, ঘোড়ার ছাই বলি, আসলে তা নিছক প্রয়োজনের জিনিশ, খোকা ভেবে দেখেছে প্রয়োজন ব্যতিরেকে এক কানাকড়িও তার মূল্য নেই, তার কাছে নেই। ভাতের মাড় গালা মালসা, ঘরমোছা ন্যাতাকানির তাল, কিংবা জঞ্জাল ফেলার আস্তাকুঁড়, শরীর কি এর অতিরিক্ত কিছু; ডোম-চাড়াল কাওরা-মুচি থাকে কুরু করে কুষ্ঠরোগীরও প্রয়োজনের বস্তু এই শরীর (হক, ১৯৯১: ১৩৭)।

খোকা জানে সহজে তার মৃত্যু নেই, রঞ্জুর মত বোন তার গায়ে থু-থু ছিটিয়ে তার সব অমঙ্গল দূর করে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। নীলাভাবি, রাজন ভাই, বেলী, মুরাদ, ইয়াসিন, নুরুদ্দীন, গঞ্জালেশ ইত্যাদি চরিত্র নির্মাণে মাহমুদুল হকের দক্ষতা অপূর্ব। নীলাভাবি রক্তমাংসের প্রতিমূর্তি। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বিবাহিত রাজীবকে। কিন্তু বিয়ের পর আস্তে আস্তে ভালোবাসা কুধু কমলই না সে অনুভব করে গানের মত, এগ্রাজের মত সে এক, যন্ত্রবিশেষ, পুরোনো হলে ঘরের এক কোণে ফেলে রাখতে হয়। তাই সে দাবি খাটাতে চায় খোকার প্রতি, নীলাভাবি ভুল ভাবতে শিখল যে খোকা তার অনুরক্ত, প্রিয়। উপন্যাসের শেষে এসে সে একজন অতি সাধারণ মানবী মাত্র হয়ে ওঠে। যে নীলাভাবিকে উসকে দিয়েছিল খোকা, আবার সে-ই তাতে পানি ঢেলে দিয়েছে। ঠিক যেন বেলীর উক্তির মত—'কেনই লেখো, কেনইবা ধ্বংস করো।' খালাতো বোন বেলীও খোকাকে

ভালোবাসতো, কিন্তু খোকার মনোযোগ সে কোনদিনও পায়নি। তার 'এঁচড়ে পাকামো' অভ্যাসগুলোতে মাহমুদুল হক অপ্রধান চরিত্রের মধ্যেও সময়কে ধরতে চেয়েছেন। মুরাদ চরিত্রটি উপন্যাসে একটি শক্তিশালী চরিত্র। খোকার কাছের বন্ধু সে। কবিতা লিখে। সাংবাদিকতা করে, রেক্সে আড্ডা দেয়। বিয়ার-মদ গেলা ও পাড়ায় যাওয়ারও অভ্যাস আছে তার। দেশের প্রয়োজনে জান কুরবানি করার সাহসও মুরাদের আছে। আছে খোকার বোন রঞ্জুর প্রতি ভালোবাসা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন তা নিয়ে খোকার সঙ্গে তার বিরোধ-তর্ক আছে, আছে ভালোবাসা আর সে জন্যই তারা পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারে না। রঞ্জুর প্রতি মুরাদের যে আবেগ তাতেও খোকা মুরাদকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। রঞ্জুর জন্য যেন খোকা একাই ভাববে। দেশের ক্রান্তিকালে মুরাদ, ইয়াসিন, নুরুদ্দিন, গঞ্জালেশ রহমানরা যে শপথ নিয়েছিল স্বাধীনতার জন্য, জয় তো তাদেরই হল। খোকার নয়। এভাবে খোকার চারপাশের চরিত্রগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশনায় খোকার শূন্যতা উপন্যাসে করুণ হয়ে উঠেছে। মাহমুদুল হকের সব উপন্যাসেই অপ্রধান চরিত্রগুলো স্বল্পপরিসরে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশনা থাকে যা তার শিল্প ভাবনাকেই স্বরূপে উন্মোচিত করেছে।

চার

মাহমুদুল হকের উপন্যাসের ভাষা জাদুকরী। প্রত্যেকটি উপন্যাসেই তিনি চেষ্টা করেছেন নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার। ভাষার ক্ষেত্রটিতেও একই কথা বলা যায়। *অনুর পাঠশালা* রূপময় জগতের ভাষা থেকে *নিরাপদ তন্দ্রা* উপন্যাসের নিম্নবিত্তীয় জীবনভাষ্য রূপায়ণে নতুন ভাষার জন্ম দিলেন মাহমুদুল হক। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে নিরাসক্ত, নিঃসঙ্গ খোকার ভাষাও তার জীবনের মতই। খোকা অন্তর্মুখী চরিত্র হলেও গণআন্দোলনের মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী চরিত্রের অন্তর্গত লোভের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে—ধর্ম আর রাজনীতি ব্যবসার রাঘব-বোয়ালরা ভেজাল ওষুধের কারবারী কিংবা পঁচা মাছ বিক্রেতার চেয়েও জাতে নিকৃষ্ট (হক, ১৯৯১: ১৮)।

অথবা

> [...] আমি খোকা, কতো কুকাণ্ডের যে পাণ্ডা, একজন পাজীর পা ঝাড়া; গ্রেফ বাইরেই মনোরম প্লাস্টিক পেন্ট, ভিতরের সব দেয়াল নোনাধরা, চটা ওঠা, খাস্তা, উত্তাল তরঙ্গময় সামুদ্রিক বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ছিলাম, ফেননিভ একটি শরীর মুহুর্মুহু তোলপাড় করেছিলো বিছানায়,—এইভাবে খোকার যাবতীয় স্মৃতি মাংসাশী হ'য়ে যায়, সেখানে আতশবাজীর ধুম কুরু হয়,—উত্তেজনা তীব্র তত মধুর, যত মধুর তত অপবিত্র, অপবিত্রতা ইহলোকে যৌবন দান করে আমাদের, জাহাজের মতো বন্দর থেকে বন্দরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই যৌবন। [...] খোকা এও জানে টাইটানিক যে জাহাজ, একদিন ভরাডুবি হয় তারও (হক, ১৯৯: ১৯-২০)।

মাহমুদুল হকের ভাষা-বৈশিষ্ট্যর বিশেষ দিক হচ্ছে তিনি নিজস্ব কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা ভাষাচেতনায় স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। যেমন—পিপুফিসু, কানকো মারা, কাটবেল্লিক, মিডল স্টাম্প উড়িয়ে দেবো শালা—ইত্যাদি যা বাগধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দের মর্যাদা লাভ করেছে। অতি আবেগঘন আবহ তৈরি করতে তিনি দীর্ঘবাক্য ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় উপন্যাস *নিরাপদ তন্দ্রায়* বাইশশো পঞ্চাশ শব্দের বাক্য ব্যবহারের উদাহরণ নিশ্চয় পাঠকের মনে থাকবে। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসেও এমন দীর্ঘবাক্যের উদাহরণ আছে কয়েকটি জায়গায়—

> [...] এই ঔদাসীন্যে হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে প্রবল দুপুর; এই দুপুরে তারা ছিটকিনি তুলে দিয়েছে দরোজার, ছিটকিনি খুলে দিয়েছে সংযমের; সংযম ডেকে এনেছে, পৈচাশিকতাকে,

> পৈচাশিকতা কেশর ফুলিয়ে দুঃখকে, দুঃখ ক্যাকটাসের গায়ে গর্ভপাতের নারকী পুষ্পকে, দংশনে ঘর্ষণে পেষণে লেহনে কামদগ্ধ নিঃশ্বাসে ও চুম্বনে একটি একটি ক'রে পাপড়ি ঝ'রে পড়েছে পুষ্পের, পাপড়ি খ'সে পড়েছে পায়ের পাতায়, গালে গলায় কটিতটে, কাঁধে বাহুমূলে, নাভীমূলে, মর্মমুলে, আঁখিপল্লবে, অশ্রুর মুক্তাফলে, বন্ধমুষ্টির শঙ্খে এবং শঙ্খ বের করেছে তার জিহ্বাকে, জিহবা সর্পকে, শ্বেতচন্দন কুমকুম আর কাচপোকার টিপে নিজেকে সাজিয়েছে সর্প, কুমকুম চন্দনকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে তার গায়ে এসে বসেছে দিব্য প্রজাপতি, শত সহগ্র ফুলের নির্দোষ নির্মেঘ অবিচল বিস্মৃতি তার পাখায়—
>
> খোকা দেখলো রাজীব ভাইকে, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে একদিকে। ঝুরঝুর ক'রে ভেঙে পড়ে খোকা, টাল খায়। ভিতরে ভিতরে সে মাছি তাড়ানো মনের আলগা রাশকে ক'ষে ধরতে চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠে না, বিফল হয় (হক ১৯৯১: ১৩০)।

মাহমুদুল হক ভাষার কারুকাজে চরিত্রকে তার প্রতিবেশে করেছেন জীবন্ত। এটা সব কথাশিল্পী করে থাকেন। মাহমুদুল হকের বিশেষত্ব এখানেই যে, তিনি নিজস্ব একটি ভাষাভঙ্গি নির্মাণ করতে পেরেছেন। প্রয়োজনে নতুন নতুন শব্দ উপহার দিয়েছেন। ব্যক্তিকে নির্মাণের জন্য, তার বোধ ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশের জন্য জুতসই ভাষা নির্মাণ করেছেন তিনি। এতে মাহমুদুল হকের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত। ভাষার উপর পুনর্দখল ও শিল্প-স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণেই তিনি আবেগে-আবেশে ধারাবাহিকভাবে, কমা, সেমিকোলন দিয়ে দিয়ে কথার তুবড়ি ফোটাতে পারেন অতি দীর্ঘবাক্য ব্যবহার করে। ধারণা করি অন্তত এই দীর্ঘবাক্যগুলোতে তুলনামূলকভাবে কাটাছেঁড়া করেছেন অপেক্ষাকৃত কম। সৃষ্টির দারুণ নেশা যেন মাহমুদুল হককে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কথার স্বপ্নপুরীতে। কারণ তিনি ছিলেন কথার—গল্পের জাদুকর।

পাঁচ

মাহমুদুল হক *জীবন আমার বোন* লেখার আগে আরও দুটি উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম উপন্যাস *অনুর পাঠশালায়* তিনি এক রূপময়তার জগৎ নির্মাণ করেছেন অনু নামের এক নিঃসঙ্গ বালকের জীবনভাষ্যে। যে কি না জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। একাকী বালকের চোখে যে স্বপ্নের রং বুনেছেন কথাকার, উপন্যাসের ভাষার আদলে যে জাদু সৃষ্টি করেছেন, তা ছিল ফরাসি চিত্রকল্পের নিরীক্ষার ফসল। এটি বাংলা উপন্যাসে ফরাসি কথাশিল্পের ন্যুভরোমার (চিত্রবিপ্লব) নানা কলাকৌশলের পরীক্ষাও বটে। অথচ দ্বিতীয় উপন্যাসে মাহমুদুল হক আশ্চর্যজনকভাবে ফিরে আসেন মাটি-মানুষের কাছে। সাব-অলর্টান সমাজের প্রতিভূ হয়ে উঠলেন *নিরাপদ তন্দ্রার* ঔপন্যাসিক। যেখানে এই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের নিষ্পেষিত জীবন কথা বলে উঠেছে। মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* আগের দুটি উপন্যাস থেকে একেবারেই পৃথক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মহাস্রোতের মধ্যে ঘটে যাওয়া অনুস্রোতের অনুসন্ধানী মাহমুদুল হক। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের উপন্যাসে যা একেবারেই নতুন। উপন্যাসের খোকা চরিত্রটি তাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেননা জীবন ও সময়ের বিশাল ক্যানভাসে খোকার কোনও ভূমিকা রাখেননি মাহমুদুল হক। খোকা সমষ্টির নয়। সে একা, মূলত বিচ্ছিন্ন। ২৫ মার্চের পর স্বার্থপরভাবে সে যখন সমষ্টির সঙ্গে পালাতে চায়—পেছনে পড়ে থাকে অচেতন, অসুস্থ প্রিয়বোন রঞ্জু। সে থুথু ছিটিয়ে ভাইয়ের জীবনের সব অকল্যাণ দূর করেছে। নিজের জীবন দিয়েও যেন রঞ্জু খোকাকে জীবনই দান করল। খোকা উপন্যাসে হিরো হতে পারত অথবা হতে পারত এন্টিহিরো। কিন্তু মাহমুদুল হক খোকাকে খোকা-ই করতে চেয়েছেন। সে এতকিছু বুঝে না বিধায় সে খোকা। খোকা চরিত্রের জন্য অন্যান্য পুরুষচরিত্র

যেমন রাজীব ভাই, মুরাদ-*এর* সম্ভাবনা থাকার পরও চরিত্রগুলোর বিকাশে তৎপর হননি মাহমুদুল হক। খোকার নির্মাণে তাঁর আবিষ্ট মনোযোগ। *জীবন আমার বোন* মূলত খোকার জীবনেরই গল্প। এ চরিত্র নির্মাণে কথাকারের চিন্তা-চেতনা স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন, অনির্দিষ্টতা খোকাকে অসামান্য ও আলাদা করে তুলেছে। তবে উপন্যাসে খোকার যে ডিসকোর্স পরিকল্পনা করেছেন মাহমুদুল হক অনেক সমালোচক সেখানে ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতার অভাবকেই দায়ী করেছেন। খোকার মধ্যেই যদি মাহমুদুল হক একাকার হতেন অর্থাৎ মাহমুদুল হকের নিজের ডিসকোর্সই *খোকা* হয়ে উঠত তাহলে অন্য চরিত্রগুলো বৈচিত্র্য হারাত। টাইপ চরিত্র নিয়ে মাহমুদুল হক কুধু পাঠকের বিরক্তির ইতিহাসকে দীর্ঘায়িতই করতেন। অধিকন্তু মাহমুদুল হকের লেখক জীবনের দিকে যদি তাকাই তবে দেখব যখন তাঁর ভালো লাগেনি, তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। জোর করে লিখতে চাননি। তবে এ কথা বলা যায় *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের খোকা অথবা *কালোবরফ* উপন্যাসের পোকা চরিত্রের সঙ্গেই ব্যক্তি মাহমুদুল হকের যোগাযোগটা তুলনামূলকভাবে বেশি। শরৎচন্দ্রের যেমন *শ্রীকান্ত*, বিভূতিভূষণের যেমন *অপু*, সুনীলের যেমন *অতীন—খোকা*ও তেমন মাহমুদুল হকের। খোকা উপন্যাসে এক রৈখিক চরিত্র। তার চরিত্রের মধ্যে বড়ো কোনও দ্বান্দ্বিকতা না থাকলেও খোকা লেখকের মুখপত্র নয়। খোকাকে নির্মাণে সময়ের দ্বান্দ্বিকতাকে উপজীব্য করেছেন মাহমুদুল হক। পাকিস্তানি এস্টাবলিস্টমেন্টের একটি ব্যর্থ সংস্করণ এই খোকা। খোকা শুধু বর্তমানের নয়, খোকা ভবিষ্যতেরও। পাকিস্তানিরা এদেশে খোকার মতই একটি মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করতে চেয়েছে। তাই উপন্যাসে খোকা মাহমুদুল হকের নয় বরং বিশেষ সময়ের, বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

মিখাইল বাখতিন ডায়োলজি থেকে পলিফনি উপন্যাসের বিকাশের কথা বলেছেন। কিন্তু মাহমুদুল হক *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে তাঁর বহুস্বরকে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব উপায়ে। তাছাড়া মূলত উন্মূল, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষকে নির্মাণই মাহমুদুল হকের উদ্দিষ্ট বিষয়। তাতে তাঁর শিল্পভাবনাও ভিন্নরকম। সে হিসেবে *জীবন আমার বোন* উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একটি অনন্য সংযোজন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মাহমুদুল হক জীবন অথবা সময়ের বড়ো বিষয় নয়, মহৎ নয়—তার প্রতাপে হারিয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো বিষয়কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে খুঁজতে সচেষ্ট থেকেছেন। এজন্য তাঁর উপন্যাসের ক্যানভাসও বড়ো নয়। ছোটো অথবা বিচ্ছিন্ন ক্যানভাসে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে মাহমুদুল হকের অনন্য ভাষাচিন্তা। প্রত্যেক উপন্যাসেই তিনি ভাষা নিয়ে খেলেছেন। আলোচ্য উপন্যাসেও সময়-সমাজ ও ব্যক্তি অনুযায়ী গতিশীল ভাষার ব্যবহার করেছেন তিনি। এ ভাষা শহুরে মধ্যবিত্তের ভাষা। খোকা, রঞ্জু, মুরাদ, লুলু চৌধুরী, নীলাভাবির মত সব হারানো নারী চরিত্রের উপযোগী, গতিময় ভাষা দিয়েছেন মাহমুদুল হক। মধ্যবিত্ত সমাজে বসবাস করে এ ভাষাকে কব্জা করা যতটা সহজ ততটাই কঠিন তার মধ্যে বৈচিত্র্য আনা বা আকর্ষণীয় করে তোলা। মাহমুদুল হকের নিজস্ব শব্দনির্মাণ, বাগধারা, প্রবাদ ও চিত্রকল্প নির্মাণের সক্ষমতা *জীবন আমার বোনের* ভাষাকে সাবলীল ও চৌকশ করে তুলেছে। কিছটা কাব্যিক হলেও গদ্যের ঋজুতা তাতে মোটেও ক্ষুণ্ন হয়নি। সুতরাং সব মানদণ্ডেই মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* উপন্যাসটি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একটি আলাদা স্থান দখল করে আছে এবং ব্যতিক্রমী জিজ্ঞাসার উদাহরণ হতে পেরেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

আনোয়ার, চন্দন (সম্পা.) (২০১৪), *গল্পকথা*, মাহমুদুল হক সংখ্যা, রাজশাহী;
আনোয়ার, চন্দন (সম্পা.) (২০২১), *মাহমুদুল হকের মানস ও সৃষ্টি অবলোকন*, ঢাকা: কবি;
এনাম, আবু হেনা মোস্তফা (২০২১), *মাহমুদুল হক: সৃষ্টি ও শিল্প*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ;
কামাল, আহমাদ মোস্তফা (সম্পা.) (২০২০), *হিরণ্ময় কথকতা*, ঢাকা: পেন্ডুলাম;
মান্নান, সরকার আবদুল (২০১৪), 'জীবন আমার বোন অন্তর্কাঠামোর চালচিত্র', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পা.) *জীবন আমার বোন: মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্যপ্রকাশ;
হক, মাহমুদুল (১৯৯১), *জীবন আমার বোন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্যপ্রকাশ;
হাসনাত, আবুল (সম্পা.) (২০১০), *আলোছায়ায় ফালবন্দী*, ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ;
হাওলাদার, শামসুল হক (সম্পা.) (২০০৯), *মাহমুদুল হক স্মারকগ্রন্থ*, জুন;
হোসেন, সৈয়দ আকরম (সম্পা.) (২০০৯), *উলুখাগড়া*, এপ্রিল।

ISSN 2707-9201

মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কবিতা (১৯১৭-৩৯): বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল ও কবিকৃতি

মোহাম্মদ বিলাল উদ্দিন*

সারসংক্ষেপ: বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র *দিগ্দর্শন* (১৮১৮) প্রকাশের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকালের মধ্যে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় *শ্রীহট্ট প্রকাশ* (১৮৭৪)। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শুধু শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অর্থাৎ সুরমা উপত্যকা থেকে কমপক্ষে ১৪৯টি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন* ছিল সিলেট থেকে প্রকাশিত একটি প্রাচীন সাময়িকপত্র যার বিষয়বৈচিত্র্য ছিল রীতিমত বিস্ময় জাগানিয়া। ব্রিটিশ শাসনামলে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষি সিলেট অঞ্চলে মুরারিচাঁদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠার প্রায় পনেরো বছর পর কলেজের মুখপত্র হিসেবে *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন* নামে একটি ত্রৈমাসিক জার্নাল প্রকাশিত হয় ১৯১৭-য়; টিকে থাকে ১৯৩৯ খ্রি. পর্যন্ত। একাধারে একটি প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে মূলত কবি ও লেখকবৃন্দের সেরকম সৃজনপ্রয়াস প্রয়োজন। মুরারিচাঁদ কলেজের তৎকালীন শিক্ষক-শিক্ষার্থী এ কাজটি নিরলসভাবে করেছিলেন—তাঁদের প্রতিভা ও অগ্রসর চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন কলেজ ম্যাগাজিনে। এতে প্রকাশিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের বিষয় ও আঙ্গিক বেশ বৈচিত্র্যময় এবং সেগুলো সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রচিন্তার স্বরূপ এবং প্রেম-দ্রোহ-আত্মজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নাবলি ধারণ করে আছে। কলেজ ম্যাগাজিনকে ঘিরে যে-সকল কবিতা, গল্প কিংবা গবেষণামূলক ও সৃজনশীল প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল তা সেকালের সাহিত্যধারা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাকে ধারণ করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে মুরারিচাঁদ কলেজের বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে কাব্যচচার স্বরূপ আলোকপাত করা হয়েছে।

চাবিশব্দ: *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন*; কবিতা; নবজাগরণ; বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল।

ভূমিকা

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগব্যাপী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মধ্যযুগীয় জীবনবোধ, ভাষাবিন্যাস ও আঙ্গিককৌশলের বদলে আধুনিক জীবনবোধ ও শিল্পকৌশল অর্জন করে। এই বিবর্তনধারার মূল প্রবাহ ছিল কলকাতা ও ঢাকাকেন্দ্রিক। ব্রিটিশ শাসনামলে সিলেট ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত; বাংলাভাষা এ-অঞ্চলটি সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট।

সুযোগ পায়নি। অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যসেবায় সুরমা-উপত্যকার চিন্তকশ্রেণির ভূমিকা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বৈপ্লবিক। সেকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার প্রধান বাহন ছিল সাময়িকপত্র। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র *দিগ্দর্শন* (১৮১৮) প্রকাশের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকালের মধ্যে সিলেট থেকে *শ্রীহট্ট প্রকাশ* (১৮৭৪) বের হয়। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শুধু শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অর্থাৎ সুরমা উপত্যকা থেকে কমপক্ষে ১৪৯টি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন* ছিল সিলেট থেকে প্রকাশিত একটি প্রাচীন সাময়িকপত্র যার বিষয়বৈচিত্র্য ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। কারণ এতে কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য ছাড়াও রয়েছে রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতিচিন্তা এবং প্রেম-দ্রোহ-আত্মজাগরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি। বর্তমান প্রবন্ধে 'বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল' বলতে মুরারিচাঁদ কলেজের অভ্যন্তরে সংঘটিত শিক্ষা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি দেশভাগের পূর্বপর্যন্ত উত্তরোত্তর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। দেশভাগের পরবর্তীকালে এরকম বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল বজায় থাকেনি, কারণ মেধাবী, অনুসন্ধিৎসু ও মুক্তমনা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায় (সেন, ১৯৩৮: ৬২)। 'কবিকৃতি' বলতে বোঝানো হয়েছে ১৯১৭-৩৯ খ্রি. পর্যন্ত *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত কবিতার ভাব ও শিল্পপ্রকরণ। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ-সব কবিতা তৎকালীন শিক্ষক-শিক্ষার্থীই রচনা করেন।

মুরারিচাঁদ কলেজের বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে সর্বদা অনুসৃত হতো নিবিড় শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কঠোর শৃঙ্খলা। এ প্রসঙ্গে দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন—ছাত্রদের নিজবাড়ি, হোস্টেল, মেসবাড়ি বা অন্যরূপ বাসস্থান পর্যন্ত গিয়ে তত্ত্বাবধান করতেন শিক্ষকবৃন্দ (প্রক্টোর)। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে সুফল পাওয়া যায়। নিচে দুটি শিক্ষাবর্ষের আইএ এবং আইএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সারণি দেওয়া হলো—

সারণি—১: ১৯২০-২১ শিক্ষাবর্ষের আইএ ও আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার নাম	মোট অবতীর্ণ পরীক্ষার্থী	পাসকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা				পাসের হার (%)	৮০ উপরে প্রাপ্ত নম্বর		
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট		১ বিষয়ে	২ বিষয়ে	৩ বিষয়ে
আইএ	১০৭	৪১	৩৬	১৭	৯৪	৮৭.৮৫	১৬	৩	-
আইএসসি	৩৩	২২	৮	১	৩১	৯৩.৯৪	১৪	২	১

দ্রষ্টব্য: কলা শাখায় পরীক্ষার্থী ছিল ১১০ জন, অবতীর্ণ হয় ১০৭ জন (উদ্দিন, ১৯২১ক: ৩৬)

সারণি—২: ১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষের আইএ ও আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার নাম	মোট অবতীর্ণ পরীক্ষার্থী	পাসকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা				পাসের হার (%)	৮০ উপরে প্রাপ্ত নম্বর		
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট		১ বিষয়ে	২ বিষয়ে	৩ বিষয়ে
আইএ	৭৪	১৬	২৪	১২	৫২	৭০.২৭	৯	২	-
আইএসসি	৪০	২৯	৭	১	৩১	৭৭.৫	১৪	২	-

দ্রষ্টব্য: কোনও পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল না (উদ্দিন, ১৯২১ক: ৩৬)

উপরোল্লিখিত ছক দুটিতে শিক্ষার্থীদের পাসের হার এবং ডিস্টিংশনের যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, সেকালে তা অর্জন করা সহজ ছিল না। তখন ডিস্টিংশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক, উচ্চমাধমিক, স্নাতক ও সাতকোত্তর শ্রেণিতে আসাম সরকার ও বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করতেন। বৃত্তিলাভের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুরারিয়ানরা এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে বিশেষ অবদান রেখেছিল অনেক সাংগঠনিক তৎপরতা। তখন বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূভাবে শিক্ষাদান, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন এবং প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সাধন করতে কলেজে তৈরি করা হয়েছিল নানাবিধ সংগঠন। যেমন—দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্য চালু করা হয় 'The Students Mutual Aid Fund'(1918), মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অভিনয় কুশলতা অর্জনের জন্য গঠন করা হয় 'The Murarichand College Theatre'(1922)। প্রথম দিকে কলেজে কোনও ছাত্র-সংসদ ছিল না, কাজ চলত শ্রেণি প্রতিনিধিদের দ্বারা। ১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও সাতকোত্তর শ্রেণি হতে পঁয়তাল্লিশজন শ্রেণি প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে দেখা যায় (নোটস, সপ্তম বর্ষ, ১৯২৩-২৪, নং-৩, পৃ. ৬৬)। তারা কলেজ ম্যাগাজিনে নানা কার্যক্রমের নিয়মিত প্রতিবেদন লিখতেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দেই এ সম্বন্ধীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন করে 'কলেজ ইউনিয়ন' বা 'ছাত্র-সংসদ' গঠনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে সে-বছর প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়নি। ১৯২২-এ স্যার রাসবিহারীর (২৩ ডিসেম্বর ১৮৪৫—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১) মৃত্যুতে কলেজ ইউনিয়ন শোকসভার আয়োজন করে বলে তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কলেজ ইউনিয়ন সে-সময়ে প্রতিনিধি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত হতো—

> Though the summer is fairly afoot, most of the college organisations are hibernating still. The College Union has however woke up with a meeting under the presidency of Prof. N C Seal to mourn the death of Sir Rashvehari Ghosh.
>
> ('Notes', *The Murarichand College Magazine*, Vol.IV. No.IV., 1921-22, P. 61).

প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে। ছাত্র-সংসদের নামকরণ করা হয় 'The Murarichand College Union'(1922?)। ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ হতে ১৯৩৯ খ্রি. পর্যন্ত প্রতিবছর নতুন করে নির্বাচিত পরিষদ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ক্রমেই গঠিত হয় 'TheMurarichand College Athletic Society'(?); 'The Murarichand College Debeting Club'(?); 'The Murarichand College Swimming Club'(?); 'The Murarichand College Literary Club'(?); 'The Murarichand College Singing Club'(?); 'The Murarichand College Rover Scout'(1927); 'The Murarichand College Cycling Club'(1927); 'The Murarichand College Nursing Unit (1927)। এমনকি ২৬ নভেম্বর ১৯৩২-এ কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সভায় প্রফেসর এন সি শীলের সভাপতিত্বে 'Old Boys' নামে কলেজের অ্যালামনাই গঠিত হয়। সাতচল্লিশের পরে অবশ্য এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন* প্রথম দিকে শিক্ষকবৃন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কলেজ ইউনিয়ন গঠনের পর প্রকাশিত হয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এবং ছাত্রদের সম্পাদনায়। তখন ছাত্রদের সরাসরি ভোটে একজন প্রধান সম্পাদক ও বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমের জন্য একজন করে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হতেন। জুরি বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ও কবিতার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পনেরো টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হতো। এরূপ বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আসাম প্রদেশের সুরমা উপত্যকার সিলেটে বিকশিত হয়েছে বাংলা কবিতা।

মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনের প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে অল্পসংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ও বাংলা উভয় অংশে প্রবন্ধের সংখ্যাই ছিল বেশি। অবশ্য প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোর আকার তুলনামূলকভাবে ছিল ছোটো, ক্রমান্বয়ে সংখ্যাগুলোর কলেবর যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই বাড়তে থাকে কবিতা, গল্প ও নানারকম প্রবন্ধের সংখ্যা। নিচের সারণির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে—

সারণি—৩

মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে (সাতচল্লিশপূর্ব) প্রকাশিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের ক্রমবৃদ্ধি (উদ্দিন, ২০২১খ: ১০৯)

	চতুর্থ বর্ষ, ১৯২০-২১ খ্রি.			**১১শ বর্ষ, ১৯২৭-২৮ খ্রি.**				**২০শ বর্ষ, ১৯৩৭-৩৮ খ্রি.**		
	প্রথম সংখ্যা	দ্বিতীয় সংখ্যা	তৃতীয় সংখ্যা	প্রথম সংখ্যা	দ্বিতীয় সংখ্যা	তৃতীয় সংখ্য	চতুর্থ সংখ্যা	প্রথম সংখ্যা	দ্বিতীয় সংখ্যা	তৃতীয় সংখ্যা
কবিতা	১ টি	২টি	২টি	৪টি	৪টি	৩টি	৫টি	৫টি	৪টি	৪টি
গল্প	-	১টি	২টি	-	-	-	৪টি	৮টি	৬টি	৩টি
প্রবন্ধ	৮টি	১০টি	৭টি	১৭টি	১৫টি	১৪টি	১২টি	২২টি	২২টি	১১টি

উপরের সারণিতে ১৯২২০-২১, ১৯২৭-২৮ এবং ১৯৩৭-৩৮ শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের (সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন, অভিভাষণসহ) পরিসংখ্যান দেখানো হলো। এগুলো প্রকাশের কালিক ব্যবধান সাত থেকে সতেরো বছর। অথাৎ ১৯২০-২১ খ্রি. চতুর্থ বর্ষে সবকটি সংখ্যা মিলে যেখানে প্রবন্ধ ছিল পঁচিশটি সেখানে সতেরো বছর পরে প্রকাশিত ২০শ বর্ষে প্রবন্ধ পকাশিত হয় পঞ্চান্নটি। এটি চিন্তাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ও তার স্বরূপকে নির্দেশ করে। প্রবন্ধাবলির বিষয় ছিল ধর্ম-দর্শন-সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা। ক্রমে এইসব চিন্তার প্রকৃতি ও প্রকারভেদ বিস্তৃত হয়ে রাজনীতিচিন্তা, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণায় পরিবর্তন হতে থাকে। একথা গল্প ও কবিতাবলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত বিবর্তন এখানে লক্ষ্যযোগ্য। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জীবনীভিত্তিক কবিতা, নিবেদিত কবিতা, ব্যক্তিগত অনুভব ও রোমান্টিক ভাবনাপ্রসূত কবিতা বা ভাষান্তরিত কবিতাবলি সময়কে ধারণ করেছে, একইসঙ্গে ধারণ করেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সৃজনপ্রয়াস।

*মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে*প্রকাশিত কবিতাবলি

ব্রিটিশ শাসনকালে *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* যারা কবিতা লিখেছিলেন, তারা ভাব ও আঙ্গিকগত দিক থেকে সমকালীন কাব্যপ্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যাবলি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। বাংলা কবিতা তখন মধ্যযুগীয় কাহিনি ও ভাষার বদলে অর্জন করেছিল ব্যক্তিক অনুভব ও স্বাতন্ত্র্য—কল্পনার অপার বিস্তার ছিল, তবে তাতেও ছিল পরিমিতিবোধ। তাদের চিন্তা ও চিত্তলোকে লালিত হয়েছিল নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখকে

তো ধারণ করেছিলেন তারা, সমকালীন সহিত্য আন্দোলনকেও গ্রহণ করেছিলেন সাগ্রহে। তিরিশের দশকের কবিগোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গে—বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাদের কারও কারও নিবিড় যোগাযোগ ছিল। মুরারিচাঁদ কলেজের শিক্ষার্থী অশোকবিজয় রাহা (পরে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র অধ্যাপক') তিরিশের দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতাভবন' থেকে এক পয়সার কাব্যসিরিজে তাঁর *ভানুমতীর মাঠ* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল। তাঁর চৈতন্য ও নির্মাণকলা রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল; অশোকবিজয় রাহাকে তিনি অভিহিত করেছিলেন সাহিত্যজগতের 'তরুণ চাঁদ' বলে। সেটি ১৯৩১-এ; রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর, অশোকবিজয় রাহার একুশ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয় সিলেট শহরের দুর্গাকুমার পাঠশালায়; মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক শশীমোহন চক্রবর্তী ছিলেন এর সভাপতি, অশোকবিজয় রাহা ছিলেন সদস্য। এ প্রবন্ধে উপরোল্লিখিত অনেকের কবিতা যেমন—কবি রামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য, সুশীতল রায়, অশোকবিজয় রাহা, কণিকা চৌধুরী প্রমুখের কবিতায় সমকালীন ভাবধারা ও কাব্যপ্রকরণ বিদ্যমান রয়েছে।

মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে ১৯১৭-৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পঁচাত্তরটি মৌলিক এবং পাঁচটি অনূদিত কবিতা প্রকাশিত হয় ম্যাগাজিনে। কবির সংখ্যা সাতচল্লিশজন; তাঁরা মূলত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী। এক বা একাধিক কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অনেকের। দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের পাঁচটি, দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তীর তিনটি, নলিনীমোহন শাস্ত্রীর সাতটি কবিতা রয়েছে। চারটি করে কবিতা রয়েছে অনুকূল চন্দ্র দেব, চন্দ্রবিনোদ দাস, অশোকবিজয় রাহা, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের; দুটি করে রয়েছে আবদুল গফফার দত্তচৌধুরী, মো. নিছার আলী লস্কর, রামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য, সুধাংশু কুমার শর্মা ও সুধাংশু পুরকায়স্থের। অন্যদের কবিতা রয়েছে একটি করে। কবিদের মধ্যে মুসলিম নয় জন; হিন্দু সাঁইত্রিশজন এবং মহিলা একজন। একটি ইংরেজি কবিতার দেখা পাওয়া যায়—'The Lost Day' লিখেছেন Anwer Hussain। 'সুপ্তি-ভঙ্গ' নামে একটি কবিতা পাওয়া যায় লেখকের নামহীন। নিচে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কবিতা, কবিদের নাম ও প্রকাশকালসহ একটি সারণি দেওয়া হলো—

সারণি—৪: *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* (সাতচল্লিশপূর্ব) প্রকাশিত কবিতা, কবিদের নাম ও প্রকাশকাল

লেখক	প্রবন্ধের শিরোনাম	মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন			
		বর্ষ	সংখ্যা	প্রকাশকাল	পৃষ্ঠা
অমল দাশ গুপ্ত	প্রতাপ-প্রয়াণে	২১শ	দ্বিতীয়	১৯৩৮-৩৯	১০২-৩
অনুকূল চন্দ্র দেব	গিরিশ-বরণে	২০শ	দ্বিতীয়	১৯৩৭-৩৮	১২৬-২৬
	আজি মোরে থামিবারে দাও	২০শ	তৃতীয়	১৯৩৭-৩৮	১৭৪-১৭৫
	খেলার ভগবান	২১শ	প্রথম	১৯৩৮-৩৯	৩৩-৩৭
	আমারে তুলিয়া দাও	২১শ	দ্বিতীয়	১৯৩৮-৩৯	৯৩-৯৩
অশোকবিজয় রাহা	ভোরের আলোয়	১১শ	দ্বিতীয়	১৯২৭-২৮	৩৫-৩৬
	শরৎ-প্রাতে	১১শ	চতুর্থ	১৯২৭-২৮	৮১-৮২
	মরু-সন্ধ্যা	২০শ	প্রথম	১৯৩৭-৩৮	৩১-৩১
	রাতের সোওয়ার	২০শ	তৃতীয়	১৯৩৭-৩৮	১৫৮-৬২

অমূল্য ভূষণ চৌধুরী	অশ্রু-অর্ঘ্য	১১শ	চতুর্থ	১৯২৭-২৮	৯৬-৯৭
আবদুল গফফার চৌধুরী	গিরীশ-প্রশস্তি বিধুর	১৪শ ১৬শ	দ্বিতীয় প্রথম	১৯৩২-৩৩ ১৯৩৪-৩৫	৬৫-৬৬ ০১-০১
কণিকা চৌধুরী	দুঃখের বোঝা	২০শ	প্রথম	১৯৩৭-৩৮	৪৭-৪৯
গবেন্দ্র নাথ চৌধুরী	আষাঢ় মাস	৭ম	প্রথম	১৯২৩-২৪	১-২
গুণেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী	বাদল দিনে	১১শ	প্রথম	১৯২৭-২৮	৯-৯
গোলাম কাদির	উন্মেষ	২০শ	দ্বিতীয়	১৯৩৭-৩৮	১৩২-৩২
চন্দ্রবিনোদ দাস	ভারতী-বন্দনা বল্লরী প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দ্র দত্ত বি.এ মহাশয়ের প্রতি স্বাগতম (আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে সুরমা উপত্যকা ছাত্রসম্মিলিনী	৫ম ৭ম ৭ম	তৃতীয় প্রথম দ্বিতীয়	১৯২১-২২ ১৯২৩-২৪ ১৯২৩-২৪	৪৯-৪৯ ২৪-২৩ ৩৬-৩৯
চেরাগ উদ্দীন	সকল পথে পথ	১৬শ	প্রথম	১৯৩৪-৩৫	২০-২০
দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য	যাত্রাপথে শরৎ স্মৃতি রবি-প্রশস্তি বিদায়	১১শ ১১শ ১১শ ১১শ	প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ	১৯২৭-২৮ ১৯২৭-২৮ ১৯২৭-২৮ ১৯২৭-২৮	১৩-১৩ ২৫-২৫ ৪৯-৫১ ৭৩-৭৪
দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্তী	সন্ধানে নীরবতায়— পথে	১৯শ ১৯শ ১৯	প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়	১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৬-৩৭	৫১-৫১ ৭৭-৭৭ ১১২-১১২
নরেশ ভট্টাচার্য	সনেট অবেলায় এলে লয়ে মিলনের মালা তুমি মোর জীবনেরে রয়েছ জুড়িয়া সনেট	১৯শ ১৯শ ১৯শ ২০শ	প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয়	১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৬-৩৭	৪৮-৪৮ ৮৫-৮৫ ১৪৭-১৪৭ ১৯৩৬-৩৭
নলিনী মোহন শাস্ত্রী এমএ	নলিনী মোহন শাস্ত্রী এমএ ভবভূতি	৭ম ১১শ	প্রথম দ্বিতীয়	১৯২৩-২৪ ১৯২৭-২৮	২২-১৩ ৩১-৩৩

	অশ্রুকণা	১১শ	তৃতীয়	১৯২৭-২৮	৫৯-৬০
	হৈমনী	১৪শ	প্রথম	১৯৩২-৩৩	৭১-৭২
	খঞ্জন-নৃত্য	২০শ	দ্বিতীয়	১৯৩৭-৩৮	১-১
	স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণ	২০শ	দ্বিতীয়	১৯৩৮-৩৯	৯১-৯১
	অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তের মহাপ্রয়াণে	২১শ	প্রথম	১৯৩৮-৩৯	১-২
নীরদভূষণ দে	শরতের শোভা	১১শ	দ্বিতীয়	১৯২৭-২৮	২৫-২৫
নীরদভূষণ দে	শরতের শোভা	১১শ	দ্বিতীয়	১৯২৭-২৮	২৫-২৫
পবিত্র কুমার ধর	ফাগুয়া	১১শ	চতুর্থ	১৯২৭-২৮	৭৭-৭৭
প্রফুল্ল কুমার নাগ	অনুরোধ	চতুর্থ	দ্বিতীয়	১৯২০-২১	৪৮
বিপুল পুরকায়স্থ	মনের মায়া	১৯শ	প্রথম	১৯৩৬-৩৭	৩৩-৩৩
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, এম.এ.	পরিচয়	১৯শ	দ্বিতীয়	১৯৩৬-৩৭	৫৭-৫৯
বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	বাদল	১৯শ	তৃতীয়	১৯৩৬-৩৭	১৫৫-১৫৫
বীরেন্দ্রনাথ আদিত্য	সার্থক	১৯শ	প্রথম	১৯২০-২১	৩০-৩০
বেনজির	কল্পনা	১৯শ	প্রথম	১৯৩৬-৩৭	৪০-৪১
ভূপেশ চন্দ্র পুরকায়স্থ	ফল্গু	১৪শ	দ্বিতীয়	১৯৩২-৩৩	৭৮-৭৯
মহেন্দ্র লাল সেন	সৃষ্টি	১৯শ	তৃতীয়	১৯৩৬-৩৭	১৬৪-৬৪
মো. নিছার আলী লস্কর	আকবর-স্মৃতি	২১শ	প্রথম	১৯৩৮-৩৯	৫৪-৫৬
	নিশীথে	২০শ	তৃতীয়	১৯৩৭-৩৮	১৭৫-৭৫
মোহ-ম্মদ আব্দুল মন্নান	শরৎ	১৬শ	প্রথম	১৯৩৪-৩৫	৪১-৪২
রণবীর কৃষ্ণ সিংহ	নদীর প্রতি	১৬শ	প্রথম	১৯৩৪-৩৫	২৬-২৬
রবীন্দ্রনাথ আদিত্য চৌধুরী	সার্থক	চতুর্থ	প্রথম	১৯২০-২১	৩০
রসময় দাশ	পুরুষ	১৪শ	দ্বিতীয়	১৯৩২-৩৩	৫২-৫২
রসময় ভট্টাচার্য	বিদ্রোহী প্রেম	১৯শ	তৃতীয়	১৯৩৬-৩৭	১৫৯-৬০
রামেন্দ্রকুমার দেশমুখ্য	শারদ-পূর্ণিমায়	২০শ	প্রথম	১৯৩৭-৩৮	৪২-৪২
	এ কলঙ্ক, আলোকের নয়	২০শ	দ্বিতীয়	১৯৩৭-৩৮	১৩১-৩২

রেবতীরমণ ভট্টাচার্য	ভ্রান্তি	১১শ	প্রথম	১৯২৭-২৮	১৭-১৭
শচীন সেন (খোকা)	জগৎ-মুকুর	২১শ	প্রথম	১৯৩৮-৩৯	৪৪-৪৪
শশিভূষণ দাস	রিক্ত পাত্রে নাহ যাব ফিরে	১৬শ	প্রথম	১৯৩৪-৩৫	২৩-২৫
শ্রীরাম চক্রবর্তী	'হারানো আমার সেই সঙ্গীতের লাগি'	১৯শ	প্রথম	১৯৩৬-৩৭	২০-২৭
সরকুম উবেদ উল্লা	সদাই খালির বাঁধ	১৯শ	তৃতীয়	১৯৩৬-৩৭	১৩৭-১৪১
সত্যেন্দ্র মজুমদার	আশীর্বাদ	১১শ	চতুর্থ	১৯২৭-২৮	৯৪-৯৪
সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী	অন্ধকারে মোর বাতায়ন তলে	২০শ	প্রথম	১৯৩৭-৩৮	২৬-২৬
সিকন্দর আলী	হজরত শাহজালাল	৭ম ৭ম	দ্বিতীয় তৃতীয়	১৯২৩-২৪ ১৯২৩-২৪	৪০-৪৬ [?]
সুধাংশু কুমার শর্মা	নব-বর্ষ	৭ম	তৃতীয়	১৯২৩-২৪	৬১-৬৯
সুরেন্দ্রনাথ	রবীন্দ্র-প্রশস্তি	১১শ	তৃতীয়	১৯২৭-২৮	৬২-৬৩
সুরেন্দ্রকুমার মিশ্র	পালন	চতুর্থ	চতুর্থ	১৯২১-২২	১০২-৬
সুশীল দত্ত রায়	'ব্যর্থ বিধাতা আমার, লহ-অর্ঘ্য করুণার	১৪শ	দ্বিতীয়	১৯৩২-৩৩	৫৬-৫৬
সুধাংশু পুরকায়স্থ	তুমি যখন আসবে প্রিয় তোমার স্বর্ণরথে বহুদিন পরে	১৪শ	দ্বিতীয় প্রথম ১৯৩৪-৩৫	১৯৩২-৩৩	৫৯-৬০ ১০-১০
হবিবুর রাহমান	আশা	১৬শ	প্রথম	১৯৩৪-৩৫	১৯-১৯
হিমাংশু দত্ত	পূজার ফুল	২০শ	প্রথম	১৯৩৭-৩৮	৫০-৫০
Anwer Hussain	The Lost Day	১৯শ	প্রথম	১৯৩৬-৩৭	১০২-২
?	সুপ্তি-ভঙ্গ	চতুর্থ	তৃতীয়	১৯২০-২১	৭৬-৭৭

উপর্যুক্ত তালিকায় সনেটের মতো নিটোল কবিতা আছে, আছে ইতিহাস ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত দীর্ঘ কাহিনিকাব্য। ফলে এতে কবিদের প্রতিভার হদিশ যেমন পাওয়া যায় তেমনই সমকালীন চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে সুরমা-উপত্যকার জনমানসের সম্পৃক্তির বিষয়টি পরিস্ফুট হয়।

জীবনীভিত্তিক কবিতা

সাতচল্লিশ পূর্ববতীকালে *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* দুজন বিশিষ্ট ধর্মগুরু—হজরত শাহজালাল

(র.) এবং শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনভিত্তিক দুটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। দুজনই সাধকপুরুষ যাদের ধর্মাচার ও জীবনদর্শন প্রায় হাজার বছর ধরে শ্রীহট্টীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। দুটি কবিতাই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়, তবে শ্রীচৈতন্য দেবকে নিয়ে রচিত কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। মুরারিচাঁদ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র সুরেন্দ্র কুমার মিশ্র চৈতন্য দেবের জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে 'পালন' শীর্ষক কবিতাটি লেখেন।

কবি সুরেন্দ্র কুমার মিশ্র শ্রীচৈতন্যদেবের উত্তরপুরুষ। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু শ্রীচৈতন্যের (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬-১৫ জুন, ১৫৩৪) জীবন। শ্রীচৈতন্য দেব জন্মলাভ করেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায়, মৃত্যুবরণ করেন ওড়িশার উৎকলে। তাঁর পৈতৃক নিবাস সিলেটের গোলাপগঞ্জের ঢাকা দক্ষিণের মিশ্র পাড়ায়। দাদা উপেন্দ্র মিশ্র, দাদি শোভা দেবী। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী বিবাহ পরবর্তী সময়ে এখানেই বসবাস করতেন। শ্রীচৈতন্য যখন মাতৃগর্ভে তখন তার দিদিমা স্বপ্নে দেখেন শচীদেবীর সন্তান যেন অন্যত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীকে নদীয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং বলেন তার নাতি যেন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্রীচৈতন্য দিদিমার আজ্ঞা পালানার্থে দাদার বাড়িতে আগমন করেন। পিতামহী শোভা দেবীর সঙ্গে তাঁর জীবনের খণ্ডাংশ ও তখনকার কথোপকথন বিবৃত করেছেন সুরেন্দ্র কুমার মিশ্র 'পালন' শীর্ষক কবিতায়। অমিত্রাক্ষরের প্রাহমান পয়ারে লিখিত কবিতাটির শব্দযোজনা ও ধ্বনি মাধুর্য মহাপুরুষীয় জীবনবৃত্তান্তের উপযোগী। এতে শ্রীচৈতন্যের জীবনপ্রবাহ এবং কাব্যরসের সন্ধান দুটোই পাওয়া যায়। কবিতাটি দীর্ঘ, এর অংশবিশেষ নিম্নরূপ—

বাহিরিলা শোভাদেবী নামধ্বনি শুনি
সে মহান; তনু তাঁর প্রেমে ডগমগ।
দেখিলেন বাহিরে দাঁড়ায়ে, জ্যোতিষ্মান
পুরুষ প্রবর—পরাজিত হরিদশ্ব
অঙ্গতেজে তাঁর। আজানুলম্বিত বাহু,
উন্নত ললাট, বিস্তৃত নয়ন যুগ,
পূর্ণ অবয়ব সব সুঠাম সুন্দর—
মানুষে সম্ভেনা কভু এই সমন্বয়।
উত্তরিলা পুরুষসুন্দর,—'পিতামহী!
আসিয়াছি তব পৌত্র আজ দেখা দিতে,
মাতৃবাক্য করিতে পালন।' বলিলেন
শোভা,—'চাহি না দেখিতে পৌত্রে সন্ন্যাসীর
বেশ। দেখাও সে রূপ।' নিমিষের মাঝে,
অন্তর্হিত সন্ন্যাসী পুরুষ। ধরিলেন
গৌরাঙ্গ মূরতি, কলিযুগ-অবতার
মূরতি তাহার। মিটিল না শোভা আশা।

(মিশ্র, ১৯২১-২২: ১০৪)

হজরত শাহজালালের (র.) জীবনভিত্তিক কবিতাটির শিরোনাম 'হজরত শাহজালাল'। লিখেছেন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র সিকন্দর আলী। কবিতাটি ১৯২৩-এ কলেজ ম্যাগাজিনের সপ্তম বর্ষের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যায় ধারাবাহিককভাবে প্রকাশিত হয়। হজরত শাহজালাল (র.)-এর সিলেট আগমন, বংশ ও শিষ্যদের পরিচয় এবং শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দের পতন এবং ইসলাম প্রচারের দীর্ঘ একটি আখ্যানমূলক কবিতা 'হজরত শাহজালাল'। এতে রয়েছে ইতিহাস ও মিথের আশ্রয়ে

শাহজালালের জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ—প্রতিটি চার পঙক্তি বিশিষ্ট একশতিনটি চতুষ্পদী। কবি সিকন্দর আলীর কবিতায় পুথিসাহিত্য, মধ্যযুগীয় রোমান্স উপাখ্যান এবং সমকালীন কাব্যরীতির মিশেল লক্ষণীয়। এখানে প্রথম দুটি স্তবক উদ্ধৃত করা হলো—

(১)
আরবে কোরেশ বংশে শুভ জন্মোদয়
পবিত্র 'এমন' ভূমি
বরিলে তাহারে তুমি
ভুবন বিখ্যাত সাধু মাহমুদ-তনয়।

(২)
হে খোদা! তব ইচ্ছা করিতে পূরণ
পুণ্যভূমি সে এমনে
চতুর্দ্দশ খৃষ্ট সনে
পাঠালে তাপসশ্রেষ্ঠ ধার্মিক সুজন।
(আলী, ১৯২৩: ৪০-৪৬)

[মাহমুদ-তনয়>মাহমুদের পুত্র শাহজালাল; এমন> ইয়েমেন রাষ্ট্র]

দুটো কবিতাতেই ইতিহাস ও লোকবিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু এতে কাব্যসৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়নি। হজরত শাহজালাল (র.) ইসলাম ধর্ম ও সুফি জীবনধারার প্রচারক। অপরদিকে শ্রী চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রবর্তক ও বৈষ্ণবীয় জীবনধারার প্রচারক। দুজনই সমাজ সংস্কারক। সিলেটের সমাজজীবনে এ দুটি ভাবধারা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি সিলেটের লোকজীবন ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান পরমত সহিষ্ণুতা ও মিশ্র জীবনাচার এই ভাবান্দোলনের অনিবার্য ফসল বলেই চিহ্নিত করা হয়। এর প্রতিফলন ঘটেছে কলেজ ম্যাগাজিনে।

নিবেদিত কবিতা

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে রচিত অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে*। এগুলোর মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গীরিশ চন্দ্র রায় এবং কলেজের শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশ্য নিবেদিত কবিতা রয়েছে। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলেজের পক্ষে ছাত্রাবাসে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এতে বিপুল জনসমাগমে অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রী স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে কবিকে অভ্যর্থনা জানান।

ব্রিটিশ শাসনকালে মুরারিচাঁদ কলেজ শিক্ষকবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কায়দা ছিল খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ এবং রাজসিক। শিক্ষকবৃন্দের প্রয়াণ, বদলি বা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণজনিত বিদায় উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা একরকম রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। যেমন—অধ্যক্ষ অপূর্বচন্দ্র বিএ (ক্যান্টাব) অবসরগ্রহণ করেন ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, তাঁকে সোনার দোয়াত-কলম এবং খাদির কাপড়ে সূচিকর্মের দ্বারা অভিনন্দনপত্রের বর্ণমালা মুদ্রিত করে শুভেচ্ছা জানান ছাত্রগণ। অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন তৎকালীন শিক্ষার্থী নীহার রঞ্জন রায়, চন্দ্রবিনোদ দাস পাঠ করেন স্বরচিত কবিতা। এটি একটি দীর্ঘ কবিতা যা প্রকাশিত হয় ১৯২৪-এ। কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

যাও, তবে যাও বীর
কর্মক্লান্ত জীবনের অপরাহ্নে শান্তি

কর লাভ, রেখ শুধু হৃদি পরে সেহ
টুকু তব, অক্ষয় পাত্রের মত, দানে
মুক্ত তবু। আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য রচে
দিক, অন্তর-কন্দরে তব, দুই ফোটা
উজ্জ্বল মুকুতা স্মৃতির কণিকা রূপে।

(দাস, ১৯২৪ক: ৩৯)

চন্দ্র বিনোদ দাস ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'সুরমা-উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনী'র সভাপতি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে স্বাগত জানিয়ে 'স্বাগতম' নামক স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করেন। 'সুরমা-উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনী' গঠিত হয়েছিল 'সুরমা-উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনী' নামক সংগঠনের দ্বারা। উদ্দেশ্য ছিল সিলেট ও কাছাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও বয়কট কর্মসূচিকে ঐক্যবদ্ধ করে সমন্বিত আন্দোলন করা এবং আত্মজাগরণের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সংগঠিত ও অর্থবহ করে তোলা। এর একটি শ্রীহট্টীয় পটভূমিও ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে 'সুরমা-উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সংস্থাটি তৎকালীন সিলেটে অন্তত নয়টি অধিবেশনে মিলিত হয় যার প্রতিটি ছিল কয়েকদিনব্যাপী। ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২২ আগস্ট ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জে। এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধরী, অধিবেশন সভাপতি ছিলেন সরোজিনী নাইডু, বক্তা ছিলেন শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস ও ক্ষিরোদচন্দ্র দেব। সম্ভবত এসময়েই পৃথক কোনও অধিবেশনে 'সুরমা-উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনী'র সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র চন্দ্রবিনোদ দাস আলোচ্য কবিতাটি তাঁকে নিবেদন করেন। কবিতাটির সূচনা অংশ নিম্নরূপ—

বাঙ্গালার গৌরবের ধন, হে আচার্য স্বাগত তোমায়,
উদ্ভাসিয়া দিলে মার মুখ, হৃদয়ের অপূর্ব বিভায়।
বাঙ্গালার এক প্রান্তে যদি,
আসিয়াছ ভগ্ন স্বাস্থ্যে—নাই তব দয়ার অবধি—
রাখিয়াছ তুচ্ছ নিমন্ত্রণে,
আসিয়াছ দরিদ্রের এ ক্ষুদ্র ভবনে,
কিবা দিব আর,
লহ লহ হৃদয়ের ভক্তিসিক্ত দীন অর্ঘ্য ভার;
তবু হীন নহে,
তুচ্ছ দীন হতে পারে তাহা, তবু তাহে রহে
মর্যাদার বিশুভ্র গৌরব,
ভণ্ডামির বিলাসিতা হীন, আছে এক পবিত্র সৌরভ।

(দাস, ১৯২৪খ: ৭০)

চন্দ্রবিনোদ দাস ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯২১-২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজ হতে আইএ ও বিএ পাস করেন। পরবর্তীকালে এমএ ও এলএলবি পাস করে আইন পেশা এবং কৃষক আন্দোলন ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

মুরারিচাঁদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের পতি নিবেদিত কবিতা আছে অনেক। রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে 'ফাউন্ডার্স ডে' পালনের রেওয়াজ চালু করেন অধ্যক্ষ ডেবিড থমসন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে উদযাপিত 'ফাউন্ডার্স ডে'-তে আবদুল গফ্ফার দত্তচৌধুরী 'গিরীশ-প্রশস্তি'

শিরোনামে গিরীশচন্দ্রকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির শেষ চার চরণ এখানে উদ্ধৃত হলো—

অবতার কোনও হও নিক তুমি, দেবতা হওনি—তাই
দু'বাহু বাড়ায়ে বক্ষে আমরা তোমারে বাঁধিতে পাই;
তুমি ছিলে ওগো আমাদের মাঝে মহীয়ান গরীয়ান,
তাই সবে মিলি গেয়ে যাই আজি 'জয় গিরীশের' গান।
(চৌধুরী, ১৯৩২: ৬৬)

এ কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয় আবদুল গফ্‌ফার দত্তচৌধুরী তখন মুরারিচাঁদ কলেজের কলা শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। পরবর্তীকালে তিনি কবি ও গীতিকার হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'বিধুর' নামে তাঁর একটি সনেট কলেজ ম্যাগাজিনে (*The Murarichand College Magazine,* vol:-xvi 1934-35, no: 1, p.1) প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। এ-সময় তিনি কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছেন।

নলিনীমোহন শাস্ত্রীর কবিতা পাওয়া যায় সাতটি। যথা—'রামমোহন-স্মৃতি'; 'ভবভূতি'; 'অশ্রুকণা'; 'হৈমনী'; 'খঞ্জন-নৃত্য'; 'স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণে'; 'অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তের মহাপ্রয়াণে'। এগুলোর মধ্যে 'রামমোহন-স্মৃতি'; 'স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণে'; 'অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তের মহাপ্রয়াণে' কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে শিরোনামীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন। নলিনীমোহন শাস্ত্রী ১৯১৩-৪০ খ্রি. পর্যন্ত মুরারিচাঁদ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর 'রামমোহন-স্মৃতি' কবিতার কিছুটা উদ্ধৃত হলো—

অন্ধকারে বলছে সবায় 'জ্বালরে বাতি জ্বাল্
আজ যদি শেষ করতে পারিস রাখিস্‌নে আর কাল'।
রাম মোহনের অরূপ রূপে যাচ্ছে ভরি দেশ
জীবন তাহার সকল নহে—মৃত্যু নহে শেষ!
(শাস্ত্রী, ১৯২৩: ২৩)

২১ বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই নলিনীমোহন শাস্ত্রীর 'অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তের মহাপ্রয়াণে' নামে আরেকটি নিবেদিত কবিতা মুদ্রিত হয়। কিশোরীমোহন গুপ্ত (১৮৯২-১৯৩৮) ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক ও পুরাতত্ত্ববিদ। তাঁর মৃত্যু যে শুধু নলিনীমোহন শাস্ত্রীর মনোলোকে বিষাদের ছায়া ফেলে তা নয়, কলেজের সামগ্রিক পরিবেশে একটি বেদনাময় পরিবেশ বিস্তৃত হয়। সে বছর নবীনবরণ অনুষ্ঠান যথাসময়ে করা হয়নি এবং পরবর্তীকালে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে তা সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুতে কলেজ ম্যাগাজিনের ২১শ বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ধীরেন সেন অপরিমেয় শোক প্রকাশ করে পরবর্তী সংখ্যাটিকে 'কে এম গুপ্ত সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাষায়—

> অকালে তাঁহার [অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্ত] এই আকস্মিক মহাপ্রয়াণে কলেজের যে কি ক্ষতি হইয়াছে এবং আমরা কি নিদারুণ মর্মবেদনা 'অনুভব করিতেছি, তাহা ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমাদের নাই। তাহার এই অকালমৃত্যুতে শুধু ছাত্রদের নয়, শ্রীহট্টবাসী জনসাধারণেরও খুব ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীহট্টবাসী তাঁহাকে কোন দিন ভুলিবে না—ভুলিতে পারে না। কারণ শ্রীহট্টবাসী অনেক বিষয়ে তাহার নিকট ঋণী। তিনি শ্রীহট্টের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। [...] তাহার মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্রই শ্রীহট্টবাসী জনসাধারণ—ছাত্রদের তো কথাই নাই—তাহার মনোরম বাসভবনে উপস্থিত হন এবং একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাহাকে শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানে স্থানে শোকসভা করিয়া তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য

> প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। [...] ১৯ আগস্ট কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ লাইব্রেরি গৃহে সমবেত হইয়া ড. কিশোরীমোহন গুপ্তের আত্মার সদগতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন [...] আমরা বর্তমানে একটি কে এম গুপ্ত স্মৃতিসংখ্যা বাহির করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। (সেন, ১৯৩৯: ৬০)

সম্পাদকের এরকম সিদ্ধান্ত ছাত্রসংসদের বা কলেজ প্রশাসনের মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি। ঘোষণা অনুযায়ী মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনের ২১শ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি 'কে এম গুপ্ত সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয় যাতে অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তকে নিয়ে দুটি প্রবন্ধ, একটি কবিতা এবং সম্পাদকীয় ছিল। অধ্যাপক শাস্ত্রীর কবিতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক—

> নগরীর দীপ্তলোকে লহ নি ত ঠাঁই
> গোপনে করেছ কাজ—যশ চাহ নাই
> বাঙ্গালার এক প্রান্তে জীবনের ধারা
> মন্দীভূত চলে যেথা—যেথা দিশাহারা
> [...]
> ছিল তব কাঁটাবনে সৌধ তোলা কাজ,
> সে অদম্য শক্তি তব গেল নাকি আজ?
> [...]
> একদিন—মনে আছে—সাবলীল হাসে
> স্মিতমুখে বলেছিলে—'মৃত্যু যদি আসে
> দাঁড়াতে কহিব তারে করি' অনুনয়,—
> মরিবার একদন্ড নাহি যে সময়!'
>
> (শাস্ত্রী, ১৯৩৯: ১)

সহকর্মীর প্রতি নিবেদিত এ কবিতার অনুভূতির জায়গাটি বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন এবং শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। অধ্যাপক ড. কিশোরীমোহন গুপ্ত মৃত্যুবরণ করেন ১৭ আগস্ট ১৯৩৮ সালে। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। ত্রিপুরা জেলার (কুমিল্লা) কসবা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে ১৯১৪ সালে এম এ পাস করেন ইংরেজি ও ইতিহাসে। দুবছর অধ্যাপনা করেন বঙ্গাবাসী কলেজে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্ত ছিলেন পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক।

কবি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরকে নিবেদন করে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র সুধাংশু কুমার শর্মা রচনা করেন 'রবীন্দ্র-প্রশস্তি' শিরোনামে একটি কবিতা। কবিতাটি সুনামগঞ্জ 'তরুণ সংঘ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'রবীন্দ্রজন্মোৎসব' অনুষ্ঠানে তিনি পাঠ করেন (শর্মা, ১৯২৭: ৬৩)। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাগাজিনের একাদশ বর্ষে।

প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা

প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাই বেশিসংখ্যক পরিদৃষ্ট হয় কলেজ ম্যাগাজিনে। সংখ্যাগত দিক থেকে অধ্যাপক নলিনামোহন শাস্ত্রী অগ্রণী। নিবেদনমূলক বা উৎসর্গীকৃত কবিতা ছাড়াও ভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকে রচিত তাঁর যে কয়েকটি কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা এককথায় অসামান্য।

যেমন—

খঞ্জন নেচে চলে উচ্চ পুচ্ছ দোলে টিক্‌টিক্
অঞ্জন কোয়াসায় পুঞ্জিত ধোঁয়াভরা দশ্‌দিক
অঞ্জন আঁখি ঠারে বিদ্যুত চমকায় পর্‌দায়্
খঞ্জন নেচে চলে অঞ্জন কোয়াসার ঝরনায়!

(শাস্ত্রী, ১৯৩৭: ১)

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য ছিলেন সব্যসাচী লেখক—ম্যাগাজিনে তার একাধিক কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ পাওয়া যায়। কলেজ-ইউনিয়ন কমিটিতে ম্যাগাজিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন ১৯২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে; সম্পাদনা করেছেন ম্যাগাজিনের ১১শ বর্ষের সবকটি সংখ্যা। বলা বাহুল্য সবক্ষেত্রেই তিনি উন্নত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর চারটি কবিতা পাওয়া যায় ম্যাগাজিনে; সবই রোমান্টিক।

অশোকবিজয় রাহার চারটি কবিতা পাওয়া যায় কলেজ ম্যাগাজিনে। ছাত্রজীবনেই অশোকবিজয় রাহা কবি হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান—সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুল ম্যাগাজিন, মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন, এবং সিলেট থেকে প্রকাশিত *কমলা* ও *বলাকা* সাহিত্যপত্রে তাঁর কবিতাবলি প্রকাশিত হয়। অশোকবিজয় রাহা যখন মুরারিচাঁদ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণির সাহিত্য শাখার ছাত্র, তখন লেখেন 'ভোরের আলোয়' কবিতা। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

ভোরের আলোয়

আজ বনে বনে প্রভাত বায়ু কিসের এমন পাগল পারা
কী বলে গেছে! গন্ধ বেড়ায় আপন হারা,
ডালপালা সব এমন করে চমক্-ভাঙা বাঁশীটি কার
উঠ্‌ল যে নেচে! উঠ্‌ল রে বেজে!
রূপের আলোয় এমন করে কেন রে আজ পাখির গানে
আকাশ রাঙিয়া— পরান জাগে প্রাণে প্রাণে,
কে আসে ঐ ঢেউ-এর মেলায় কেন এমন ভুবন খানি
আঁধার ভাঙিয়া! সোনায় সেজেছে!

(রাহা, ১৯২৭: ৩৫)

মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন, ১১শ বর্ষের প্রকাশকাল হচ্ছে ১৯২৭-২৮, এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ভোরের আলোয়' (আজ বনে বনে প্রভাত বায়ু); চতুর্থ সংখ্যায় 'শরৎ-প্রাতে' (মোর জীবনে এই শরতের রৌদ্র-উজল দিবা); তখন অশোকবিজয় মুরারিচাঁদ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। 'মরু-সন্ধ্যা' (দিনান্তের রক্তমাখা দুই খণ্ড মেঘে) প্রকাশিত হয় ২০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়, 'রাতের সোওয়ার' প্রকাশিত হয় তৃতীয় সংখ্যায়, এগুলোর প্রকাশকাল ১৯৩৭-৩৮। তাঁর 'কাব্য ও বিজ্ঞান' শিরোনামের প্রবন্ধটি প্রকাশিত ১৯ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায়, এটির প্রকাশকাল ১৯৩৬-৩৭। এসময়ে তিনি আর মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র নন, বিএ অনার্স পাস করে পুরোদস্তুর অধ্যাপক। কিন্তু কলেজের সঙ্গে যোগাযোগের সুতোটা বজায় ছিল লেখালেখির মধ্য দিয়েই। কাছাড়ের চা-বাগানে চাকুরিরত পিতার সঙ্গে তাঁর শৈশব কাটে, সিলেটের আরণ্যক জীবন ছিল কৈশোর ও যৌবনের বিচরণক্ষেত্র, এর প্রতিফলন ঘটেছে তার কাব্যে। বেশ দীর্ঘ কবিতা 'রাতের সোওয়ার' হতে নমুনা হিসেবে কিছুটা উদ্ধৃত হলো—

এ আমি কোথায় চলেছি?
যখন খেয়াল হোলো
চেয়ে দেখি, চাঁদ আর নেই।
পশ্চিম-দিগন্তের খানিকটা জায়গা
বিবর্ণ ধূসর,
যেন ওখানে কা'র চিতার আগুন নিব্‌ছে।
বাকী আকাশে ছড়িয়ে আছে
তা'রি কয়েক মুষ্টি ছাই আর ভস্মকণা।
নীচের পৃথিবীতেও
যেন এইমাত্র কা'র চিতা জুড়'লো।

(রাহা, ১৯৩৭: ১৫৮–৬২)

একটি করে যাদের কবিতা পাওয়া গিয়েছে ম্যাগাজিনে, তাঁদের কবিতা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। পবিত্রকুমার ধরের একটি কবিতা রয়েছে 'ফাগুয়া' নামে। কবিতাটি প্রথমাংশ নিমরূপ—

ফাল্গুনে ফাগুয়া রঙিন রাগে।
অঙ্গিমা ঢুলু ঢুলু বিবশানুরাগে
রক্ত হলুদ কাল পীত ধারা অঙ্গো
ফাল্গুন ফাগে।

দিলখানি ফুলরাগে রঞ্জিল কে আগে!
দিগকুল মস্‌গুল—
রবি ফুল অর্ঘ্যে;
বুল্ বুল্ ফুৎকারে,
চিৎকারে কি মাগে
ফাল্গুন ফাগে।

(ধর, ১৯২৮: ৭৭)

সুধাংশু কুমার শর্মার কবিতা 'নব-বর্ষ' প্রকাশিত হয় ১১শ বর্ষের প্রথম সংখ্যায়। তখন তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

হে নব বর্ষ
কালিকার চৈত্র নিশা শেষে—
এলে হেসে
পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে
দুঃখ-সুখ-ভয় জরা-মৃত্যু যত।
করিতে বরণ,—
আর একটি বরষের মত
জীবনেরে শুভ শঙ্খ নাদে।

(শর্মা, ১৯২৭: ০১)

রসময় দাসের কবিতা 'পুরুষ'। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে যখন কবিতাটি প্রকাশিত হয় তখন তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। এটিও একটি ছোটো অথচ চমৎকার কবিতা যাতে পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দহন ব্যক্ত হয়েছে। শুধু পুরুষ অথবা নারীকে নিয়ে লিখিত কবিতা অবশ্য আর একটিও নেই। 'পুরুষ' কবিতার নির্বাচিত অংশ—

ক্ষুদ্রনর, তবু মোরা পারিব না কাঁদিতে
পুরুষের অশ্রু কভু শোভা নাহি পায়,
জ্বলন্ত অঙ্গারসম বিফল হাসিতে
ঢাকিয়া রাখিতে হবে অনন্ত ব্যথায়!

(দাশ, ১৯৩২: ৫২)

'ব্যর্থ বিধাতা আমার—লহ অর্ঘ্য করুণার' কবিতাটির লেখক সুশীতল দত্ত রায়। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তাঁর কবিতা প্রথম কয়েকটি চরণ নিমরূপ—

যে তারা পেল না আলো,
ভ্রষ্ট হল—
নক্ষত্রের আলোক সভায়; মোর গান
তাহাদেরই তরে!

(রায়, ১৯৩২: ৫৬)

'তুমি যখন আসবে প্রিয় তোমার স্বর্ণরথে' কবিতাটি লিখেছেন সুধাংশু পুরকায়স্থ। তাঁর প্রকৃত নাম সুধাংশু শেখর পুরকায়স্থ। তিনি প্রথম বর্ষ কলা শাখার ছাত্র, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক পাস করেন। কর্মজীবনে সিলেট মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করেন। কবিতাটির প্রথম স্তবক—

১
তুমি যখন আসবে প্রিয় তোমার স্বর্ণরথে
ফুটবে তারা
আপনহারা
তোমার সাথে সাথে—।
স্বর্ণকমল উঠবে ফুটে তোমার পথে পথে।

(পুরকায়স্থ, ১৯৩২: ৫৯)

রামেন্দ্রকুমার দেশমুখ্যের দুটি কবিতা এবং একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। কবিতা দুটির শিরোনাম যথাক্রমে 'শারদ-পূর্ণিমায়' এবং 'এ কলংক, আলোকের নয়'। প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কলেজ ম্যাগাজিনের ২০শ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায়। প্রথমে 'শারদ-পূর্ণিমা' হতে নমুনা দেওয়া যাক—

সুর-সুন্দরী মুখ খুলিয়াছে, রূপ-পিয়াসিরা জাগো!
তারার বাসরে যে কবি জাগিছে, করুণা তাহার মাগো,
রূপ-পিয়াসিরা জাগো!
গলি পড়ে তা'র সোনার তনিমা ধূসর ধরণী বুকে
শেফালি বনের উন্মাদনায় কেশের গন্ধ লুটে
নবকন্দের কুঁড়ির বুকেতে প্রাণ হিল্লোলি' উঠে
নিখিলের যত ভীরু প্রেম বুঝি কাঁপে তার নীল চোখে।

(দেশমুখ্য, ১৯৩৭)

'এ কলংক, আলোকের নয়' একটি অনিন্দ্যসুন্দর গদ্য কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিজীবনের শেষ দিকে গদ্যকবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ত্রিশের দশকের কবিগোষ্ঠীর কাব্যচর্চার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে তখন গদ্য কবিতা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রামেন্দ্রকুমার দেশমুখ্যের কবিতায় যে 'চিত্ররূপময়তা'র প্রকাশ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে উন্নত প্রতিভার নিদশন। কবিতাটি হতে উদ্ধৃতি

দেয়া যাক—

হাওয়াজানলার ওপাশে বেঁধেছে চপল পায়রা নীড়
এ পাশে কখন ভিড়িল, জানিনে, শালিক পাখি—
ওপারের ঘন শালের বনের পথিক শালিক, এ যে।
তারপর, একদিন—
ভোরে উঠে দেখি, শেলফে, টেবিলে পায়রার ছেঁড়া পাখ।
সাগর পারের খবরে পেলাম, বড়বা-অনল জ্বলে;—
হাওয়াজানলায়, পায়রা-শালিক ম্লান—
ধূসর শালিক পেয়েছে প্রথম প্রভাতের উত্তাপ,
ভীতির চিহ্ন অসহায় নীল চোখ।

(দেশমুখ্য, ১৯৩৭: ১৩১)

মুরারিচাঁদ কলেজকেন্দ্রিক কাব্যচর্চায় মুসলিম শিক্ষার্থী কর্তৃক রচিত কবিতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। সিকন্দর আলির 'হজরত শাহজালাল' (১৯২৩) এবং আবদুল গফফার দত্তচৌধুরীর 'গিরীশ-প্রশস্তি' (১৯৩২) ও 'বিধুর' (১৯৩৪) কবিতা দুটি সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, হবিবুর রাহমানের 'আশা' (১৯৩৪), সরকুম উবেদ উল্লার 'সদাইখালির বিল' (১৯৩৭), মোহ-ম্মদ আব্দুল মন্নানের 'শরৎ' (১৯৩৪), মো. নিছার আলী লস্করের 'আকবর-স্মৃতি' (১৯৩৭) এবং 'নিশীথে' (১৯৩৮), বেনজিরের 'কল্পনা' (১৯৩৬), চেরাগ উদ্দীনের 'সকল পথে পথ' (১৯৩৪), গোলাম কাদিরের 'উন্মেষ' (১৯৩৭) প্রভৃতি কবিতা নিজস্ব কাব্যভাবনার দ্বারা রঞ্জিত। এখানে মো. নিছার আলী লস্করের কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো—

সন্ধ্যার স্তিমিতালোক, গোধূলির লুপ্ত রাগ পরে'
ধীরে ধীরে মিশে যায় অনন্ত, অসীম নীলাম্বরে;
কোথা হতে ভেসে আসে অশ্রুত সঙ্গীত লহরী,
অপূর্ব আবেগ মাখা ভাষা তার, বুঝিতে না পারি।

(লস্কর, ১৯৩৮: ১৭৫)

সরকুম উবেদ উল্লার 'সদাই খালির বাঁধ' শিরোনামে একটি আখ্যানকাব্য রয়েছে ১৯ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়। কবিতাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে সদাই ও সোহাগী। কবিতাটির ভাষা ও রচনাসৌষ্ঠব 'নকসীকাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের কথা মনে করিয়ে দেয়। সরকুম উবেদ উল্লা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে 'সদাই খালির বাঁধ' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর কবিতাটির কিছুটা নমুনা দেওয়া হলো—

কালিয়া বাঁশরী থেমে গেল যেন নাগিনীর দেখা পেয়ে
সদাই শুধায় (এতখনে এলে) বালিকার মুখ চেয়ে।
সোহাগী লো আজ বহু কথা আছে বস মোর কাছে এসে
তোমারে ছাড়িয়ে বুঝি যেতে হয় অজানা কোন দেশে।
বাড়িতে আমার বিয়ের জোগাড় হইয়াছে আজ শুরু
অজানা ব্যথায় সোহাগীর প্রাণ করে উঠে দুরু দুরু।

(উল্লা, ১৯৩৭: ১৩৭-১৪১)

১৯১৭-৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে কয়েকজন মহিলা লেখিকার গল্প ও প্রবন্ধ পাওয়া গেলেও কবিতা পাওয়া যায় একজনের। কবির নাম কণিকা চৌধুরী; কবিতা 'দুঃখের বোঝা'। একটি দীর্ঘ গদ্য কবিতা যার বিষয় ও আঙ্গিক অসাধারণ। কবিতাটি থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হলো—

ধীরে ধীরে যায় দিন অতীতের মাঝে—
দুঃসহ বেদনা ভুলি':
[...]
গ্রামের পশ্চিম দিকে বাঁশঝাড় যত,
নুয়ে আছে, মনে হয় ক্লান্ত তারা বড়।
[...]
দুয়ারের পাশে এক দরিদ্র বালিকা,
দাঁড়ায়ে রয়েছে স্থির
[...]
গ্রামের দক্ষিণ দিকে বাঁকা পথখানি
কোথা গেছে নাহি জানে
তবু মনে হয়
এই পথ ধরি
এখনি আসিবে পিতা।
[...]
অকস্মাৎ চারিদিকে কোলাহল শুনি'
চমকি উঠিল মেয়ে চিন্তায় আকুল।
চোখে দেখে—
পিতা তার ভূয়ে অচেতন।
বন্ধুজন সবে—
এনেছে বহিয়া তা'র সংজ্ঞাহীন দেহ,
দারুণ যন্ত্রের চক্রে পিষ্ট হয়ে গিয়ে—
মৃত্যু আজি ঘটেছে পিতার।
জড়ায়ে ধরিল বাপে-অশ্রুহীন চোখ।
মুহূর্তে থামিল কোলাহল—
দূরে ডাকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা
রজনী নীরব।

(চৌধুরী, ১৯৩৭: ৪৭-৪৯)

এ কবিতার বিষয় পিতৃহারা কন্যাহৃদয়; যন্ত্রের চাকায় পিষ্ট পিতার নিথর দেহ দেখে কন্যার 'অশ্রুহীন চোখ' যে অনিঃশেষ বেদনার ছবি প্রকাশ করে জগতের কোলাহল তাতেই থেমে যায়, দূরে ঝিঁঝি পোকা ছাড়া পিতার নিথর দেহের সঙ্গে রজনিও একাত্ম হয়ে নীরব থেকে যায়। কণিকা চৌধুরী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর কবিতাটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে নিঃসন্দেহে।

ভাষান্তরিত কবিতা

ছয়টি ভাষান্তরিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কলেজ ম্যাগাজিনের বিভিন্ন সংখ্যায়। সংস্কৃত কবি কালিদাসের *কুমার সম্ভব কাব্য* থেকে 'হিমালয় বর্ণন' ও 'হিমালয় পরিণয় ও পার্বতীর জন্ম' শিরোনামে অংশবিশেষ ভাষান্তর করেছেন ব্রজেন্দ্র কুমার আচার্য। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ভাষান্তর করেছেন ইংরেজ কবি শেলির কবিতা অবলম্বনে 'স্মৃতি', অধ্যাপক এসসি সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কবিতার ইংরেজি ভাষান্তর করেছেন 'Translation from Tagore' নামে। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য 'বিষাদ-গাথা' নামে ১৯৩৮-এ একটি কবিতা অনুবাদ করেন, কবিতাটি কিসের অনুবাদ তা জানা যায় না। নিচে বিভিন্ন সময়ে ভাষান্তরিত কবিতার একটি সারণি প্রদান করা হলো—

সারণি—৫: *মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত ভাষান্তরিত কবিতা, অনুবাদকের নাম ও প্রকাশকাল

লেখক	প্রবন্ধের শিরোনাম	মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন			
		বর্ষ	সংখ্যা	প্রকাশকাল	পৃষ্ঠা
বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	বিষাদ-গাথা (অনু?)	১৯শ	প্রথম	১৯৩৬-৩৭	৫-৯
ব্রজেন্দ্র কুমার আচার্য্য,	হিমালয় বর্ণ (কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' হইতে); হিমালয় পরিণয় ও পার্বতীর জন্ম	চতুর্থ চতুর্থ	দ্বিতীয় তৃতীয়	১৯২০-২ ১৯২০-২১	৪৪-৪৬ ৭৮-৭৭
শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	স্মৃতি (শেলির কবিতা হতে)	৫ম	দ্বিতীয়	১৯২১-২২	৪৮-৪৮
S C Sen Gupta MA	Translation from Tagore	১৬শ	প্রথম	১৯৩৪-৩৫	৮-৮

এখানে অধ্যাপক এসসি সেনগুপ্ত কৃত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত হলো—

> Sweetly shall I sing the ditty, O Lord! But give me the voice and teach me the tune.
> In melodious note shall I pipe forth the song, so long as thou reignest on the lotus-seat of my heart and fillest with my love.
> But near me when I sing and let me benign eyes shed their nectar on me.
> By the loving touch do Thou remove my sorrows their pangs and from my pleasures their pride.
> And so shall I sing the song in all its greatness and melody.
>
> (Sengupta, 1934: 8)

অবশ্য মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে শুধু বিভিন্ন ভাষার কবিতার ভাষান্তর প্রকাশিত হয়নি—গল্প, প্রবন্ধ ও লোকসাহিত্যের ভাষান্তর করেছেন অনেকে। অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়া প্রধানত কলেজের শিক্ষকবৃন্দই এসব অনুবাদ করেছেন। ইংরেজি, রুশ, ফরাসি, ফারসি, উর্দু এবং সংস্কৃত সাহিত্যে থেকে এসব ভাষান্তর করা হয়েছে। অনুবাদ কর্ম একটি দুরূহ বিষয়। কিন্তু মুরারিয়ানদের ভাষান্তর সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। অনূদিত কবিতাসমূহ কতটা মূলানুগ সেটি এ প্রবন্ধের বিবেচ্য নয়। বরং বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার অথবা বাংলা সাহিত্যের সামগ্রী অপর ভাষায় অনুবাদের প্রয়াস একটি

বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, একথা মানতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় মুরারিচাঁদ কলেজকেন্দ্রিক কাব্যচর্চার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কাব্যচর্চার প্রথম দিকে কবিতাগুলো ছিল দীর্ঘ এবং ইতিহাস ও মিথাশ্রয়ী। ভাষাও ছিল তৎসম শব্দবহুল। ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক—কবিতাগুলো হয়ে ওঠে ছোটো নিটোল কবিতা, পৌরাণিকতার বদলে কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে প্রেম-প্রকৃতি ও সমাজভাবনা। দীর্ঘ কাহিনিকাব্যের বদলে কবিতা অর্জন করেছে ঋজুভঙ্গি ও নির্মেদ কলেবর এবং নতুন আঙ্গিক ও গদ্যভাষা। এসব বৈশিষ্ট্য নব জাগরণের পরিচয় বহন করে—ব্যক্তির ভেতরে ব্যক্তিত্ব তৈরি হওয়ার আভাস পাওয়া যায়। কবিতা রচনা ও পাঠের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দকে বরণ ও বিদায় জানানোর রীতিটাও বেশ চর্চিত হয়েছে মুরারিচাঁদ কলেজে। এসবই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করেছে ছাত্র-সংসদ অথবা বিভিন্ন ক্লাব। কলেজ ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে শিক্ষকের প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানানোর উদাহরণ খুবই তাৎপর্যময় ঘটনা। এর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্য আছে নিশ্চয়ই। মুরারিচাঁদ কলেজের বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলের বদৌলতে এই রেনেসাঁ প্রয়াস বিকশিত হয়েছিল, এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্রনির্দেশ

আলী, সিকন্দর (১৯২৩)। 'হজরত শাহজালাল'। *The Murariichand College Magazine,* Vol.,VII., No. II, 1923-24, pp. 40-46;

উল্লা, সরকুম উবেদ (১৯৩৭)। 'সদাই খালির বাঁধ'। *The Murariichand College Magazine,* Vol., XIX, No. 3, 1936-37, pp. 137-141;

উদ্দিন, মোহাম্মদ বিলাল (২০২১)। 'মুরারিচাঁদ কলেজে বিজ্ঞানচর্চা (১৮৯২-১৯৪৭)'। *মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল,* দ্বিতীয় বর্ষ: প্রথম সংখ্যা। সম্পা. প্রফেসর মো. শফিউল আলম, মুরারিচাঁদ কলেজে, সিলেট;

উদ্দিন, মোহাম্মদ বিলাল (২০২১)। '*মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত গল্পে সুরমা-উপত্যকার জনজীবন'। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা,* ৬৫ বর্ষ: চতুর্থ সংখ্যা। সম্পা. মুহম্মদ নূরুল হুদা, ঢাকা, বাংলা একাডেমি;

চৌধুরী, আবদুল গফফার (১৯৩২)। 'গিরীশ-প্রশস্তি। *The Murariichand College Magazine,* Vol. XIV, No. 2, 1932-33, p. 66;

চৌধুরী, কণিকা (১৯৩৭)। 'দুঃখের বোঝা'। *The Murariichand College Magazine,* Vol. XX, No. I, 1937-38, pp. 47-49;

দাস, চন্দ্র বিনোদ (১৯২৪ক)। 'প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দ্র দত্ত বি.এ (কেন্টাব) মহাশয়ের প্রতি'। *The Murariichand College Magazine,* Vol.VII., No. I, 1923-1924., pp. 39;

দাস, চন্দ্র বিনোদ (১৯২৪খ)। 'স্বাগতম'। *The Murariichand College Magazine,* Vol.VII., No. II, 1923-1924., p. 70;

দেশমুখ্য, রামেন্দ্রকুমার (১৯৩৭)। 'শারদ-পূর্ণিমা'। *The Murariichand College Magazine,* Vol. XX, No. I, 1937-38, p. 42;

দেশমুখ্য, রামেন্দ্রকুমার (১৯৩৭)। 'এ কলংক, আলোকের নয়'। *The Murariichand College Magazine,* Vol. XX, No. II, 1937-38, pp. 131-32;

ধর, পবিত্রকুমার (১৯২৮)। 'ফাগুয়া '। *The Murauichand College Magazine,* Vol. XI, No. IV, 1927-28, p.77;

মিশ্র, সুরেন্দ্র কুমার (১৯২২)। 'পালন'। *The Murariichand College Magazine,* Vol. IV. No. II., 1921-22, pp. 102-6

রায়, সুশীতল দত্ত (১৯৩২)। 'ব্যর্থ বিধাতা আমার—লহ অর্ঘ্য করুণার'। *The Murariichand College Magazine*, Vol. XIV, No. 2, 1932-33, p. 56;

রাহা, অশোকবিজয় (১৯২৭)। 'ভোরের আলোয়'। *The Murariichand College Magazine*, Vol. XI, No. 2, 1927-28, pp.35-36;

রাহা, অশোকবিজয় (১৯৩৭)। 'রাতের সোওয়ার'। *The Murariichand College Magazine*,Vol. XX, No. III. 1937-38, pp. 158-62;

লস্কর, মো. নিছার আলী (১৯৩৮)। 'নিশীথে'। *The Murariichand College Magazine*, Vol. XX, No. I, 1937-38, pp.175;

শর্মা, সুধাংশু কুমার (১৯২৭)। 'নব-বর্ষ'। *The Murauichand College Magazine*, Vol. XI, No. I, 1927-28, p.1;

শাস্ত্রী, নলিনীমোহন (১৯২৩)। 'রাম মোহন স্মৃতি'। *The Murariichand College Magazine*, Vol.VII, No. I, 1923-1924, p.23;

শাস্ত্রী, নলিনীমোহন (১৯৩৮)। 'খঞ্জন নৃত্য'। *The Murariichand College Magazine*, Vol. XX, No. I, 1937-38, p. 1;

শাস্ত্রী, নলিনীমোহন (১৯৩৯)। 'অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তের মহাপ্রয়াণে'। *The Murariichand College Magazine*, Vol. XXI, No. II, 1938-39, p. 1;

সেন, ধীরেন (১৯৩৮)। 'সম্পাদকীয়'। *The Murariichand College Magazine*,Vol. XXI, No. II, 1938-39, p. 60;

Sengupta, S. C. (1934). 'Translation from Tagore'. *The Murariichand College Magazine*,Vol. XVI, No. I, 1934-35, p. 8;

ISSN 2707-9201

সিলেটি প্রবাদ: জীবনবোধ ও সমাজদর্শন

আজির উদ্দিন*

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত সিলেট লোকসাহিত্যের রত্নভান্ডার। আবহমানকাল থেকেই বঙ্গীয় বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলেও বাংলা প্রবাদচর্চা হয়ে আসছে; মানুষের মুখে মুখে এসব প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষ গল্পকথার প্রয়োজনে একে অন্যের কাছে প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে এসকল প্রবাদ ব্যবহার করে। এসব প্রবাদের ভেতরে রয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়, ভবিষ্যৎবাদ, জীবনবোধ, লোকবিশ্বাস, শ্রেণিচেতনা, দারিদ্র্যজীবন, নারী ও যৌনচেতনা। লোকায়ত বাংলার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলো জড়িয়ে আছে হাজার বছর ধরে। বিবাহবহির্ভূত প্রেম, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যৌনতার বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে। সিলেটি প্রবাদে যুক্ত হওয়া এসব বিষয় বাঙালির কাছে যেমন পরিচিত তেমনই বাস্তবানুগ। তাই এসকল প্রবাদের মর্মমূলে রয়েছে গভীর জীবনবোধ, লোকায়ত সমাজদর্শন, সামাজিক অভিব্যক্তি, প্রজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতার নিপুণ বিন্যাস। যেখানে ধরা পড়ে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের স্বরূপ, চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক অভিযোজন। সিলেটি প্রবাদের এই অভিনিবেশ আসলে হাজার বছরের বাঙালিজীবনের লোকায়ত চিত্র, প্রাকৃতজনের প্রাজ্ঞভাবনার স্বতোৎসারিত উচ্চারণ—যাতে রয়েছে জীবনবোধ, সমাজদর্শন, সমাজভাবনা।

চাবিশব্দ: সিলেট; প্রবাদ; জীবনবোধ; সমাজদর্শন।

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্য সেই দেশের ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহক। শুধু তা-ই নয়, একটি দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি কতটুকু উন্নত কিংবা সমৃদ্ধ তা অনেকটাই নির্ভর করে ওই ভাষার লোকসাহিত্যের ওপর। এজন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু আগে থেকেই লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন কিংবা চচা হয়ে আসছে। আধুনিক লোকসাহিত্য সংগ্রহ কিংবা আবিষ্কারে নানারকম পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্য দিনদিন যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে তেমন লোকসাহিত্যের অনেক অনুদ্‌ঘাটিত বিষয়ের নতুন করে আবিষ্কার হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের এই শাখায় ইতোমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিউদ্যোগে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার বিভিন্ন রকম লোকসাহিত্য প্রচলিত আছে।

* পিএইচ.ডি গবেষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মইনউদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ, সিলেট।

বিশেষত, নদীমাতৃক এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসাহিত্য রয়েছে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রবাদ প্রধান। প্রবাদ সম্পর্কে লোকসাহিত্য গবেষক নন্দলাল শর্মার মতামত হচ্ছে—

> প্রবাদ কেউ ইচ্ছা করে রচনা বা তৈরি করে না। একজনের উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতাকে তিনি সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে প্রকাশ করেন। দশজন এটি শুনে এবং এভাবেই মনে রাখে। তুলনীয় কোনও ঘটনা উপস্থিত হলে তার অভিজ্ঞতা থেকে সেই প্রবাদ সে উচ্চারণ করে নিজের অজান্তেই। তাই কোনও প্রবাদের রচয়িতার নাম জানার উপায় নেই। প্রবাদের পাঠান্তর ঘটে; অভিজ্ঞতার আলোকে শব্দ পরিবর্তিত হয়।[১]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে এসব প্রবাদ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। সাহিত্য রচনার জন্য কেউ এগুলো সৃষ্টি করেনি। শত শত বছর ধরে মানুষ নিজের প্রয়োজনে এগুলো বলেছে এবং মানুষের মুখে মুখে এগুলো সমকাল পর্যন্ত চলে আসতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এসব প্রবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদনের কিছু কাজ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় সিলেট অঞ্চলে প্রবাদ-প্রবচনের চর্চা বেশি বলে ধারণা করা হয়। কয়েক হাজার প্রবাদ-প্রবচন গবেষক মুহম্মদ আসাদ্দর আলী সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন *ছিলটি প্রবাদ প্রবচন* গ্রন্থে। এসব প্রবাদের মধ্যে যে-সমাজদর্শন রয়েছে তা জীবনবোধের এক কঠোর অনুভবই শুধু নয় এসবের মধ্যে রয়েছে জীবনসংশ্লিষ্ট নানা বিচার-বিশ্লেষণ। প্রবাদের উপযোগিতা বিষয়ে মযহারুল ইসলামের মতামত প্রণিধানযোগ্য—

> প্রবাদে এসব কোন গভীর দর্শন বা হিতোপদেশ ব্যক্ত করা হয় না যা বুঝতে কষ্ট হয়। মূলত, প্রবাদে থাকে সমাজের বা দৈনন্দিন জীবনের সত্য ঘটনা। জীবনে যা ঘটে, সমাজে যা প্রতিদিন ঘটছে প্রবাদের ভাষায় তারই বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মের নীতিবাক্য আর প্রবাদের নীতিবাক্য এক নয়—প্রবাদের নীতিবাক্য দৃঢ়গাথা এবং প্রত্যক্ষ। Charitte begings at home ধর্মের কথা নয়, প্রবাদের কথা, আর সে কারণেই এর আবেদন সরাসরি ও প্রত্যক্ষ।[২]

যেহেতু সিলেট অঞ্চল বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ সেহেতু এই জনপদের প্রবাদ প্রবচনে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অনেক বিষয়ের অবতারণা হওয়া স্বাভাবিক। এটাও ঠিক লোকসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে যেমন ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে ঠিক তেমনই নৃতাত্ত্বিক বিষয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব কারণে সিলেট অঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে অসংখ্য প্রবাদ প্রচলিত হয়ে আছে। এসব প্রবাদের সমাজদর্শন কিংবা উপযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই অর্থে যে, এতে সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ থাকে। এসবের তাৎপর্য কিংবা সমাজবাস্তবতা কতটুকু রয়েছে—সেসব বিষয় সম্পর্কে; অথবা এসব প্রবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কীভাবে মানুষের প্রায়োগিক জীবনে কাজে লাগতে পারে? তবে একটি বিষয় নিশ্চিত হয়েই বলা যায়, বাংলা প্রবাদ ও সিলেটি প্রবাদের মধ্যে জীবনের গূঢ়দর্শন রয়েছে যেগুলো শুধু বাস্তবিক নয় নানা ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ; এটাকে বলা যেতে পারে গভীর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন। নিম্নে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদের সমাজদর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হল:

বাংগাল বা বাঙালিবিষয়ক

সমগ্র পৃথিবীতে জাতিসত্তার পরিচয়ে বাঙালি হিসেবে এ-জাতি পরিচিত। প্রাত্যহিক জীবনে বাঙালির অনেক গুণাগুণ থাকলেও সিলেটি প্রবাদে বাঙালির চরিত্র-জীবনদর্শন সম্পর্কে নানাভাবে বিশেষায়িত

করা হয়েছে। কখনও হালকাভাবে; কখনও ইতিবাচকভাবে প্রবাদে বাঙালিকে 'বাংগাল' নামে চিত্রায়িত করা হয়েছে। সিলেটি প্রবাদে বাংগালকে নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে জাতিসত্তার পুরো পরিচয় পাওয়া না-গেলেও বাঙালির চারিত্রিক অনেক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়—যা খুবই প্রাসঙ্গিক। একই সঙ্গে সিলেটি অনেক প্রবাদে বাঙালির জীবনবোধ ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিচয়ও পাওয়া যায়—

ক. ধোপায় জানে কোন্‌জন বাংগাল, হোনারে জানে কোনজন কাংগাল।
খ. খাইতে চিনি কাংগাল, খড়মে চিনি বাংগাল।
গ. ভাতে-মাছে বাংগাল। মাছে-ভাতে বাংগাল।
ঘ. ভাংগালে বাকি পাইলে আত্তিও কিনতো চায়।
ঙ. ডম-ডুকলা-চাণ্ডাল, তাত্তোবাদ বাংগাল।
চ. জাইত্যালার গেছে জাত বড়, বাংগালর গেছে ভাত বড়।[৩]

তবে 'বাংগাল' সর্ম্পকিত বেশিরভাগ প্রবাদের ভেতর কেন জানি একটা অবজ্ঞার ভাব লক্ষ করা যায়। চর্যাপদে ভুসুকুপার একটি পদে বাঙালির আত্মপরিচয়ের বিষয়টিতেও অবজ্ঞার বিষয়টি লক্ষ করা যায়: 'আজঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িও/ আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী/ ণিঅ ঘরিণি চণ্ডালে লেলী।[৪] এ-প্রসঙ্গে আসাদ্দর আলীর বক্তব্য হচ্ছে, '[...] সিলেটসহ বাংলাদেশের আরও নানা স্থান থেকে বাংগাল ও বাংগালী সংক্রান্ত আরও কিছু প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ করা যাবে বলে আমার ধারণা। তবে, কোনওটিই হয়তো অবজ্ঞামুক্ত হবে না। অন্তত, উল্লিখিত প্রবাদ-প্রবচনগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির ভেতরই অবজ্ঞার ব্যাপারটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার।'[৫] এর সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাঙাল সম্পর্কে শুধু সিলেটি প্রবাদে নয়; বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রবাদেও কিছু নেতিবাচক পরিচয় পাওয়া যায় বলে অনেক লোকসাহিত্যগবেষক মনে করেন। চর্যাপদের ৪৯ সংখ্যক পদের বর্ণনায়ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত হয়েছে। উপরে উল্লিখিত 'ঙ' সংখ্যক প্রবাদে ডুম-ঢ্‌কলা-চণ্ডাল বলে আসলে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এসব নিম্নবর্ণের নানা জাতিগোষ্ঠীর রক্তের সংমিশ্রণেই বাঙালির—ক্রমবিকাশ—যা সিলেটি প্রবাদেও পাওয়া গেছে। বাঙালির ইতিহাসেও এরকম প্রমাণ পাওয়া যায়, '[...] সেই সঙ্গে নমশূদ্র, পোদ, বাউড়ি, বাগদি, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যে এমনকি বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যেও ভেড্ডিড উপাদান রয়েছে।'[৬]

ভবিষ্যৎবাদ

সিলেটি অনেক প্রবাদ আছে যেগুলোতে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা কিংবা দিঙ্‌নির্দেশনা রয়েছে। এগুলোকে কখন, কারা ও কেন রচনা করেছে এসবের সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া না-গেলেও এটা বোঝা যায় লোকমানুষ নিজের প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনে এসব প্রবাদ সৃষ্টি করেছে। শুধু তা-ই নয়, লোকমানুষের মধ্যে যে যুগে যুগে অনেক প্রজ্ঞাবান মানুষ ছিলেন তা প্রমাণিত হয় এসব প্রবাদের জীবনবাদী দর্শন থেকে। সিলেটি অনেক প্রবাদ রয়েছে যেগুলোতে মানুষের ভবিষ্যতের জীবনভাষ্য কিংবা ভবিষ্যৎজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সিলেটি প্রবাদে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল—

ক. আইজ মরলে কাইল দুই দিন।
খ. আইজ যে মারায়, কাইল হে মাইর খায়।
গ. আইজ যেটা কুঁড়ি অইছে, কাইল অইবো ফুল।

ঘ. একদিন এমন দিন আইব
আঘাটে ঘাট অইবো, আপথে পথ অইবো
অমানুষ মানুষ অইবা
ঙ. আগে আটলে চোরেও পথ পায়।
চ. আশা করি বাসা বান্ধে, কেউ আসে কেউ কান্দে।
ছ. আড়ি কোনায় দিল ডাক, পুয়া পুড়ি সামলিয়ে রাখ।
জ. একশ এক পাপ করলে গোরু আরায়।
ঝ. কজায় বলদও পরইত পারে।
ঞ. কোন পুতে বাপ পালবো আটুর রুমা কালা অইবার আগে চিনা যায়।
চ. গোপাল যায় যেনো, কপাল যায় হনো। গোপাল যায় বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।
ছ. ঘরর উন্দুরে বান কাটে।[৭]

উল্লিখিত প্রবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি প্রবাদের মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের ভবিষ্যতের একরকম ইঙ্গিতভাষ্য। মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারে না-বা জানতে পারে না। এরপরও যুগে যুগে মানুষের প্রজ্ঞা মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু উপদেশ দিয়ে গেছে। যেগুলো সিলেটি পবাদের বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। যেমন: উপরে উল্লিখিত 'ক' চিহ্নিত প্রবাদে বলা হয়েছে মানুষের মৃত্যুর কথা। সত্যি তো মানুষের মৃত্যুর পর এরকমই একদিন-দুদিন করে দিন চলে যায়। সময় চলে যাওয়া, ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গান করা এটি মহাকালেরই এক শাশ্বত নিয়ম। 'খ' চিহ্নিত প্রবাদটিও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত এবং বাস্তবানুগ। যে মারায় একদিন তাকেও একই মার খেতে হয়। এভাবে 'ঘ' চিহ্নিত প্রবাদে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এখনও প্রতিনিয়ত ঘটছে। দিনদিন মানুষের পরিবর্তন হচ্ছে। অথবা 'ঞ' চিহ্নিত প্রবাদে খুব সূক্ষ্মভাবে একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এরকম বিষয় লক্ষও করা যায়। এভাবে প্রতিটি প্রবাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে জীবনভাষ্য রয়েছে তা মানুষের জীবনে ভবিষ্যতের নানা ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

জীবনবোধ

বাংলা প্রবাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বাস্তব ও কঠোর জীবনবোধ। একইরকম সিলেটি প্রবাদের মধ্যেও রয়েছে জীবনের নানা অভিব্যক্তি। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় সময়ের বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে এমনকি স্বজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কখনও সংগ্রাম করতে হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধেও। এভাবেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় কিংবা টিকে থাকতে হয়। সিলেটি প্রবাদে রয়েছে মানুষের কঠোর জীবনবোধের প্রত্নছায়া। ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবনের নানা ইঙ্গিত রয়েছে এসব প্রবাদে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে কিছু প্রবাদ তুলে ধরা হল—

ক. জাত মানে না পিরিতে, পেট ভরে না জাতে।
খ. জল ভালা ভাসা, পাত্র ভালা কাঁসা, পুরুষ ভালা চাষা।
গ. জবান নাই যার, ইমান নাই তার।
ঘ. ছাতা (স্বামী) আছে ঝির বুক পুরা, ছাতা নাই ঝি জিতে মরা।
ঙ. ঘোড়ি নিজে হাতরাইয়া গাং না পারইলে তার বাইচ্চাও পারয় না।
চ. ঘরো ভাত না থাকলে ভুখ বেশি লাগে।
ছ. ঘরো নাই ভাত, বিয়া বাড়ি গিয়াও পানি ভাত।
জ. গুনর বড়াই যায় না, রূপর বড়াই থাকে না।

ঝ. ঘর জামাইর নাম নাই, মানে কৈন ফলনীর হাই।
ঞ. গাঠির কড়ি ফুড়াইলে ঘরর তিরিও (স্ত্রীও) পর হয়।
ট. গোরু চলে মাইরে, নাও চলে হাইরে।
ঠ. খায় পুত মাত্তা, না খায় পুত কুত্তা।
ড. খালি কইলায় বাজে বেশি।
ঢ. কেউর খায় লাঙ্গালে মাটি, কেউর খায় আখলে মাটি।[৮]

উপর্যুক্ত প্রবাদগুলো দীর্ঘকাল থেকে সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আসলে এসব প্রবাদ সাধারণ মানুষ কথাপ্রসঙ্গে অন্য জনের কাছে প্রকাশ করে থাকে। কে কখন প্রবাদগুলো রচনা করেছে তা নির্ধারণ করা যায় না। তবে যে-ই সৃষ্টি করুক না-কেন এসব প্রবাদের ভেতর নিহিত রয়েছে কঠোর জীবনবোধ ও সমাজবাস্তবতা। যেমন: 'ক' চিহ্নিত প্রবাদটি বাস্তবানুগ ও জীবনবাদী। সত্যিই তো প্রেম (পিরিতি) করতে কখনও মানুষ জাত দেখে না, আবার জাতের বিষয়টি মানুষের পেটের খোরাকও জোগায় না। উল্লিখিত 'খ' চিহ্নিত প্রবাদে রয়েছে একাধিক রূপকের ব্যবহার। শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে ভাসা জল, কাঁসার পাত্রের সঙ্গে চাষা পুরুষের তুলনা করা হয়েছে। এতে কৃষিজীবী বাঙালিজীবনের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও এসব প্রবাদে বাঙালির দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের নানা সংকটের কথা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু প্রবাদের তত্ত্বগুণ ও দর্শনবোধ দেখলে বিস্মিত হতে হয়! এতে রয়েছে জীবনের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা, যেগুলোর সঙ্গে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন নানাভাবে যুক্ত ও পরিচিত।

লোকবিশ্বাস

বাংলা প্রবাদে লোকবিশ্বাসের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। হাজার বছরের বাঙালি জীবনে লোকবিশ্বাসের বিষয়টি প্রকটভাবে যুক্ত হয়েছে। এরকম লোকবিশ্বাসই মিথিক পর্যায়ে কখনও কখনও উন্নীত হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় সিলেটি প্রবাদের লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি হাজার বছর ধরে নানা টোটেম, ট্যাবু ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচার পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া লোকায়ত জীবনে, ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরেও অনেক কিছু বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। বাঙালিজীবনে যেমন পৌরাণিক অনেক বিশ্বাস জড়িয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক নানারকম বিশ্বাস রয়েছে। তবে এটা তো মানতে হবে যে, এসব লোকবিশ্বাসকে নিয়েই বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন কিংবা লোকায়ত জীবন আবর্তিত হয়েছে কিংবা এখনও হচ্ছে—

ক. খদার ঢুল ফিরিছতায় বাজায়।
খ. খদারে ভাড়া দায়, বান্দারে ভাড়া যায় যেছাবায়।
গ. আল্লার হুকুম ছাড়া গাছর পাতাও নড়ে না।
ঘ. বেশি জুলুমে আল্লার আরশ লড়ে।
ঘ. বেউলা/ বিপুলা বিনে আন্ধিয়ারি ঠাকুর লখিন্দর।
ঙ. ভালা ভালা ভালা, অল্প বয়সে পুলা, শৌল মাছে মূলা, বামনের পায়ের ধুলা।
চ. মহা ভারত (মাভারত) অশুদ্ধ অওয়া।
ছ. মাগনা পাইলে বিছমিল্লা, পয়সা লাগেতে নজবিল্লা।
জ. মানুষ ভাবে এক, আল্লায় করইন আর।
ঝ. মানুষে না দিও লইল, দেবতারে না দিও বইল।
ঞ. মুচি হয়ে শুচি হয় যদি ভজে হরি।

ট. যে ফুলে যে দেফতা (দেবতা) খুশি অইন।
ঠ. যেমন দানা তেমন দানাই, যেমন রাধা তেমন কানাই।[৯]

উপর্যুক্ত প্রবাদগুলোর মধ্যে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ধর্মীয় কিংবা মিথ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সিলেটে দীর্ঘকাল থেকে হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে বসবাস করে আসছে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসভাবনা প্রবাদের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। খদা, আল্লা, দেবতা, হরি, ব্রাহ্মণ এর প্রমাণ। যেহেতু বাংলাদেশে আগত ইসলাম ধর্ম ইরান থেকে এসেছে, সুফিবাদী ইসলাম এই অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছে সেহেতু এই অঞ্চলে ঈশ্বর অর্থে ফারসি 'খোদা' থেকে 'খদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; কোনও কোনও প্রবাদে আল্লা নাম পাওয়া যায়। এছাড়া দেবতা, হরি, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিও পাওয়া যায়। সিলেটি প্রবাদে যেমন ধর্মীয় মিথ প্রচলিত আছে, একইসঙ্গে প্রাত্যহিক নানা মিথ আছে। যেগুলোর সঙ্গে লোকমানুষের জীবন-বিশ্বাস জড়িত। এর বাইরেও এসব মিথিক শব্দাবলির ব্যবহারে এই অঞ্চলের লোকমানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়—

ক. শনি-মঙ্গলবারে বাঁশকাটা পারে না।
খ. শনি-মঙ্গলবারে গোবর দিত পারে না।
গ. আদির উপরে খাট রাখিয়া বইলে বিয়া অয় না।
ঘ. পাও দিয়া আগুন ডেইতো পারে না।
ঙ. হাফ ডেইতো পারে না।
চ. খালি কলসি দেখিয়া ঘর থাকি বাইর অইলে কপাল খারাপের চিহ্ন।
ছ. রাইত টেকা করজো দেওয়া মানা।
জ. পিরর কেরামত মুরিদানর মুখো।
ঝ. হকল ভূত তাবিজে ছাড়ে না।[১০]

আলোচ্য প্রবাদগুলো সিলেটি সমাজজীবনে প্রচলিত আছে। এসবকে মিথও বলা যায়। এরকম প্রচলিত অনেক মিথ সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রত্যেকটি মিথের সঙ্গে অকল্যাণ বিষয়টি জড়িত আছে। তবে চেতন-অবচেতনে অসংখ্য বাঙালি নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে বিষয়গুলো মেনে চলে। তারা বিশ্বাস করে এই কাজগুলো করলে জীবনে অমঙ্গল হবে। চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণের সময়ও গর্ভবতী নারীদের ওপর নানারকম বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এসময় গর্ভবতী নারীরা কোনওরকম কাজ করলে সন্তানের অকল্যাণ হবে, অনাগত সন্তান পঙ্গু কিংবা অসুস্থ অবস্থায় জন্মাতে পারে—এরকম লোকবিশ্বাস সিলেটের নারীসমাজের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে।

শ্রেণিচেতনা

সিলেটি প্রবাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। যুগ যুগ ধরে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ যে বসবাস করে আসছে এবং সমাজের মানুষের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির যে প্রভেদ রয়েছে তা সিলেটি প্রবাদ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়। মানুষে মানুষে যে বৈষম্য বিরাজ করেছে দীর্ঘদিন থেকে তা বোঝা যায় সিলেটি প্রবাদে। অবশ্য বর্তমান সময়ে শিক্ষার প্রসারের ফলে এবং কার্ল মার্কসের শ্রেণিশোষণ তত্ত্বের ব্যাপক প্রসারে শ্রেণিবৈষম্য ধীরে ধীরে কিছুটা লোপ পেলেও সমাজের প্রভুশ্রেণির মানুষের কাছে এখনও এসব বৈষম্য রয়ে গেছে—

ক. যদি অও রাজা, সুখে রাখো প্রজা, প্রজায় যদি দুখ পায়, আল্লার আরশে লাড়া খায়।

খ. চোরে চোরে আলি, এক চোরে বিয়া করে আরক চোরর হালি।
গ. ডাকাতির ঘাটো নাও ডুবে না।
ঘ. যার নাই রাত, তার কিওর জাত।
ঙ. রাইত পোয়াইলেও দারুণ পেটর চিন্তা।
চ. রাইতে দিনে কাম, এরবার ফুরসত নাই, দুইন্না জাহান্নাম।
ছ. রাজার রাজপট, ফকিরর ঝুলি খেতা।
জ. রাজার ঝিরও বাট মারে চন্ডালর ঘরো।
ঝ. বাবনর গুছা খেড়র আগুইন।[১১]

সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনে শ্রেণিপ্রথা শুরু হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রভু বা রাজ-রাজড়াদের যুগ থেকে। যখনই কেউ রাজা মনোনীত হয়েছে তখনই একদল মানুষ প্রজা হয়েছে। তখন থেকেই সামাজিক শ্রেণিপ্রথা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্ম-সমাজ কিংবা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও মানুষের নতুন নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর্যরীতি অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য। এছাড়া রাষ্ট্র কাউকে বানিয়েছে শাসক; কেউ কেউ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে শোষিত। ঔপনিবেশিক শাসকরাও শাসনের প্রয়োজনে একটি শ্রেণি সৃষ্টি করে তাদেরকে নানা পদ-পদবি দান করেছিলেন। তাই সমাজের নানাবিধ শ্রেণিপ্রথার কথা যুক্ত হয়েছে সিলেটি প্রবাদে। সেখানে উল্লেখ হয়েছে রাজা-প্রজা, চোর-ডাকাত, জাত-পাত, ধনী-ফকির-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

দারিদ্র্যজীবন

প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি জীবনের সঙ্গে দরিদ্রতা জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। তাই লোকজীবনের সঙ্গে এই 'দরিদ্র্যতা' শব্দটি অতি পরিচিত। দারিদ্র্য এবং সংগ্রামকে সঙ্গী করে বাঙালি হাজার বছর ধরে প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করছে। সিলেটি প্রবাদে বাঙালির এই দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। বাঙালির জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে দারিদ্র্যজীবন গেঁথে আছে সিলেটি প্রবাদে এসবের পরিচয় পাওয়া যায়—

ক. টাইয়া (হিম শীতল) দুধো বাইয়া (বাসি) ভাত, পেটো করে উৎপাত।
খ. পরর ভাতে বান্ধা তন, পরর মন জোগাইয়া যায় জীবন।
গ. ভিটা না থাকলে আর থাকে কিতা।
ঘ. ভুখ থাকলে হুদাও খাওন যায়, চখুত ঘুম থাকলে বিনা বালিশেও ঘুম আয়।
ঙ. ভুখে মানে না পচা-গান্ধা, দুখ পাইলে আয় কান্দা।
চ. গরিবের গরিবানা নুনদি পিঠা খানা।
ছ. রাড়ির ভাত আছে, এড়ির ভাত নাই।
জ. বাপর পিন্নো কাপড় নাই, পুয়ার মাথাত ছাত্তি।[১২]

ঠান্ডা দুধ, বাসি ভাত, বাস্তুভিটাহীন জীবন, পরনির্ভরশীলতা, ক্ষুধা ইত্যাদি উপর্যুক্ত প্রবাদে যুক্ত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে কিংবা এরও আগ থেকে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন নানামুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। মানুষ কখনও সংগ্রাম করেছে প্রকতির বিরুদ্ধে, কখনও সংগ্রাম করেছে ক্ষুধার বিরুদ্ধে, কখনও সংগ্রাম করেছে মানব-অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য। মহাকালের নানা বাঁকে বাঙালি নানামুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বাঙালির এই দারিদ্যজীবনের স্বরূপ সিলেটি প্রবাদে উদ্ভাসিত হয়েছে। 'খ' চিহ্নিত প্রবাদে বাঙালি জীবনের পরনির্ভরশীলতার পরিচয় পাওয়া

যায়। একসময় অনেকে অন্যের বাড়ি কাজ-কর্মের বিনিময়ে বসবাস করত। অন্যের ঘরে খেয়ে-পরে বড়ো হতে হত। তাই অন্যের মনজুগিয়ে তাদের চলতে হত। 'গ' চিহ্নিত প্রবাদে বাস্তুভিটা প্রসঙ্গ এসেছে। বাঙালির যে বাস্তুভিটার অভাব ছিল সেটির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির অনেক মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাস্তুভিটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন এর অভাবও অনেকের জীবনে ছিল। অর্থাৎ বাঙালির জীবনের মৌলিক উপাদান বাস্তুভিটার সংকট জাতিগতভাবে এদের দারিদ্র্য-সংগ্রামকে চিহ্নিত করে। 'ঙ' চিহ্নিত প্রবাদে যুক্ত হয়েছে ভুখ অর্থাৎ বাঙালির ক্ষুধা-যন্ত্রণার কথা। এটিও তীব্র দারিদ্র্য সংকটের পরিচায়ক।

নারী

সভ্যতায় নারীর অবদান অনস্বীকার্য। নারী মানেই মাতৃময় মূর্তি। নারী মানেই পরিবার সমাজ-রাষ্ট্রের উন্নয়নের নিয়ামক। আর লোককবিদের দৃষ্টিতে নারী যেন অন্যরকম। সিলেটি প্রবাদের মধ্যে নারীকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীর জাত, চাল-চলন, যৌবন ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায় সিলেটি প্রবাদে—

ক. নদীর জল ঘোলাও ভালা, জাতর নারী কালাও ভালা।
খ. নরম বিবির খেড়ম পাও, আটতে বিবির লড়ে না গাও।
গ. নরম নরম তিন নরম, ভাল্ মাইনযর বেটি নরম, গুয়াল (বোয়াল) মাছর ফেটি নরম কাতি মাইয়া মাটি নরম।
ঘ. নারীর বল, চখুর জল।
ঙ. নারীর দোষে পুরুষ নষ্ট, সংসার নাশায়; রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
চ. নারীর যৈবন খুয়ার পানি।[১৩]

উল্লিখিত সিলেটি প্রবাদে নারীর জাত-পাতের কথা যুক্ত করে বলা হয়েছে ভালো জাতের নারী কালো হলেও উত্তম। একসময় এদেশের নারী-পুরুষ উভয়ই খেড়ম (খড়ম) পায়ে পরতেন। খড়ম আজকালের জুতো। আধুনিক জুতোর প্রচলনের আগে এই অঞ্চলে নারী-পুরুষ উভয়ই খড়ম পরিধান করতেন। খড়ম পরিধানকারী নারীর শারীরিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। নারীর সংসার, চোখের জল এবং যৌবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন সিলেটি লোক কবিরা এসকল প্রবাদে।

যৌনতা

যৌনতা মানুষের আদিম ও জৈবিক প্রবৃত্তি। যৌনসম্পর্ক দ্বারাই মানুষ বংশবিস্তার লাভ করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন প্রেমের উৎস যৌনতা। প্রেম-যৌনতার যেমন সমাজস্বীকৃত বৈবাহিক পন্থা রয়েছে; একইভাবে শত শত বছর ধরে প্রেম, যৌনতা কিংবা পরকীয়া বাঙালি সমাজের সঙ্গে মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে—

ক. লেমটা মাগির ঘোমটা তারিফ।
খ. শরমে শরমে হাত ফুংগা ফালানি।
গ. শাস্ত্র চিনে না চেটর বাল, পেলরে কয় পাখনা তাল।
ঘ. রমণী রমণে তুষ্ট, পত্নি তুষ্ট বচনে; পেটুক খাওনে তুষ্ট, মূর্খ তুষ্ট শাসনে।
ঙ. মিছকিনচুট্টা ছিলানর ঘোমটা ঘামটা ঘামটা বেশি
চ. মিছকিনচুট্টা নারী, টিপায় বইশ মারি।
ছ. ভাগ্যিমানব লুন্দ, অভাগার পুন্দ।

জ. বেশা বেটি বুড়া অইলেও পথো মুতে।
ঝ. ছিলান (ব্যভিচারী) বেটি, তোর পুন্দোবুলে গাছ ঐছে? না অয় আমার ছায়া ধরছে।
ঞ. তন (স্তন) দেখাইলে মন নাশ, তল দেখাইলে যোগীরও অয় সর্বনাশ।
ট. পুন্দো লাগাইল গু, ছেফ দিয়া পালায় থু।[১৪]

আলোচ্য 'ক' চিহ্নিত প্রবাদে লেমটা মাগির ঘোমটার শংসা করা হয়েছে। সিলেট অঞ্চলে পেশাদার যৌনকর্মীদের মাগি বলা হয়ে থাকে। নেতিবাচকতায় নগ্ন যৌনকর্মীর প্রশংসা হাস্যকর—এটাই প্রবাদ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। একইভাবে 'খ' চিহ্নিত প্রবাদে লজ্জার কথা বলতে গিয়ে 'হাত ফুংগা ফালানি' অর্থাৎ লজ্জা করতে করতে সাতবার অবৈধ সন্তান নষ্ট করার বিষয়টি আক্ষরিক অর্থে হলেও ভাবার্থে বোঝানো হয়েছে লজ্জা করতে করতে নিজের বিশাল ক্ষতিসাধনের বিষয়টি। 'ঝ' চিহ্নিত প্রবাদে ছিলান (ব্যভিচারী) মহিলার কথা এবং অবৈধ সম্পর্কে জন্ম নেওয়া সন্তানের কথা বলা হয়েছে। 'ঞ' চিহ্নিত প্রবাদে মানবপ্রবৃত্তির স্বরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে 'তন' (স্তন) দেখাইলে মন নাশ, তল দেখাইলে যোগীরও অয় সর্বনাশ' অর্থাৎ নারীর স্তন দেখলে পুরুষ কামার্ত হয়ে ওঠে; আর 'তল' (নিম্নাঙ্গ) যদি নারী প্রদর্শন করে তাহলে যোগীও আর ধৈর্য ধরতে পারেন না; যোগীরও সর্বনাশ হয়ে যায়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যে যৌনতার সম্পর্ক গভীর তা এই প্রবাদগুলো পাঠ করলে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

চৌর্যবৃত্তি

সিলেটি প্রবাদে চৌর্যবৃত্তি বিষয়ক অনেক প্রবাদ রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, বাঙালি সমাজে সেই চর্যাপদের কাল থেকেই চৌর্যবৃত্তির বিষয়টি ছিল বলে প্রতীয়মান হয়—

ক. যার মনো যেতা, চুরর মনো চুরির কথা।
খ. এতি চোর, লেতি চোর—দিনে দিনে বাশ্বার মল চোর।
গ. চোর গেলেগি বুদ্ধি বাড়ে।
ঘ. চুরর মনো খিরা খেত, আথদি দেখে ইটা খেত।
ঙ. খায় চোরায় বাটার পান, ধরা পড়লে কাটায় কান।
চ. চুরি-চুট্টামি-বাউট্টারি, ইতায় থাকে না ইমানদারি।[১৫]

উল্লিখিত প্রবাদগুলো চোরসম্পর্কিত প্রবাদ। চোরের বৈশিষ্ট্য, চোরের মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় এসব প্রবাদে যুক্ত হয়েছে। চৌর্যবৃত্তি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এটি যে সমাজগর্হিত কাজ, এটি যে ঘৃণিত ও নিন্দিত তা যেন চোর বুঝতে পারে। সেজন্য প্রবাদে চোরের মানসিকতার বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে 'চ' নম্বর প্রবাদে চুরির সঙ্গে চুট্টামি বা লচ্চামি, বাউট্টারি বাটপাড়ি অর্থে তুলনা করা হয়েছে। এসব বিষয় বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির নানা অভিজ্ঞান। সিলেট তথা বাংলাদেশ কিংবা বঙ্গীয় অঞ্চলের মানুষের চরিত্র, প্রবণতা, ঐতিহ্য এসব বিষয় সিলেটি প্রবাদে যুক্ত হয়েছে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সিলেটি প্রবাদের লোকদর্শনে বাঙালির সমাজজীবনের নানা বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে, যেমন—

ক. বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পরিচয় স্থূলভাবে হলেও সিলেটি প্রবাদে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির প্রাত্যহিক অভ্যাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি সিলেটি প্রবাদে খুঁজে পাওয়া যায়। ভাতে-

মাছে বাঙালি বিষয়টি সিলেটি প্রবাদে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া ইতিহাসের পাঠ থেকেও জানা যায় বাঙালি শংকর জাতি। নানা জাতিগোষ্ঠীর রক্তের সংমিশ্রণে বাঙালি জাতিসত্তা বিকশিত হয়েছে। একই সঙ্গে সিলেটি প্রবাদে সন্ধান পাওয়া গেছে মানুষের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে। লোকভাষায় মানুষের ভবিষ্যতের নানা অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়েছে—যা জীবনবাদী। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু প্রবাদে জীবনবোধ এত নিবিড়ভাবে আভাসিত হয়েছে যাতে লোকজ্ঞানের প্রজ্ঞামানস বোঝা যায়।

খ. সিলেটি প্রবাদের মধ্যে লোকবিশ্বাসের বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর এই লোকবিশ্বাসটি বিভিন্ন জায়গায় যেমন লৌকিক কিংবা অলৌকিক দুইভাবেই পাওয়া গেছে। এই লোকবিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে খদা, আল্লা, দেবতা, হরি, ব্রাহ্মণ। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আর, এসব লোকায়ত বিশ্বাস বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে। দ্বিতীয়ত, একইসঙ্গে সিলেটি প্রবাদে বাঙালির পরনির্ভরশীলতা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সংগ্রাম, বাস্তুভিটার সংগ্রামের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। ফলে বাঙালির সুদীর্ঘকালের দারিদ্র্য-সংগ্রামের বিষয়টি স্পষ্ট আভাসিত হয়েছে। তৃতীয়ত, সিলেটি প্রবাদে নারীর বংশজাত বিষয়, স্বভাবজাত কোমলতা, যৌবনের স্থায়িত্বসহ নারীর লাবণ্যের বর্ণনা পাওয়া গেছে। ফলে, লোকায়ত নারীর স্বভাবজাত চালচলন, সৌন্দর্য ও যৌনচেতনার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

গ. এছাড়াও সিলেটি প্রবাদে রয়েছে নারীর যৌনতার নানা দিক। নারীর স্তনের বর্ণনা, বিবাহবহির্ভূত প্রেমের বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে নারীর রূপ, যৌনতা কিংবা কামার্ত চরিত্রের দিকটি ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে সিলেটি প্রবাদে বাঙালির চৌযবৃত্তি, পরকীয়া ও বাটপাড়ির মতো নেতিবাচক বিষয়টি যুক্ত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সিলেটি প্রবাদে বাঙালির আত্মপরিচয়বোধ, ভবিষ্যদ্‌বাণী, লোকবিশ্বাস, জীবনবোধ, দারিদ্র্য-সংগ্রাম, নারীর প্রেম, যৌনতা ও চৌর্যবৃত্তির বিষয়টি ওঠে এসেছে। লোকায়ত বাংলার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলো জড়িয়ে আছে হাজার বছর ধরে। সিলেটি প্রবাদে যুক্ত হওয়া এসব বিষয় বাঙালির কাছে যেমন অত্যন্ত পরিচিত তেমনই বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এসকল প্রবাদের মর্মমূলে রয়েছে লোকায়ত সমাজদর্শন, তীব্র জীবনবোধ, সামাজিক অভিব্যক্তি, প্রজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতার নিপুণ বিন্যাস। যেখানে ধরা পড়ে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের রূপ, চরিত্র, সাংস্কৃতিক অভিযোজন। সিলেটি প্রবাদের এই অভিনিবেশ আসলে মহাকালের লোকায়ত চিত্র, প্রাকৃতজনের প্রাজ্ঞভাবনার স্বতোৎসারিত উচ্চারণ—যাতে রয়েছে জীবনবোধ, সমাজদর্শন, সমাজভাবনা ও তার স্বরূপচিত্র।

সূত্রনির্দেশ

১. নন্দলাল শর্মা, ২০০৯, *লোকসংস্কৃতি: সিলেট প্রেক্ষিত* (১ম সংস্করণ), সিলেট: ঘাস প্রকাশনী, পৃ. ১১-১২;
২. মযহারুল ইসলাম, ১৯৯৩, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন* (তৃতীয় সংস্করণ), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭৭;
৩. আসাদ্দর আলী, ১৯৯৯, *ছিলটি প্রবাদ প্রবচন* (২য় খণ্ড), সিলেট: রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন, পৃ. ৪৯-৫০;
৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), ১৪১৪, *চর্যাগীতিকা* (ষষ্ঠ সংস্করণ), ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ. পৃ. ১৭৮
৫. আসাদ্দর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১;

৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ২০১৮, *বাঙালির ইতিহাস* (পঞ্চম সংস্করণ), কলকাতা: পশ্চিম বাংলা আকাদেমি, পৃ. ২;
৭. আসাদ্দর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮–৯৪, ১০৩, ১০৭, ১১৯, ১২৮, ১৩০;
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৮, ১৪৩, ১৪২, ১৩৮;
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০. ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২০৮, ২১১, ২১৪, ২২৩, ২২৪;
১০. লেখকের নিজের সংগ্রহ;
১১. আসাদ্দর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯, ২১৭, ১৫০, ২২৬, ১৯০;
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫, ১৬৮;
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ১৪০, ১৮০, ১৯৭, ২০০, ২১২, ২২৫, ২৩১, ২৩২, ২৩৩;
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮–৪৮;
১৫. লেখকের নিজের সংগ্রহ।

ISSN 2707-9201

কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের গীতে নারীর অন্তর্বয়ন

মেহেদী হাসান*

সারসংক্ষেপ: লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের পরতে পরতে প্রোথিত আছে লোকজ জীবনের নানা অনুষঙ্গ। বাংলা লোকসাহিত্যের প্রধান জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধশাখা হল লোকসংগীত। সাধারণত লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত সংগীতই লোকসংগীত। লোকসংগীত বাঙালির এক অমূল্য সম্পদ। এর শিকড় লোকসংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির উৎসমূলে প্রোথিত। গ্রাম বাংলার মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, আলো-বাতাসে মিশে আছে এর স্বর্ণালি অবয়ব। লোকসংগীতের এক বিস্তৃত অংশ দখল করে আছে মেয়েলি গীত। সামাজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব এবং অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে মেয়েলি গীতের উদ্ভব। বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অনুষঙ্গ বিয়ে। বিয়ে উপলক্ষ্যে গীত-গাওয়া বাঙালির চিরায়ত লোকাচার। বিয়ের বিভিন্ন আচার-অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে সুপ্রাচীনকাল থেকেই গ্রাম-বাংলার নারীসমাজ মনের আনন্দে তাৎক্ষণিকভাবে এসব গীত রচনা করেন। বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের মতো বিয়ে উৎসবে গীত গাওয়া কুমিল্লা জেলার একটি প্রচলিত রীতি। কুমিল্লা অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মতোই অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তাদের নিজস্ব লোকাচার ও সংস্কারানুযায়ী বিয়ের উৎসবকে কেন্দ্র করে গীত গাওয়ার রীতি প্রচলিত। এসব গীতের মধ্য দিয়ে নারী-হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুভূতির সুরেলা প্রকাশ লক্ষণীয়। বর্তমান প্রবন্ধে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত মোট পঁচাত্তরটি বিয়ের গীতের আলোকে তুলনামূলক, বর্ণনামূলক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর অন্তর্বয়নের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

চাবিশব্দ: অন্তবয়ন; কনে; বর; মেয়েলি গীত; লোকসংস্কৃতি।

প্রাককথন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কুমিল্লা জেলা প্রাচীনকালে সমতট জনপদের অন্তভুক্ত ছিল। প্রাচীনকালে বাংলার যে-কয়েকটি ভৌগোলিক জনপদ ছিল তার মধ্যে সমতট একটি। বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে সমতট জনপদটি গড়ে উঠেছিল। কুমিল্লা শহরের বারো মাইল পশ্চিমে বড়ো রোহিতগিরি ছিল এই জনপদের রাজধানী (কাসেম, ২০০৮: ৪৫)। জনবসতির দিক দিয়ে এখানে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ নানা জাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। এসকল জাতির

* গবেষক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সামাজিক জীবনাচারণ ও সামগ্রিক জীবনপ্রবাহে বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহ ও উন্নত জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ময়নামতির শালবন বিহারটি তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মচর্চার ও শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন নালন্দা মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্র থেকে শুরু করে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার গুহ, বুদ্ধদেব বস্ প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তির পদচারণা এ-অঞ্চলের আলাদা মাহাত্ম্য সংযোজন করেছে। কুমিল্লা একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল হওয়ায় সুদর অতীত থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাভাবিকভাবেই লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতেও সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। কুমিল্লা অঞ্চলের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ধারা যেমন বিচিত্র, তেমনই সমৃদ্ধ। এখানকার লোকসাহিত্যের প্রধান সম্পদ লোকসংগীত। লোকসংগীতের রয়েছে আবার নানান ধারা। এর মধ্যে জারিগান প্রধান। আঞ্চলিক এ জারিগানগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে মানবিক আবেগ-আবেদনের চিত্রময় আর্তি। এ-অঞ্চলের আঞ্চলিক লোকগীতিতে মুর্শিদি ও দেহতত্ত্বের গানও চমকপ্রদ। কুমিল্লা জেলার বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভাববাদী বাউল কবিরা আজও এসব গান গেয়ে থাকেন। কুমিল্লা অঞ্চলে মেয়েলি রসিকতায়পূর্ণ কর্ম ও শ্রমসংগীত যেমন—ধান ও পাটকাটার গান, ছাদ পেটানোর গান, দাঁড় বাওয়া মাঝির গান, পালকি চলার গান, নৌকা বাইচের গান ইত্যাদি সংগীতের প্রচলন এ-অঞ্চলের লোকঐতিহ্যের ধারক। এই অঞ্চলের মানুষের কর্মের অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে এই গানগুলো গাওয়া হয়ে আসছে। সারিগানও এই অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী গান। এই বিচিত্র লোকসাহিত্যের ধারার মধ্যে মেয়েলি গীত একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মেয়েলী গীতের মধ্যে রয়েছে—বারোমাসী গান, প্রেমসংগীত, বিয়ের গীত, ব্রতের গান, ঘরের গান ইত্যাদি। এসব মেয়েলি গীতের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নারীজীবনের পরিসর ও প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেমসংগীতের মধ্যদিয়ে নর-নারীর প্রগাঢ় মানবিক আবেদন ও জৈবিক অনুভূতি প্রকাশ পায়। জৈবিক অনুভূতির পাশাপাশি প্রেমসংগীতগুলোর বৃহত্তর অংশে প্রকাশিত হয় বিরহ-বেদনা। আবার নিঃসঙ্গ নারীমনের ঋতু বিবর্তনে যে দুঃখ-বেদনার প্রতিক্রিয়া এর ফলস্বরূপ গাওয়া হয় বারোমাসী গান। তেমনই আবহমানকাল থেকে প্রচলন হয়ে আসছে বর-কনের মঙ্গলে নিবেদিত বিয়ের গীত বা গান। এ অঞ্চলে বসবাসরত হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের বিয়ের গান পর্যালোচনা করলে আহমানকাল ধরে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুসমাজের বিবাহের লোকাচার যেমন—সোহাগ-মাগা[১], পাটিপত্র[২], বরণডালা[৩], বরস্নান[৪], দধি মঙ্গল[৫], শঙ্খ কঙ্কণ[৬], গায়ে হলুদ, কনে সাজানো, বর সাজানো, কনকাঞ্জলি[৭], বর-বরণ, বধূবরণ, বাসর, দ্বিরাগমন[৮] প্রভৃতি। একইভাবে মুসলমান সমাজের বিবাহের লোকাচার যেমন—কন্যা সাজানো, বর সাজানো, মেহেদি লাগানো, নওশার আগমন, কাবিন, উকিল, মোক্তার, বিয়ে পড়ানো, কন্যাদান, নাইয়র[৯] প্রভৃতি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ের এই সকল লোকাচারকে কেন্দ্র করে গীত-গাওয়া এই অঞ্চলের লোকঐতিহ্য। বিয়েকে কেন্দ্র করে রচিত এসমস্ত গীতে যেমন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই এসব গীত বা গানে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সমাজধর্ম, সমাজবাস্তবতা, লোকজীবন, লোকমানস এমনকি নারীর বহুমাত্রিক জীবন ও নারীমনের অন্তর্বয়ন। বর্তমান প্রবন্ধে কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের গীত বা গানে প্রতিফলিত নারীর অন্তর্বয়নের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে।

লোকসংগীত, মেয়েলি গীত ও বিয়ের গীতের পরিপ্রেক্ষিত

লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির প্রধান শাখা। এছাড়া আধুনিক সাহিত্যের মূল শিকড় লোকসাহিত্যের মৃত্তিকার গভীরেই প্রোথিত (চৌধুরী, ১৯৮৩: ৫)।

সেদিক থেকে লোকসাহিত্য মূলত বচনকেন্দ্রিক, ঐতিহ্যবাহী এবং মৌখিক। লোকসাহিত্যের পরতে পরতে প্রোথিত আছে লোকজ জীবনের নানা অনুষঙ্গ। মূলত আবহমান গ্রাম-বাংলার বৈচিত্র্যময় লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি থেকেই উদ্ভব হয়েছে বাংলা লোকসাহিত্যের। *কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য* গ্রন্থে তিতাশ চৌধুরী লিখেছেন, 'লোকসাহিত্য আসলে একটি জাতির জিয়নকাঠি, সম্পদ ও সম্পত্তি। লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটি জাতির নিজস্ব কৃষ্টি-সভ্যতা-ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উজ্জ্বল্য-উদ্ধার করা সম্ভব (চৌধুরী, ১৯৮৩: ভূমিকা)।' লোকসাহিত্য—ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, কথা, নাট্য ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে গড়ে ওঠে। লোকসাহিত্য হল সংহত একদল মানুষের সমবেত সাহিত্য সৃষ্টি, যা মূলত মৌখিক ও ঐতিহ্যবাহী, যার সৃষ্টি লিখন নয়, মুখের ভাষাকেন্দ্রিক। বাংলা লোকসাহিত্যের-শাখা সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও বিপুল (আহমেদ, ২০০৪: ২৯)। লোকসাহিত্যের এই বিচিত্র শাখার প্রধান জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধশাখা হল লোকসংগীত। লোকগীতি বা লোকসংগীত এককথায় লোকের গীতি বা সংগীত। যা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত তা লোকগীতি বা লোকসংগীত। লোকগীতি মূলত ভাব ও সুরনির্ভর। ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গীত সবই লোকসমাজের মানস ক্রিয়ার মৌখিক প্রকাশ। এই চার উপকরণই মুখ্যত লোকমানসের ভাবনা-চিন্তার ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। ভাব-আবেগ-আবেদন ও সুরের গভীরতায় লোকসংগীতই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। সংগীতের আবেদন মানুষের হৃদয় ও আবেগের কাছে। লোকসমাজের মানব-হৃদয়ের আবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে লোকসংগীতের মধ্যে। লোকসংগীতে সমাজ-অনুভূতির অন্তরালে ব্যক্তি অনুভূতির ছোঁয়া কখনও কখনও অনুভূত হয়ে থাকে। বাংলা লোকসংগীতের রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য তার ভান্ডারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এদিক থেকে প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলার পল্লি প্রকৃতির সহজ-সরল রূপই বাংলা লোকসংস্কৃতির জন্মদাতা। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত দিক থেকে এদেশের মানুষের মধ্যে তাই স্বভাবতই কোমলতা ও গীতিভাব প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। এর সঙ্গে মিশেছে দিনযাপনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যুর ও মিলন-বিচ্ছেদের বিচিত্র স্বাদ। বিভিন্ন লোকশিল্পীরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোকমানসের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি বাংলা লোকসংগীতের পরতে পরতে ফুটিয়ে তুলেছেন। লোকসাহিত্য গবেষক ও সংগ্রাহক তিতাশ চৌধুরীর ভাষায়, 'লোকসাহিত্য দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। এতে প্রতিফলিত হয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্রোহ-বিদ্রোহ, ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, লোকমানসের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, লোকসংস্কার ও লোকদর্শন অর্থাৎ লোকমানসের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি (চৌধুরী, ১৯৮৩: ভূমিকা)।' কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্যের মধ্যে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত মুর্শিদি গান, জারি গান, সারি গান, পটুয়া সংগীত, মারফতি গান, বারোমাসী, মাইজ ভান্ডারি গান, মেয়েলি গীত ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। এই সকল লোকসংস্কৃতির মর্মে রয়েছে এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনবোধ, লোকাচার, সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি। সর্বসাকুল্যে এই অঞ্চলের মানুষের ধর্ম দর্শন ও নানা বিষয়-আশয়। লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা মেয়েলি গীত। বিষয়-বৈচিত্র্যে, সুরের অভিনবত্বে এবং আঞ্চলিক ভাষার বিশেষত্বের গৌরবে লোকসংগীতের মেয়েলি গীতের ধারাটি লোকসাহিত্য ভান্ডারের অমূল্য সম্পদ।

মেয়েলি গীত একান্তভাবেই মেয়েদের গান। এসব গীত একদিকে যেমন মেয়েদের জবানিতে মেয়েদের রচনা, তেমনই পুরুষ রচিত হয়েও তা মেয়েদেরই আত্মকথন। এই ধরনের গানের ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে বৃহৎ নারীগোষ্ঠীর জীবন, তাদের সংগ্রাম, তাদের সরল সুখ ও অপরাপর দুঃখবোধ। শাহ্‌নাজ মুন্নী তাঁর *ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়েলি গীত* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন—

> বাঙালি নারীর জীবন বারবার শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা, নির্যাতন ও বেদনার তিক্ত রসে ভরে উঠেছে, কিন্তু এই তিক্ততা গলাধঃকরণ করেও বাংলার নারী জীবনের রস উপভোগ করেছে। ধান ভানতে ভানতে ঢেঁকির তালে তালে তারা গান বেঁধেছে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে সুরে সুরে প্রকাশ করেছে নিজেদের হৃদয়াবেগ। অপরিসীম ধৈর্যে পল্লির সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেও জাগিয়ে রেখেছে নিজের আনন্দময় সত্তা, জাগিয়ে তুলেছে নির্মল প্রাণ হিল্লোল (মুন্নী, ২০০৩: ভূমিকা)।

মূলত পারিবারিক ও সামজিক উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেয়েলি গীতের উদ্ভব। নারী হৃদয়ের সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মাধ্যমে এর গতিশীলতা। মেয়েলি গীত সম্পর্কে মুহাম্মদ আব্দুল জলিল লিখেছেন, 'দেহের সঙ্গে নাড়ীর; প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের; জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক যেরূপ আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তেমনই মেয়েলি-গীতের সঙ্গে নারীহৃদয়ের সম্পর্ক দৃঢ়পিনদ্ধ' (জলিল, ১৯৯৪: ৪)। নানা অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে মেয়েলি গীত রচিত ও গীত হত বা হয়। বিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব আয়োজনের প্রধান অনুষঙ্গ এবং তার লোকাচারের সঙ্গে নানা কৃত্য সম্পৃক্ত থাকে (খানম ও হাসান, ২০১৪: ভূমিকা)। এছাড়া বাংলাদেশে ধর্ম, গোত্র, সম্প্রদায় ও অঞ্চলভেদে বিবাহের নানামাত্রিক বৈচিত্র্যও লক্ষ করা যায়। বিয়ে উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের চিরায়ত রীতি অনুযায়ী গীত গাওয়ার প্রচলন রয়েছে এবং এটি লোকাচার বা কৃত্য হিসেবেও প্রচলিত। এই বিয়ের গীত থেকেই বাংলা লোকসংগীতের সমৃদ্ধ শাখা মেয়েলি গীতের উদ্ভব হয়েছে। মেয়েলি গীতের উদ্ভব সম্পর্কে একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে বিয়ের গান থেকেই মেয়েলি গীতের উদ্ভব, বিয়ের গানই মেয়েলি গীতের আদি ও অকৃত্রিম উৎস (মুন্নী, ২০০৩: ৭)।' প্রত্যেক অঞ্চলের বিয়ের গীতে সে অঞ্চলের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ভাষাগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। মেয়েলি গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট আঞ্চলিক প্রভাব স্বকীয়। বিয়ের গীতের যে স্বতঃস্ফূর্ততা তা গ্রামীণ সমাজের-অনাবিল ও অকৃত্রিম ভাব-ভাষা ও মনের সহজাত আনন্দানুভূতি থেকে সৃষ্ট নির্ভেজাল ও নিরাবরণ। 'কেননা এতে ভাষা-সংস্কৃতির আদি ও অকৃত্রিম রূপটিই বিদ্যমান' (সেতু, ২০১৩: ৯)। বিয়ের গীতের যে সুর, তাল, লয় ব্যবহৃত হয় তা কোনও শাস্ত্রীয় রীতিসিদ্ধ নয়, মূলত চাপা গোঙানির সুরে এই গীত হয়ে থাকে। বিয়ের গীতগুলো শুধু বিয়েকে কেন্দ্র করে গীত হয় এবং অন্তপুরচারিণী ও আঞ্চলিক নারীসমাজেই এগুলো সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ কুমিলা অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামে বিয়ের উৎসবকে কেন্দ্র করে গীত গাওয়ার রেওয়াজ সুপ্রাচীন। বিয়ে উপলক্ষ্যে হওয়া এসকল গীতে এ-অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন রীতি-নীতি, ধর্ম, দর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের-গীতও মূলত নারীর বয়ানে গীত হয়ে থাকে। এই অন্তবয়ানের অন্তরালে নারীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, বেদনা, অন্তরদহন পভতি বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। তিতাশ চৌধুরীর *কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য* ও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কুমিল্লা*—এই দুটি গ্রন্থে কুমিল্লা অঞ্চলের কিছু বিয়ের গীত সংরক্ষিত হলেও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও নানা ধরনের বিয়ের গান গীত হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষক এই গবেষণার প্রয়োজনে কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পঞ্চাশটি বিয়ের গীত সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত ও গবেষকের সংগৃহীত গানে দেখা গেছে নারীর শেকড়সন্ধানী ভাব-কল্পনা, নারী-পুরুষের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক ও গার্হস্থ্য-জীবন এবং নারীজীবনের অনুবেদন। কুমিল্লা অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মতোই অন্যান্য ধর্মাবলম্বী

জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও তাদের নিজস্ব সংস্কারানুযায়ী বিয়ের উৎসব পালন করে থাকে। ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর এ উৎসবগুলোতেও বিয়ের গীতের প্রচলন রয়েছে। ভিন্নধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিয়ের গানের রীতিনীতি ও লোকাচারের ভিন্নতা থাকলেও ভাবগত ঐক্য একই (সেতু, ২০১৩: ১১)। এসব বিয়ের গীতে উঠে এসেছে এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও লোকাচার। নারীর বয়ানে গীত হয় বলে 'আশীর্বাদ' থেকে শুরু করে 'দ্বিরাগমন' অবধি প্রতিটি আচার নিয়ে বাঁধা গীতে নারীহৃদয়ের অন্তর্বেদনা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

বিয়ের গীতে নারীর অন্তর্বয়ন

কুমিল্লা অঞ্চলের বিয়ের গীতে এ-অঞ্চলের নারীদের নিজস্ব হৃদয়বৃত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয় পাওয়া যায়। বিয়ে উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানা আনুষ্ঠানিকতাকে কেন্দ্র করে এলাকার নারীরা মনের আনন্দেই এসব গীত গেয়ে থাকেন। বরকে হলুদ, মেথি, মেহেদি আরও নানা রকম উপকরণে সাজানো হয় আর নানা ধরনের গীত মেয়েরা গেয়ে থাকে। তেমনই অপর দিকে কনের বাড়িতে কনে সাজানোকে কেন্দ্র করে চলে গীতের আসর। ফেরদৌসী লাকী তাঁর *ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিয়ের গীত* গ্রন্থের অবতরণিকায় বিয়ের গীত সম্পর্কে বলেছেন—

> বিয়ের গীত আমাদের গ্রামবাংলার মায়েদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। মনের আনন্দেই তারা তৎক্ষণিকভাবে রচনা করেন এই সকল গান। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে রচিত এই গানে সময়ের ও সমাজের ছাপ যেমন ফুটে ওঠে, তেমনই ধরা পড়ে গাতকের তথা নারীর সুখ-দুঃখ ও হাসি কান্নার কথা। সংগীতের আবরণে এ এক সামাজিক ইতিহাস বটে (লাকী, ২০১৬: ৭)।

বরের আগমন, কনেকে গোসল করানো, কনে বিদায় দেওয়া অর্থাৎ বিয়ের একেক আয়োজনে একেক ধরনের গীত গাওয়া হয়। বরকে বরণ করার সময় যে গীত গাওয়া হয় তা আনন্দপ্রধান। আবার কনের বিদায়ের সময় গাওয়া গীতে দুঃখ বেদনা ফুটে উঠে। এভাবেই হৃদয়ের আবেগ-উৎকণ্ঠা, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, আনন্দ-বিরহের প্রকাশ ঘটে বিয়ের গীতে। সাধারণত কয়েকজন মধ্যবয়সী-নারী গোল হয়ে একসঙ্গে বসে খালি গলায় বিয়ের গীত পরিবেশন করে। গায়েহলুদ অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্যও 'গীত গাওয়ানি'[১০] মধ্যবয়সী মহিলাদের ডাক পড়ত (মুন্নী, ২০০৩: ৬২)। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় কনেকে হাজার স্মৃতি ও বেদনা ভুলে যেতে হয়। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে যেতে হয় নতুন ঠিকানায় এবং গুছিয়ে নিতে হয় সংসার। এছাড়াও বিবাহ পরবর্তী বাঙালি নারীর শাশ্বত সংসার জীবনও বিয়ের গীতে প্রতিফলিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে নববধূর প্রতি নির্মম আচরণের বর্ণনাও বিয়ের সময়ে গাওয়া গীতগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। নিচের গীতে এর প্রতিফলন পাওয়া যায় এভাবে—

বিয়ার রাত্রি দিছেগো আম্মা
মরিচ বাইড্ডার লাগি
কিনা মরিচ বাড়ুমরে সাধু তোমার লাগিয়া
সর্বাঙ্গা জইলা যায়গই আম্মাজির লাগিয়া
বাড়ির অনা দক্ষিণ পাশে এরি ধানের পারা
অত্ব আইয়ের আমার বাবা আসমানেরি তারা
প্রাণের বাবা ও বাবা গো ঝিরে বুঝি
ফিরগা নাইর দিনা প্রাণের বাবা

...
সারাদিন রান্দি বাবা সাত ও ডেক্সি ভাত
খাইতাম গেলে পাই না বাবা এক পেয়ালা ভাত
প্রাণের বাবা ও বাবাগো ঝিরে বুঝি
ফিরগা নাইর দিলা।
সারাদিন কাজ করি দাস দাসীর মত
তবুও বাবা মারে আমায় পথের কুকুরের মত (খান, ২০১৯: ১৫৮)।

বিয়ের রাতেই শ্বশুরবাড়িতে কিশোরী নববধূকে পাটা-পুতায় মরিচ বাটতে দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়ির এমন অমানবিক আচরণে কিশোরী নববধূর মাতৃসেহের জন্য পরম আকুতি জেগে ওঠে হৃদয়ে। তাই সে তার বাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। দিনে দিনে তার প্রতি বঞ্চনাও বাড়তে থাকে। সারাদিন সাত হাঁড়ি ভাত রান্না করেও এক পেয়ালা ভাত জুটে না তার। দাস-দাসীর মতো কাজ করেও পথের কুকুরের মতো অত্যাচারের স্বীকার হতে হচ্ছে নববধূকে। উপরের গীতে নারী-জীবনের নির্মম-নিপীড়ন ও অত্যাচারের আর্ত চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

বিবাহরীতি অনুযায়ী ছেলে পক্ষ থেকে কন্যাকে গহনা ও ভূষণ দেওয়া হয়। বাঙালি সমাজের বিবাহ-পরবর্তী নারী জীবনের পূর্বাভিজ্ঞতানুযায়ী কন্যার বিশ্বাস, স্বামীর দেওয়া গহনা ও ভূষণ পরিধান করার পর পরই বাবা-মায়ের কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং পরবর্তী জীবনে তাকে স্বামী শাশুড়ার অধীনস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। অর্থাৎ স্বামী-প্রদত্ত গহনা অলংকার পরাধীনতার শৃঙ্খলবন্দি নিগৃহীত নারী-জীবনের অন্তর্দহনের প্রকাশ। বাবা-মায়ের আদর সেহ এবং বাবা মায়ের বাড়িকে তখন তার কাছে চির-কাঙ্ক্ষিত মনে হলেও স্বামীর সংসারে গিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে বাধ্য হতে হয়—

যেদিন থেকে পরছি মাগো
পরের হাতের আঙ্কটি
সেদিন থেকে ছাড়ছি মাগো
মা বাপের বাড়ি।
...
যেদিন হতে পরছি মাগো
পরের হাতের স্বর্ণ
সদিন থেকে ছাড়ছি মাগো
মা বাপের অঙ্গ।
যেদিন থেকে পরছি মাগো।
পরের হাতের বেলাউজ
সেদিন থেকে ছাড়ছি মাগো।
মা বাপের লালুচ (খান, ২০১৯: ১৫৯)।

গ্রামীণ সমাজের বাল্যবিবাহের নিদর্শনও বিয়ের গীতে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শারীরিক এবং মানসিকভাবে অপরিণত অবস্থায় একটি নাবলক মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে। বরপক্ষ থেকে যে-অলংকার ও ভূষণ আনা হয়েছে এগুলো কনের পরনে লাগছে না। বিয়ের গীতের নারী-জবানিতে তারই প্রকাশ পাই এভাবে—

বারির হাত দেখি চিরকনা
বারির লাই চুরি আইনছে বরকন্যা
কী দিয়া সাজামু মায়ের অবুঝ মনারে
বারির কোমার দেখি চিরকনা
বারির লাই বিছা আইনছে বরকন্যা
বারির শরীর দেখি চিরকনা
বারির লাই শাড়ি আনছে বরকন্যা (ঐ)
বারির গলা দেখি চিরকনা
বারির লাই হার আনছে বরকন্যা (খান, ২০১৯: ১৫৯)।

গ্রাম-বাংলায় বিয়ের পরে কন্যার রান্না-বান্না অবশ্যই কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত, নাবালক কন্যা রান্না-বান্না পারে না, সেজন্য তাকে অনেক গঞ্জনার শিকার হতে হয়। তাই নিভৃতে বরের কাছে মিনতি করছে তাকে রান্না-বান্না শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। এই রান্না শিখানোর জন্য আকুতি ও অনুরোধ যেমন গৃহকর্ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা নির্দেশ করে তেমনই নারীর অপরিণত বয়সের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। অতীতে নারী-পুরুষের বিয়ে যে পুতুলের বিয়ে সমতুল ছিল তারও পরিচয় এখানে বিধৃত হয় বাল্যবিবাহের বর্ণনার মাধ্যমে—

জল কুমার নাতি করি স্বামী তোমার পায়ে ধরি,
ভাত রান্না আমারে শিখাওনারে মাংস রান্না আমারে শিখাও নারে
আগে দিব তেলখানি পরে দিব মাংসখানি,
মাংস রান্না আমারে শিখাও নারে পোলাও রান্না আমারে শিখাও নারে
আগে দিব তেল ও পেঁয়াজখানি পাচে দিব চাউলখানি গো
পোলাও রান্না আমারে শিখাও নারে (খান, ২০১৯: ১৫৯)।

গ্রামীণ-সমাজে বিয়েতে মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করে পিতা, ভাই বা পরিবারের অন্য কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সম্মতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব সর্বত্রই মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের কর্তাব্যক্তি। ফলে মেয়েটি নীরবে পরিবারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং অনেকক্ষেত্রেই সংসার জীবনে শারীরিক ও মানসিক পীড়ন সহ্য করে। এমনই একটি চিত্রের প্রতিফলন হয়েছে নিম্নোক্ত গীতের মধ্য দিয়ে—

কি না বিয়া দিছেন আম্মা
আজ্জাল জাজ্জাল চাইয়া
দশ টাকার বাদলি কিনি
হাজার টাকার কোরান
কোরান খুলিয়া দেখেন আম্মাজির পরান (খান, ২০১৯: ১৫৮)।

বাঙালি সংস্কৃতি অনুযায়ী বিয়ের পর নববধূকে তার স্বামীর সংসারকে আপন করে নিতে হয়। সে-অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে তাদের শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মা বলে সম্বোধন করে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহে শ্বশুর, শাশুড়ি ও বাসুরকে যথাক্রমে বাবা-মা ও ভাই বলে সম্বোধন করলেও তাদের কাছ থেকে যথাযথ স্নেহ, মমতা না পেয়ে নিজের বাবা-মায়ের জন্য কাতর হয়ে ওঠে। তাই সে তার বাবার-মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। গ্রাম-বাংলার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে স্বীয় কন্যা অতিথি হয়ে আসাকে নাইয়র হিসেবে আখ্যায়িত করা

হয়। সাধারণত কন্যার বাবা, ভাই অথবা কন্যার পক্ষের কেউ আসে, এবং কন্যার স্বামী-শ্বশুরের অনুমতিতে বাবার বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায়। কুমিল্লা আঞ্চলের বিয়ের-গীতের প্রধান অনুষঙ্গ নাইয়র। এ-বিষয়ক বিয়ের গানগুলোতে নারীহৃদয়ের অন্তর্বেদনা, বাবা-মায়ের প্রতি হৃদয়ের তীব্র-টান এবং শাশুড়ি ও ননদদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নিচের গীতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এভাবে—

সাতখান রিক্‌শা সাজাও গো বালি
যাইতাম বাড়িতে, ওঠনা রিকশার পরে
আমি কেমনে যাইতাম
আমার মায়ের লাই পরান পড়ে
আমার বাবার লাই পরান পড়ে
আমারও মা আছে গো
তোমার মারে মা ডাকিলে
বাপ মা ধরি পাইল দিব রে
আমার মারে মা ডাকিলে
টাইনা লইব বুকে রে...
চাইল খাইল চাইলোনি হোক
মডইল খাইল গুণে
তোমার ভাইরে ভাই ডাকিলে
মাইর বো মান্দার কাটা দিয়া গো (খান, ২০১৯: ১৫৯-১৬০)।

বিয়ের পর কন্যা পিতৃগৃহ ত্যাগ করার সময়ে ঘুরে ঘুরে বাবা ও ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে, এসময় কনের মা-বাপ, ভাই-বোন সবাই কান্না জুড়ে দেয়। বাবার বাড়ি থেকে কন্যাকে বিদায় দেবার দৃশ্যটি করুণ ও মর্মভেদী। বাবা তার আদরের কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তোমার জন্য বিনিদ্র রজনি কাটিয়েছি, অবশ্যই তোমাকে আমি দেখতে যাব, যদি আমি যেতে নাও পারি তোমার মাকে পাঠাব। কন্যার পিতৃগৃহ ত্যাগের আবেগঘন এই মুহূর্তের ঘটনাগুলো নাট্য-দৃশ্যের মতোই এ অঞ্চলের বিয়ের গীতে উঠে এসেছে—

ঘুরিয়া ঘুরিয়া কন্যা বানু
বাবার গলায় ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কন্যা বানু
বাবার গলায় ধরি কান্দে। দিন কাটাইলাম শোনা বানু
তোমারও কারণে রে ও ...
রাত কাটাইলাম শোনা বানু
তোমারও কারণে।
বালুয়া যদি না যাইতে পারি।
যাইবো বানুর আম্মারে...
দিন কাটাইলাম শোনা বানু
তোমারও কারণে,... (খান, ২০১৯: ১৬২)।

অনেক সময়ে বিয়ের পর কনের উপরে ক্রমান্বয়ে নেমে আসে শাশুড়ি-ননদদের অকথ্য অত্যাচার। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে গ্রামের অসহায় মা-বাবার দুঃখের অন্ত থাকে না। বাবা তাঁর অশ্রুসিক্ত কন্যাকে কান্নার কারণ জানতে চাইলে সে তার সাথে তার মাকে নিতে চায় শ্বশুরালয়ে। কিন্তু মাকে সাথে করে নিয়ে গেলেও শ্বশুর-শাশুড়ি কটাক্ষ করে বলবে দাসী-বান্দি সাথে করে নিয়ে আসছে। নারী-

হৃদয়ের এসব দুঃসহ দুঃখের চিত্রময়-আর্তিও ফুটে ওঠে বিয়ের গীতের ভাঁজে ভাঁজে—

কিসের দুঃখে কান্দ গো মালু
ওগো মালু কও না বাবার কাছে—
কিছুর দুঃখে কান্দি না বাবা ও, ওহে বাবা—
কেবল মায়েরে নিতাম লগে।
পরের বাপে বলবে গো মালু আহা মালু গো
বান্দি নিকি আন্‌ছ লগে
দাসী নিকি আন্‌ছ লগে (চৌধুরী, ১৯৮৩: ২১৪)।

হিন্দু-বিবাহরীতি অনুযায়ী বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে এই তীব্র আবেগময় গানটি গাওয়া হয়। কন্যা তার পিতৃগৃহ ত্যাগ করার পূর্বে তার বাবা, মা ও চাচার কাছে গিয়ে কান্না করে বলে তাদের কাছে কিছুই চাওয়ার নেই, শুধু একটাই আবদার যেন বছর শেষ না হতেই তাকে 'নাইয়র' আনতে যায়—

কাঁঠালেরো দুইখান পিঁড়ি ওঠানে বসাইয়া
যাত্রা করে মায়ের সীতা পূর্ব দিকে হাইয়া গো
অবলা যাত্রা করে পূর্ব দিকে হইয়া
কান্দিতে কান্দিতে উমা যায়গো মায়ের কাছে... (খান, ২০১৯: ১৬৩-১৬৪)।

জিরার নামের একটি মেয়ের বাবা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছে। অসহায় মা অনেক কষ্ট করে মেয়েকে আদর-যত্নে লালন-পালন করে বড়ো করেছে। মায়ের আশা মেয়েকে বাড়ির পাশেই বিয়ে দিবে যেন মায়ের চোখের আড়াল না হয়। অসহায় এক নারীর তার কন্যার প্রতি পরম স্নেহময়তা ও অন্তর্বেদনা প্রকাশিত হয়েছে এই গীতের মাধ্যমে—

জিরারে না দিয়া, জিরার বাপ গেল সন্নাস হইয়া রে।
মার জিরা ধনরে
...
মার মনে আছিল কী কাছে দিত বিয়া ঝি গো
...
আইতো জাইতো চাইত ঝিয়ের চন্দ্রমুখ
মা জিরা ধনরে... (খান, ২০১৯: ১৬৫)।

অনেক বিয়ের গীতে বিয়ে-পরবর্তী শাশুড়ি, ননদ এবং অন্যান্যদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার ও বঞ্চনার চিত্র ওঠে আসে। একটা উড়ন্ত কবুতরও কিছু-না-কিছু খেতে পায়, কিন্তু বিয়ের পর কন্যার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে, সে নিজেকে একটা উড়ন্ত কবুতরের চেয়ে আরও বেশি অসহায় মনে করছে। এই বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে মায়ের কাছে যাওয়ার আকুল আর্তনাদ এই গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত—

উড়ালিয়া কইতররেও চৈরগা আধার খায়রে
সেইখান থেকে শুনিলাম ওরে দারুণ মায়ের কান্দন ওরে
চাড়গা দেয় না জাইতাম মায়ের কোলেরে
পারানা ফরসিরে আমার মায়ের বোঝায় ওরে।
ঘরে আছে ছোটো ভাই বোন দিয়ও মায়ের কোলেতুলে
উড়ালিয়া কইতরে চৈরগা আধার খায়রে
সেইখান থেকে শুনিলাম দারুণ বাবার কান্দনওরে... (খান, ২০১৯: ১৬৬-১৬৭)।

পারিবারিক কলহ-বিবাদ ও দুঃখের দাগও কম লাগে না বধূদের হৃদয়-মনে। বর্ষা এলেই নদী-নালা ভরে যায় জলে। কই মাছ উজিয়ে ওঠে মাঠে-ঘাটে এবং ডাঙায়। সমাজে নারীর মূল্য কতখানি 'কই মাছের লেঞ্জুর দিয়া বউ আনন যা' অর্থাৎ কইমাছের লেজ দিয়েও ঘরে বউ আনা যায় এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে পঙ্‌ক্তিতে। বধূজীবনের জন্য চরম অবমাননাকর নিম্নোক্ত গীতটি তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দলিল। গ্রামীণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী এতটাই অবহেলার স্বীকার যে, স্ত্রীর-মৃত্যুতে স্বামীর বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ তো নেই বরং মৃত স্ত্রীকে 'চেটের বাল্' বলে অভিহিত করে সোনার থালা বিক্রি করে নেচে-নেচে আবার বউ আনার বাসনা ব্যক্ত করছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-জীবনের প্রতি চরম অবমাননার এমনই একটি দৃশ্য লোকায়াত বাংলার চিরায়ত প্রকৃতির আবহে বর্ণিত হয়েছে নিমোক্ত গীতে—

মামুর বাড়ির ঘাটা দিয়া কৈ মাছ যা।
কই মাছের লেঞ্জুর দিয়া বউ আনন যা।
কেডা যাস্‌রে ভাটি গাং বাইয়া।
তর্ বউ মইরা রইছে ইছার (চিংড়ি মাছ) ঠ্যাং খাইয়া ॥
মরুক মরুক চেটের বাল্
ঘরে আছে সোনার তাল ॥
সোনার থাল বেইচ্ছা
বউ আনুম নাইচ্ছা!... (চৌধুরী, ১৩৯০: ২১৪)।

এভাবেই এ-অঞ্চলের বিয়ের গীতের মাধ্যমে সামগ্রিক নারী-জীবনের অন্তর্বেদনা যেমন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, বিয়ের পর কন্যার প্রতি বাপ-ভাইয়ের অবজ্ঞা ইত্যাকার নারী-জীবনের দীর্ঘশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। কুমিল্লা জেলার এসব গীত একক গীতি রূপেই সর্বত্র গাওয়া হয়ে থাকে। যার বিয়ে উপলক্ষ্যে গীতগুলো গাওয়া হচ্ছে তার জীবনবাস্তবতার চিত্র এই গীতগুলোর মধ্যে না-থাকলেও যারা গীতগুলো রচনা করছেন বা গাইছেন তাদের সামাজিক ও সাংসারিক জীবনবাস্তবতা ও জীবনাবিজ্ঞতার প্রতিফলই মূলত এইসকল গীতের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। আঞ্চলিক বিয়ের গীত হলেও এতে সকল কালের সকল যুগের অবলা-নারীর আর্তি ও বিরহ ফুটে উঠেছে।

উপসংহার

কুমিল্লা অঞ্চলের সংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লোকসংগীতের যে-কয়েকটি ধারা ক্রমান্বয়ে এ-অঞ্চলের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তার মধ্যে বিয়ের গীত প্রধান। এ-অঞ্চলের বিয়ের গীতে প্রধান দুটি ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠী তথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনজীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমায় চিত্রিত হয়েছে। বাঙালির মানসজুড়ে যুগ যুগ ধরে বিয়ের গীত অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে এসেছে। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি অধ্যায় এই বিয়ের গীত। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে বিয়ের আচার অনুষ্ঠানে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিয়ের উপলক্ষ্যে বর-কনের বোন-বান্ধবী, চাচি-ফুপু-খালা, দাদি-নানি/ ঠাকুরমা-দিদিমাদের দ্বারা বিয়ের গীত পরিবেশনের প্রথা গ্রাম-বাংলায় কিছুকাল পূর্বেও প্রবল ছিল। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন-ভিন্ন মেজাজ এবং সুরের এ-গীতগুলো আমাদের লোকসংগীতের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। মেয়ের গায়ে হলুদে যে-ধরনের গীত পরিবেশিত হত, বর-বরণের জন্য ছিল ভিন্ন গীত-ভিন্ন সুর। আবার কনেপক্ষের সাথে বরপক্ষের

তর্ক-বিতর্ক নিয়ে ভিন্ন গীত এবং কনে বিদায়ের ভিন্ন গীত-ভিন্ন সুর আমাদের বিয়ের গীতকে দিয়েছে সমৃদ্ধি। কিন্তু কালের আবর্তে আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতির অতি উজ্জ্বল ও চির-পরিচিত লোকসংস্কৃতির অমূল্য উপাদান 'বিয়ের গীত' আজ অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বিয়ের গীত শুধু নারী-হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা বা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে না, এর মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নারীর অবস্থান, বিয়ে অনুষ্ঠানে অনুসৃত ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি তথা অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অনেক অনুদ্‌ঘাটিত মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে অতীত ও বর্তমানের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রধান উপাদান হিসেবে এসব বিয়ের গীতের আবেদন নিছক কম নয়। রসঘন ও অখন্ড মানবিক আবেগ সমৃদ্ধ এ-সকল লোকগীতি দেশ-কালের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর বাঙালির শাশ্বত ঐতিহ্যের স্মারক। আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে এসব বিয়ের গীতের পরিবর্তে সংযুক্ত হয়েছে ক্রমশ নব্য-আবিষ্কৃত ব্যান্ড-সংস্কৃতি। আধুনিক নাগরিক সমাজ এতদিন ধরে চলমান সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত বিয়ের গীতকে 'সেকেলে' উপাধিতে অভিহিত করে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষত ও নাগরিক সমাজে এর গুরুত্ব না-থাকলেও মানুষের চিরন্তনী বৃত্তিকে কেন্দ্র করে বিরচিত এই গীতগুলো সাধারণ মানুষের জীবনে ও লোকসংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদকে নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই সংরক্ষণ ও প্রসার জরুরি। এজন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তির উদ্‌যোগও প্রয়োজন।

পাদটীকা

১ সোহাগ-মাগা : বিয়ের দিন কন্যার সোহাগ ডালা সাজানো হয়। পুষ্পথালির মধ্যে চাল, কলা, ফুল, দূর্বা, তেলের বাটি, দইয়ের ঘটি, মিষ্টি প্রভৃতি একখানা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে বর অথবা কন্যার মা তার মাথায় তুলে নেয়। গীত-বাদ্যসহ বাড়ি বাড়ি যায়। বিবাহের এই লোকাচারটি সোহাগ-মাগা নামে পরিচিত।

২ পাটিপত্র : হিন্দুবিবাহের প্রথম আচার। এটি মঙ্গালাচরণ নামেও পরিচিত। ঘটকের মাধ্যমে সম্বন্ধ করে বিবাহ স্থির হলে গহনাপত্র, যৌতুক ও অন্যান্য দেনাপাওনা চূড়ান্তভাবে স্থির করার জন্য যে অনুষ্ঠান হয়, তাকেই পাটিপত্র বলে।

৩ বরণ-ডালা : বরণের উপকরণ সজ্জিত পাত্র। সে পাত্রে বিয়ের দিন কনের শাড়ি, ব্লাউজ, গহনা, প্রসাধনী ইত্যাদি দ্রব্যাদি আনা হয়।

৪ বরস্নান : বরযাত্রার আগেই, সকাল থেকে চলে নানান রীতি অনুসরণ। এদিন শেষবারের মতো বরের গায়ে হলুদ মাখিয়ে গোসল করানো হয়। গ্রাম্য লোকাচারে অনুষ্ঠানটি 'বরস্নান' নামে পরিচিত

৫ দধি মঙ্গাল : বিবাহের দিন বর ও কন্যার উপবাস। তবে উপবাস নির্জলা নয়। জল মিষ্টি খাওয়ার বিধান আছে।

৬ শঙ্খ কঙ্কণ : কন্যাকে শাঁখা পরানোর আচারকে শঙ্খ কঙ্কণ বলা হয়। বিয়ের আগের দিন কন্যাকে শাঁখা পরানো হয়।

৭ কনকাঞ্জলি : এটি কনের বিদায় অনুষ্ঠান। যা আনন্দ এবং দুঃখের মিশ্রিত মুহূর্ত। কারণ এতে নববধূ তার পিতামাতা এবং আত্মীয়দের আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় নেয় তার স্বামীর সাথে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। নববধূকে কিছু চাল দরজার দিকে পিছনে তার মায়ের শাড়ির আঁচলে তিনবার ফেলতে হয় ও বলতে হয় মা-বাবার যাবতীয় ঋণ শোধ করে দিলাম।

৮ দ্বিরাগমন : বিবাহের পর বধূর দ্বিতীয়বার পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে আগমনের সংস্কার।

৯ নাইয়র : গ্রামবাংলার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে স্বীয় কন্যা অতিথি হয়ে আসাকে 'নাইয়র' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১০ গীত-গাওয়ানি : গ্রামীণসমাজে বিয়ে অনুষ্ঠানে মেয়েলি গীতের গায়িকা মধ্যবয়সী নারীদের গীত-গাওয়ানি বলা হয়। গ্রামীণজীবনে বিয়ে বা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য ডাক পড়ে 'গীত-গাওয়ানি' নারীদের।

সূত্রনির্দেশ

আহমদ, ওয়াকিল (২০০৪), *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, ঢাকা: গতিধারা;

কাসেম, আবুল (২০০৮), *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস আদি পব*, ঢাকা: গতিধারা;

খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.) (২০১৯), *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কুমিল্লা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি;

খানম, হাজেরা ও হাসান, দেলোয়ার (২০১৪), *বিবাহ*, ঢাকা: আবিষ্কার;

চৌধুরী, তিতাশ (১৩৯০), *কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা: একাডেমি;

জলিল, মুহাম্মদ আব্দুল (১৯৯৪), *উত্তর অঞ্চলের মেয়েলি গীত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি;

ফেরদৌসী, লাকী (২০১৬), *ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিয়ের গীত*, ঢাকা: কলি প্রকাশনী;

মুন্নী, শাহ্‌নাজ (২০০৩), *ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়েলি গীত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি;

সেতু, জফির (২০১৩), *সিলেটি বিয়ের গীত*, ঢাকা: শুদ্ধস্বর।

বিশেষজ্ঞমন্ডলি (Reviewers)

Professor Dr. Md. Shah Alam
Department of Physcics
Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet

Professor Dr. Md. Ashraf Uddin
Department of Mathematics
Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet

Professor Dr. Md. Mizanur Rahman
Department of Chemistry
Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet

প্রফেসর ড. জফির উদ্দিন
বাংলা বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রফেসর ড. সরকার আব্দুল মান্নান
বাংলা বিভাগ
মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট (অব.) ও
প্রফেসর, ইংলিশ অ্যান্ড মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

প্রফেসর নন্দলাল শর্মা
বাংলা বিভাগ
মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট (অব.) ও
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট (অব.)

ড. মোস্তাক আহমাদ দীন
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট

ড. আ ন ম ফজলুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ড. মোমেনুর রসুল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. ইয়াহইয়া মান্নান
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর